তফসীরে
নূরুল কোরআন

চতুর্দশ পারা

১৪

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

চতুর্দশ খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

চতুর্দশ পারা

১৪

চতুর্দশ খণ্ড

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সফর ১৪৩৪ হিঃ,
পৌষ ১৪২০ বাং
ডিসেম্বর ২০১৩ ইং

গ্রন্থ সত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৮৯১৩

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯

Tafsir-e-Nurul Quran 14, Published by Al-Balag Publications.
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 300.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অসংখ্য শোকর যে তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের চতুর্দশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। এজন্যে দরবারে এলাহীতে পেশ করি, সেজদায়ে শোকরানা। যদি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর গোজারীতে অতিবাহিত করি তবুও শোকর গোজারীর হক্ব আদায় হবে না। এ অক্ষমতার জন্যে করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর করুণা-ধন্য হওয়ার জন্য বিনীত আরজী পেশ করি।

অগণিত দরূদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর ওছিলায় আল্লাহ পাক তফসীরে নূরুল কোরআনের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মহান বাণী প্রচারের এ সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন।

হে আল্লাহ! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পেশ কর এমন দরূদ যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হয়, এমন দরূদ যার কোন সীমা নেই, যার কোন শেষ নেই, তাঁর আল-আওলাদ ও আসহাবের প্রতিও।

পবিত্র কোরআন একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ, যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছে, যা বিপন্ন মানবতার রক্ষাকবচ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে, যা মুমূর্ষু মানবতাকে নব-জীবন দানের লক্ষ্যে, বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট মানব জাতিকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে নাযিল হয়েছে।

অজানাকে জানার আগ্রহ মানব মনে আবহমান কাল ধরেই আছে। আর এর প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের এ প্রয়োজনের আয়োজন কে করবে? সব মানুষই পৃথিবীতে আগন্তুক। কে উন্মোচিত করবে আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির চেহারা থেকে অজানার অবগুণ্ঠন? কোন মানুষের পক্ষেই যে তা সম্ভব নয়। শুধু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের পক্ষেই তা সম্ভব, যিনি শূন্যের আধার থেকে অস্তিত্বের আলোর জগতে নিয়ে এসেছেন মানুষকে। যে কিছুই জানতো না, তাকে আল্লাহ্ পাকই শিক্ষা দিয়েছেন। যে মানুষ ছিল অজ্ঞ, আল্লাহ্ পাকই তাকে বিজ্ঞে পরিণত করেছেন। এজন্যে কোরআনে করীমে সর্বপ্রথম যে পয়গাম বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে, তা হল জ্ঞান অন্বেষণের আহ্বান, এরশাদ হয়েছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.....عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

"আল্লাহ্ পাকের নাম নিয়ে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে, পড়, তোমার প্রতিপালক অনন্ত উদার দাতা, যিনি মানুষকে কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না"।

বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে সর্বপ্রথম যা দান করেছেন তা হল এলম বা জ্ঞান। এজন্যেই আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার কথা বলার পরই তাঁকে শিক্ষা দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا-

আর আল্লাহ পাক আদমকে শিক্ষা দিয়েছেন সব কিছুর নাম এবং গুণাবলী। (সূরা বাকারা)

এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা "আর রহমানে" মানব জাতির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম দানের কথা উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম সর্ব প্রধান দান হিসাবে যা উল্লেখ করেছেন তা হল পবিত্র কোরআন। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-

"দয়াময় আল্লাহ্ পাক কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা-বার্তা বলাও তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন"। এখানে বিশেষভাবে যে কথাটি প্রণিধানযোগ্য তা হল– মানব জাতির সৃষ্টি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের মহান দান। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি বা অস্তিত্বের চেয়েও বড় দান হল পবিত্র কোরআন। এজন্যে সবার আগে এ দানের উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর কারণ হিসেবে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের জ্ঞান এবং তার উপর আমল থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার জীবন শুধু যে ব্যর্থ তাই নয়; বরং তার মহা বিপদ অবধারিত। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ.....تُرٰبًا

"সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকে তার প্রেরিত কর্মকান্ড দেখতে পাবে এবং কাফের ব্যক্তি সেদিন বলবে হায়! আমি যদি কোন মতে মাটি হয়ে যেতাম"!

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে জীবনের ব্যর্থতা সেদিন প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে এবং আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আমি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করব বটে, কিন্তু তোমাদের জন্যে দু'জন উপদেশক রেখে যাচ্ছি। তারা তোমাদেরকে সর্বদা উপদেশ ও নীতি শিক্ষা দিতে থাকবে। তন্মধ্যে একটি হলো সরব, আর অন্যটি নীরব। সরব অর্থাৎ কোরআন শরীফ তেলালাওয়াত, নীরব অর্থাৎ মৃত্যু চিন্তা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ

তোমাদের হাশর তেমনই হবে যেমন তোমাদের মৃত্যু হবে আর মৃত্যু তেমনই হবে যেমন জীবন হবে। অতএব, জীবন যদি পবিত্র কোরআনের আলোকে গড়ে ওঠে, তবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী শান্তিপূর্ণ ও আরামদায়ক হবে। পক্ষান্তরে, যদি এ

জীবন পবিত্র কোরআনের আলো থেকে বঞ্চিত হয় তবে ভবিষ্যত যে অন্ধকার এবং বিপদসংকুল, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বস্তুতঃ দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যে, ঘুমন্ত তন্দ্রাহত মানুষকে জাগ্রত করার জন্যে, বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে দান করেছেন জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভান্ডার পবিত্র কোরআন। আর পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে আগমন করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ-

অতএব জীবন-সাধনাকে সার্থক করার প্রয়োজনে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের।

পবিত্র কোরআনের আলোকে যে নিজেকে যত বেশী আলোকিত করতে পারবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের যে যত বেশী অনুসরণ করতে পারবে সে জীবন-সংগ্রামে ততখানি সফলকাম হবে।

বাংলা ভাষায় ইতোপূর্বে পবিত্র কোরআনের কোন মৌলিক, বিস্তারিত ও প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ ছিলনা বলেই তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনা শুরু করি। এই অধমের অযোগ্যতার তীব্র উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় এক যুগ পূর্বে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করেই এ মহান কাজে হাত দেই।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ এ বরকতময় গ্রন্থের চতুর্দশ খন্ড পেশ করার তৌফিক আল্লাহ পাকই দান করেছেন। অতএব, সকল প্রশংসা তাঁরই। আমরা তাঁর দয়ায় ধন্য। আমাদের উছিলা একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর দরবারে পেশ করি এ শুভ মুহূর্তে অগণিত দরূদ ও সালাম।

হে আল্লাহ! কবুল কর তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনা এবং এ মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। হে আল্লাহ! এর মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের আলো বিকীরণের তৌফিক দাও এবং এর বরকতে এ অধমকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ ও মাগফেরাত দান কর। আমার আব্বাজান (রঃ) ও আম্মাজান (রঃ)-কে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর। হে আল্লাহ! এ গ্রন্থের সকল পাঠক-পাঠিকাকে, সকল সহকর্মী ও সহায়তাকারীকে কল্যাণ দান কর। আমাদের সকলকে পবিত্র কোরআনের আলোকে আলোকিত হয়ে তোমার সন্তুষ্টি লাভের তওফিক দান কর, আমীন।

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

০৮/০৬/৯২ ইংরেজী

সূচীপত্র

বিষয় .... পৃষ্ঠা

কাফেরদের অনুতাপ ২

পবিত্র কোরআনের হেফাজত করব ৯

পবিত্র কোরআন হেফাজতের পন্থা ১১

তৌহিদের প্রমাণ ২১

জ্বীন সৃষ্টির উপরণ ৩৩

ইবলিসের ধ্বংসের কারণ ৩৮

আয়াতের মর্মকথা ৪৫

দোযখের বিবরণ ৪৫

বেহেশ্‌তের বিবরণ ৫০

বেহেশতবাসীদের বৈশিষ্ট্য ৫০

আয়াতের মর্মকথা ৬৬

এসব ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য ৬৮

'মাসানী' নামকরণের তাৎপর্য ৭২

আমলের জন্য জবাবদেহী করতে হবে ৮২

বিদ্রুপকারীদের ভয়াবহ পরিণতি ৮৭

সূরা নাহল প্রসঙ্গে ৯২

শোকর গুজারী একান্ত কর্তব্য ১১২

প্রণিধানযোগ্য বিষয় ১১৩

তৌহিদের বিবরণ ১১৮

আল্লাহ পাকের মা'রেফাত ১১৮

একটি প্রশ্ন ১২৪

জবাব ১২৪

হেদায়েত লাভের পন্থা ১২৪

প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য ১২৬

নমরূদের ঘটনা ১৩৩

মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ ১৩৯

মোমেনদের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সালাম ঃ ১৪২

কর্ম ও ফল ১৪৩

সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ১৪৪

মানুষের কর্মের স্বাধীনতা ১৪৭

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ ১৫০

পরকালীন জীবন ধ্রুব সত্য ১৫২

পুনরুত্থান আদৌ কঠিন নয় ১৫৪

রসূল সর্বদা মানুষই হন ১৬০

রসূল শুধূ পুরুষ হন, নারী নয় ১৬০

তাকলীদের গুরুত্ব ১৬১

বিষয় — পৃষ্ঠা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী........ ১৬৫
কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার কু-প্রথা........ ১৭৭
আয়াতের মর্মকথা........ ১৮১
আযাবকে ভয় কর........ ১৮২
আত্মরক্ষা করার পন্থা........ ১৮৪
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা........ ১৮৮
আল্লাহ পাকের বিশেষ দান........ ১৯৩
মধুর উপকারীতা........ ১৯৭
অকেজো বয়স........ ২০১
বিনয় ও কৃতজ্ঞতা একান্ত কর্তব্য........ ২০২
আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণা........ ২১৬
কোন কোন কাফেরের শাস্তি হবে দ্বিগুণ........ ২২৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবার ঘোষণা........ ২২৯
পবিত্র কোরআন পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান........ ২২৯
সুবিচার ও পরোপকারের নির্দেশ........ ২৩০
আয়াতের মর্মকথা........ ২৩২
অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ........ ২৩৭
অঙ্গীকার রক্ষা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব........ ২৪৩
দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী........ ২৪৮
উত্তম জীবন প্রদানের ঘোষণা........ ২৪৯
উত্তম জীবনের ব্যাখ্যা........ ২৫০
মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর........ ২৫২
পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের চির মুক্তির মহা সনদ........ ২৬১
যারা ঈমানদার নয় তারাই মিথ্যাবাদী........ ২৬৫
মোমেন মিথ্যাবাদী হয় না........ ২৬৬
কুফরী কাজের জন্যে বাধ্য করার তাৎপর্য........ ২৬৯
আয়াতের মর্মকথা........ ২৭২
এ জীবনে মানুষের তিনটি সাথী........ ২৭৩
কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা........ ২৭৯
দোযখকে কোথা থেকে আনা হবে........ ২৭৯
আখেরাতের আলোচনা........ ২৮০
শিক্ষণীয় বিষয়........ ২৮৫
আয়াতের মর্মকথা........ ২৮৯
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী........ ২৯৩
মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের তাৎপর্য........ ২৯৭
সপ্তাহের পবিত্র দিন........ ৩০০
আল্লাহ পাকের দিকে আহবানের পন্থা........ ৩০২
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা........ ৩০২

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ
হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর
অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা
২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান
৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন
৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী
৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন
৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)
৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম
৮। সাহাবা-চরিত
৯। হাজীদের সাথী
১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সঃ) অবদান
১১। এনায়েতুল কোরআন
১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন
১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী (সঃ)
১৪। ইসলামী মাহফিলের তাৎপর্য
১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)
১৬। শরহে বয়যাবী
১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা
১৮। মুসলমানের কর্তব্য
১৯। দুই ঈদ
২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)
২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে
২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)
২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম
২৪। মহান রাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করীম (সঃ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

চতুর্দশ খণ্ড চতুর্দশ পারা

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَ
يَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٣ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِنْ
قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ
مَا يَسْتَأْخِرُوْنَ ۝٥ وَقَالُوْا يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ
لَمَجْنُوْنٌ ۝٦ لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧
مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا إِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨ إِنَّا نَحْنُ
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩

তরজমা

(২) কাফেররাও কোন সময় আকাঙ্ক্ষা করে বলবে হায়! যদি আমরাও মুসলমান হতাম (তবে কতই না ভাল হত)!

(৩) (হে রসূল!) তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে মোহান্ধ করে রাখুক, অচিরেই তারা বুঝতে পারবে।

(৪) আমি কোন জনপদকেই তার জন্যে লিখিত নিদৃষ্ট সময় পূর্ণ না হলে ধ্বংস করি নাই।

(৫) কোন জাতি তার জন্যে নিদৃষ্ট সময়কে ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।

(৬) আর কাফেররা বলে, ওহে! যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তুমিতো নিশ্চয় উন্মাদ।

(৭) যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে ফেরেশতাদেরকে আমাদের নিকট উপস্থিত করছো না কেন?

(৮) যথার্থ কারণ ব্যতীত আমি ফেরেশতা প্রেরণ করিনা, আর ফেরেশতা উপস্থিত হলে তারা অবকাশ পাবেনা।

(৯) আর নিশ্চয় আমি এই কোরআন নাযিল করেছি, আর নিশ্চয় তা আমি রক্ষা করবো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববতী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সে সব ভাগ্যাহত লোকদের পরিণাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যারা পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করেছে।[১]

কাফেরদের অনুতাপ

দুনিয়াতে যে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ্ পাকের কালাম হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, এমন দিন আসবে যখন তারা এ অন্যায় আচরণের জন্যে অনুতপ্ত হবে। তারা নিজেদের কপালে করাঘাত করে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলবে, হায়! যদি আমরা মুসলমান হতাম। যদি আমরা আল্লাহর রসূলের কথা মেনে চলতাম, তবে কত ভাল হত! যদি পবিত্র কোরআনের অনুসারী হতাম তবে আজ আমরা হতভাগা হতাম না। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۝

"কাফেররাও কোন সময় আক্ষেপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি মুসলমান হতাম (তবে কতইনা ভাল হত)"!

দুনিয়াতে যারা পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করেছে, অমান্য করেছে তার বিধান সমূহকে তারা একদিন এভাবে আক্ষেপ প্রকাশ করবে। তবে কখন এ আক্ষেপ প্রকাশ করবে, এ বিষয়ে তফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫১

এবনে জরীর, এবনে মোবারক এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেনঃ তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ্ পাক যখন মুশরেক এবং পাপী মুসলমানদেরকে দোযখে একত্রিত করবেন তখন মুশরেকরা মুসলমানদেরকে বলবে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে উপকারী হয়নি? তাদের একথায় আল্লাহ্ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেবেন এবং মাফ করবেন। ঐ মুহূর্তে কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি আমরাও মুসলমান হতাম তবে কতইনা ভাল হত!

সায়ীদ এবনে মনসুর এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআত গ্রহণ করে দয়া করবেন এবং অনেককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অবশেষে এরশাদ করবেনঃ যদি কোন মুসলমান থাকে সে যেন জান্নাতে চলে যায়, তখন কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, হায়! আফসোস! যদি আমরাও মুসলমান হতাম।

তেবরানী হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের কিছু লোককে পাপাচারের কারণে দোযখের শাস্তি দেয়া হবে। তারা দোযখে প্রবেশ করবে আর আল্লাহ্ পাক যতদিন ইচ্ছা করেন, তারা ততদিন দোযখে থাকবে। তখন মুশরেকরা তাদেরকে তিরষ্কার করে বলবে, তোমরাতো ঈমান এনেছিলে কিন্তু সেই ঈমাদের কারণে তোমাদের কোন উপকার হয়নি। তখন আল্লাহ্ পাক সকল মুসলমানকে দোযখে থেকে বের করে দেবেন। তওহীদে বিশ্বাস করেছিল এমন কোন লোক দোযখে রাখবেন না। একথা বলার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

যখন গুনাহগার মুসলমানদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে তখন কাফেররা আক্ষেপ করে একথা বলবে যা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

তেবরানী, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন দোযখীরা একত্রিত হবে এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছানুযায়ী কিছু পাপাচারী মুসলমানও সেখানে থাকবে তখন কাফেররা মুসলমানদেরকে বলবে যে, তোমরা কি মুসলমান ছিলে না? মুসলমানগণ বলবেন, অবশ্যই তখন কাফেররা বলবে, তাহলে ইসলামের কারণে তোমাদের কি উপকার হলো, তোমরাও যে আমাদের সঙ্গে দোযখে এসেছ? মুসলমানগণ বলবে, গুনাহর কারণে আমাদের এ অবস্থা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক একথা শ্রবণ করে আদেশ দেবেন যেন সকল মুসলমানকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হয়। তখন সকল মুসলমানকে দোজখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি আমরাও মুসলমান হতাম তবে কত ভাল হত!

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথার বলার পর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ কাফেররা এ আক্ষেপ তখন করবে যখন মুসলমানদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করেছ সে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে।[১]

কাফেররা কখন আক্ষেপ করে উপরোক্ত উক্তি করবে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেনঃ এর জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, বরং কাফেররা এ জীবনে এবং পর জীবনে বহুবার তাদের কৃতকর্মের জন্যে আক্ষেপ করবে, হতে হবে তাদেরকে অনুতপ্ত, তারা বিলাপ করে ক্রন্দন করবে কিন্তু সে ক্রন্দন তাদের জন্যে উপকারী হবে না। যখনই মুসলমানদের কোন সুখ-সমৃদ্ধি, সাফল্য এবং সৌভাগ্য তারা দেখবে তখনই তাদের আক্ষেপ হবে। দ্বিতীয় হিজরীর রমজানে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধ থেকেই তাদের এ আক্ষেপের সূচনা হয়। এ ঐতিহাসিক যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। তাঁরা ছিলেন নিরস্ত্র-প্রায়। প্রতি নয়জনের জন্যে ছিল একটি মাত্র তরবারী। মুসলমানদেরকে নিকট ছিল মাত্র দু'টি অশ্ব। আর মক্কার কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার। তারা ছিল সে যুগের সর্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সু-সজ্জিত। কিন্তু আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছিলেন, মুসলমানদের এ বিজয়াভিযান এবং অব্যাহত অগ্রগতি দেখে কাফেরদের অনুতাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনিভাবে কাফেরদের মৃত্যুর সময় যখন ফেরেস্তাদের ভয়ংকর আকৃতি তারা দেখে, প্রাণ সংহারের কঠোর যন্ত্রণা যখন শুরু হয় তখনও তারা আক্ষেপ করে বলে, হায়! যদি আমরা মুসলমান হতাম! বিশেষতঃ যখন তারা অদৃশ্য জগতের ভয়ংকর আযাবের ভয়াবহ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে তখন তাদের মুসলমান না হওয়ার আক্ষেপ আরো বেড়ে যায়। এমনিভাবে, কেয়ামতের দিন যখন তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখনও তারা আক্ষেপ করা একথা বলবে। আল্লামা ওসমানী (রঃ) এরপর তেবরানী সংকলিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের যে সব পাপী লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দোযখে যাবে, কাফেররা তাদেরকে দোযখে দেখে বলবে, তোমরাতো দুনিয়াতে নিজেদেরকে আল্লাহর আপন মনে করতে অথচ এখন আমাদের সঙ্গে এখানে কেন আসলে? একথা শ্রবণ করে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী

আল্লাহ্ পাক তাদের পক্ষে শাফাআতের অনুমতি প্রদান করবেন, ফেরেস্তাগণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মোমেনগণ তাদের পক্ষে সুপারিশ করবেন, আল্লাহ্ পাক তাদের সুপারিশ গ্রহণ করে পাপী মুসলমানদেরকে নাজাত দেবেন। তখন কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, "হায়! যদি আমরা মুসলমান হতাম, তবে কতইনা ভাল হত"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরো লিখেছেনঃ দোযখ থেকে যারা নাজাত পেয়ে জান্নাতে যাবে তাদের চেহারায় এক প্রকার কালো দাগ থাকবে। আর এজন্যে লোকেরা তাদেরকে দোযখী বলবে, এরপর তারা দোয়া করবে, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে এ নামটি মিটিয়ে দাও। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জান্নাতের একটি নহরে গোসল করার আদেশ দেবেন। আর ঐ নামটিও তাদের থেকে বিদূরিত করা হবে।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন কোন লোককে আগুন পায়ের গিরা পর্যন্ত ধরে রাখবে, আর কোন লোককে হাটু পর্যন্ত ধরে রাখবে, আর কোন লোককে ঘাড় পর্যন্ত ধরে রাখবে। যেমন গুনাহ হবে তেমন হবে শাস্তি। কোন কোন লোক এক মাসের শাস্তি ভোগ করবে, সবচেয়ে দীর্ঘ শাস্তি সে ব্যক্তির হবে যে এত সময় দোযখে থাকবে যত সময় এ দুনিয়াকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দুনিয়া শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত সময় সে দোযখে অতিবাহিত করবে। যখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দোযখ থেকে বের করার ইচ্ছা করবেন তখন কাফেররা তাদেরকে বলবে, তোমরাতো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছিলে এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে, এতদসত্ত্বেও তোমরা আজ দোযখে রয়েছ, তখন আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত রাগ করবেন, এমন রাগ আর কোন কথায় আসবে না। এরপর তৌহিদে বিশ্বাসীদেরকে দোযখ থেকে বের করে বেহেস্তের একটি নহরের নিকট আনা হবে, তখন কাফেররা বলবে, হায় যদি আমরাও মুসলমান হতাম!

ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামের সুপারিশক্রমে মোমেনদের প্রতি দয়া করবেন এবং তাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেবেন। এমনকি, অবশেষে এ ঘোষণা করা হবে যার মধ্যে ঈমান ছিল, সে যেন জান্নাতে প্রবেশ করে, তখন কাফেররা আফসোস করে বলবে হায়! আক্ষেপ! যদি আমরাও মুসলমান হতাম, তবে কতইনা ভাল হত![১]

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা- ১৪, পৃষ্ঠা-৩
তফসীরে কবীর খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা ১৫৪

"তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক, আশা আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, অচিরেই তারা বুঝতে পারবে"।

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) যখন এ কাফেররা এত উপদেশ সত্ত্বেও সঠিক পথে আসছেনা, কিছুতেই তাদের চেতনা ফিরে আসছেনা এমন অবস্থায় আপনি আর তাদের জন্যে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা করবেন না। তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন, যা ইচ্ছা করুক, কয়েকদিন খাওয়া-দাওয়ায়, ভোগ-বিলাসে, আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকুক। তাদের সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুগ্ধ থাকুক। অবশেষে তারা বুঝতে পারবে, যখন তাদের সমুচিত শাস্তি তারা দেখতে পাবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আয়াতের উদ্দেশ্য হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া যে, আপনি কাফেরদের হেদায়েতের ব্যাপারে আর ব্যাকুল হবেন না। কেননা, তারা ঈমান আনবে না, তাদেরকে নছিহত করেও কোন লাভ হবে না। যখন তারা স্বচক্ষে আযাব দেখবে তখনই তারা সত্য উপলব্ধি করবে।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, অদূর ভবিষ্যতে তারা বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, নাফরমান হওয়ার পরিণতি কত ভয়াবহ! আর তা সঠিকভাবে তারা তখন বুঝবে যখন তাদের মৃত্যু হবে।

ذَرْهُمْ

তাদেরকে ছেড়ে দিন, অর্থাৎ তাদের কুফরী ও নাফরমানীর জন্যে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, উপদেশ ছেড়ে দিতে হবে, বরং তাবলীগ অব্যহত রাখুন, আর তাদেরকে পানাহারে আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ-মত্ত থাকতে দিন। কেননা, যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে গাফেল থাকে, তাদের এ অবস্থাই হয়। আজকের দুনিয়ায়ও যারা আত্মবিস্মৃত, জাগতিক উন্নতির শত সহস্র পরিকল্পনা নিয়ে থাকে ব্যস্ত, তাদের অবস্থা তাই যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ۝

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৩
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩৭

আরো কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারন করা হয়েছে– "আমি কোন জনপদকেই তার জন্যে নির্ধারিত সময় ব্যতীত ধ্বংস করি নাই"।

অর্থাৎ- যে জনপদই পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হয়েছে, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু যখন তারা সতর্ক হয়নি, বরং নাফরমানী ও পাপাচারে সীমালঙ্ঘন করেছে তখন তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক জাতির শাস্তির জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেভাবে আল্লাহ্ পাকের প্রত্যেকটি কাজই হেকমতপূর্ণ, ঠিক তেমনি কাফেরদের ধ্বংসের ব্যাপারে যে বিলম্ব করা হয়, তাতেও রয়েছে অনেক হেকমত। এতে কাফেরদের সন্তান-সন্ততিকে ঈমান আনয়নের সুযোগ প্রদানও একটি হেকমত। তবে কাফেরদের আযাবের ব্যাপারে বিলম্ব দেখে তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, তাদের শাস্তির জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, সে সময় আসলে আযাব অবশ্যই আসবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ এ আয়াতে মক্কাবাসীর জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী, যেন তারা শেরক, পৌত্তলিকতা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা থেকে বিরত হয়, নতুবা তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাদের ধ্বংসের জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে সময় আসা মাত্রই তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাকের অবাধ্য, নাফরমান জাতিগুলোর ধ্বংসের সময় নির্দিষ্ট এবং লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে সময়ের কথা শুধু আল্লাহ্ পাকই জানেন, যখন সে সময় আসবে তখন তাদেরকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।[২]

আদ ও সামুদ জাতির ধ্বংস এবং ফেরাউন ও নমরুদের ধ্বংস তাদের জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই এসেছিল। আধুনিক বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং সমাজতন্ত্রের নিপাত যাওয়ার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট ছিল সে সময়েই তাদের পতন হয়েছে। অথচ অন্যতম পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র সহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ছিল। তার দৌরাত্ম এবং অত্যাচারের শিকার হয়েছিল আফগানিস্তান সহ পৃথিবীর আরো বহুদেশ। নিরস্ত্র-প্রায় মুজাহেদ্বীনদের মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে অবশেষে এ পরাশক্তি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৩

প্রশ্ন হল কে তাদেরকে বিদায় করেছে? কোন্ পরাশক্তির নিকট তারা পরাজিত হয়েছে? কে তাদের সকল সমর-সজ্জাকে অকার্যকর করে দিয়েছে? জবাব একটিই, আর তা হল এক আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছেন। তাই আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা নতুন করে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিগত সত্তর বছর যাবত কুখ্যাত কুম্যনিষ্ট শাসন সে দেশের কোটি কোটি মানুষকে গৃহপালিত পশুর মত করে রেখেছিল, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক নির্যাতীত মানুষের ফরিয়াদ শ্রবণ করেছেন, মরণোম্মুখ মানবতাকে রক্ষা করেছেন। কেননা,

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ۝

কোন সম্প্রদায়ই তার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করতে পারে না, আর পিছিয়েও থাকতে পারে না। এটিই স্রষ্টার অমোঘ বিধান। এর কোন ব্যতিক্রম হয়না, এর কোন পরিবর্তনও হয়না।

মক্কার কাফেরদেরকে যে তখনো শাস্তি দেয়া হয়নি, তার কারণ হল তাদেরকে পাকড়াও করার যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, তা এখনো আসেনি।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ۝

'আর তারা বলে, যার উপর কোরআন নাযিল হয়েছে সেই তুমি, ওহে তুমিতো উন্মাদ'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কাফেররা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ভিত্তিহীন এবং অবাস্তব কথা-বার্তা বলত সে সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে এবং তারা যেসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত, তা খণ্ডন করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ

মক্কার পোত্তলিকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপহাস করত এবং বলত, আপনার প্রতিই কি কোরআন নাযিল হল? অথচ আপনি একজন উন্মাদ, আপনি যা বলছেন আমাদের ধারণা যে, আপনি একজন উন্মাদ ব্যক্তি।

মূর্খ লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা প্রকাশার্থে এমন আপত্তিকর কথা-বার্তা বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করা।

لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۝

যদি তুমি সত্য নবী হও, যদি আল্লাহ্ পাক তোমাকে তাঁর রসূল হিসেবে প্রেরণ করে থাকেন তবে তোমার সঙ্গে ফেরেস্তাদের সেনাবাহিনী কেন প্রেরিত হয়নি? ফেরেশতারা এসে তোমরা নবুওয়্যতের সত্যতা ঘোষণা করত, এখনও সময় আছে, যদি বাস্তবিকই তুমি সত্যের ধারক ও বাহক হও, তবে তোমার নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আসে। মক্কার কাফেরদের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আস্ফালনের জবাব রয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ۝

'আর যথার্থ কারণ ব্যতীত আমি ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করি না। আর ফেরেস্তাগণ উপস্থিত হলে কাফেররা অবকাশ পাবে না'।

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, এ মর্মে যে, (হে রসূল!) যারা আপনাকে মানবে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবে তাদের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দলিল প্রমাণ বর্তমান রয়েছে। কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবেনা, (হে রসূল!) আপনাকে যারা মানবেনা; তাদের জন্যে ফেরেশতারা আসলেও তারা মানবে না। এতদ্ব্যতীত, ফেরেস্তাতো কারো ফরমায়েশে আসেনা, এটি নিয়ম নয়, নিয়ম হল যখন কোন জাতি অন্যায় অনাচার, জুলুম অত্যাচার তথা দৌরাত্বের চরমসীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণ করেন এমন অবস্থায় দূরাত্মা জালেমদের বাঁচার কোন পথ থাকে না, এবং তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে অবকাশ দেয়া হয় না, কোন জাতিকে যখন ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়, তখনই আল্লাহ্ পাক ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণ করেন, এটিই আল্লাহ্ পাকের চিরন্তন নিয়ম।

আলোচ্য আয়াতে একদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে কাফেরদের উদ্দেশ্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এ মর্মে যে, যদি তারা আল্লাহর নবীর বিরোধিতা অবাহত রাখে, তবে তাদের ধ্বংস অবধারিত, একথা যেন তারা মনে রাখে।

যেহেতু কাফেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উন্মাদ বলেছে এবং তাঁর প্রতি উপহাস করেছে, তাই পরবর্তী আয়াতে তার জবাব দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۝

পবিত্র কোরআনের হেফাজত করব

"নিশ্চয় আমি কোরআন নাযিল করেছি, আর নিশ্চয় আমি অবশ্যই তা হেফাজত করবো"। তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। হে কাফেররা! তোমরা পবিত্র

কোরআনকে যতই অবিশ্বাস কর এবং পবিত্র কোরআনের বাহক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যতই উপহাস কর তার কোন প্রভাব তাঁর প্রতি এবং কোরআনের প্রতি পড়বেনা। পবিত্র কোরআন আমারই কালাম। আমিই তা নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাজত করবো।

পবিত্র কোরআনের হেফাজত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের এ চিরন্তন ঘোষণা কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল পবিত্র কোরআন বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে। এর শব্দগত, অর্থগত তথা-সর্ব প্রকার বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা এমনকি, জের জবর নোক্তা পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়নি। যেমনটি ইতিপূর্বে ছিল হুবহু তেমনই রয়েছে। চির ভাস্বর, চির অমলিন, চির সংরক্ষিত। পবিত্র কোরআনের এ দৃপ্ত ঘোষণার বাস্তবায়ন হচ্ছে সর্বত্র, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে অবস্থায় পবিত্র কোরআনকে রেখে গেছেন, আজও ঠিক সে অবস্থায়ই রয়েছে। এতে বিন্দুমাত্রও কোন পরিবর্তন হয়নি, কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এভাবেই থাকবে।

পৃথিবীতে পবিত্র কোরআন ব্যতীত অন্য এমন কোন আসমানী গ্রন্থ নেই যার এভাবে হেফাজত করা হয়েছে। আর এটিই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে, এবং যার প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে তিনি উন্মাদ নন, বরং সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃত, সর্বশেষ রসূল, সমস্ত নবী রসূলগণের দলপতি।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক দু'টি ঘোষণা করেছেনঃ

১. "নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি কোরআন করীম", এটি একটি চিরন্তন ঘোষণা। যে পবিত্র কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের মহান কালাম, বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে, যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, তাঁর প্রতিই এ কালাম নাযিল হয়েছে।

২. "নিশ্চয় আমি পবিত্র কোরআনের হেফাজত করব" –এ বাক্যে পবিত্র কোরআনের হেফাজতের অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে। এ অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে তথা পবিত্র কোরআন বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে এভাবে সংরক্ষিত হয়েছে যে, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন বর্তমান রয়েছেন। যদি মুদ্রিত অবস্থায় পবিত্র কোরআন কোন কারণে দুষ্প্রাপ্যও হয় তবুও একটি বাক্য বিনষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, তাতে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ যে ভাষায়ই কথা বলুক কিন্তু একই ভাবে পবিত্র কোরআন পাঠ করে। আর পবিত্র কোরআন এমনি বিস্ময়কর ভাবে মানুষের অন্তরে

সংরক্ষিত হয়, কেউ যদি তা অনুসন্ধান করতে চায় তবে সে তা দেখতে পাবে না। এজন্যে ইমাম রাজী লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনকে যেভাবে হেফাজত করেছেন অন্য কোন আসমানী গ্রন্থকে এভাবে হেফাজত করেননি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সোনালী যুগে কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয়া হত। সে অন্যকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিত। সে যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন সকল যুগেই তৈরী হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রিত হচ্ছে কিন্তু তাতে একটি যের যবরের ও পার্থক্য নেই।

পবিত্র কোরআন হেফাজতের পন্থা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ তিনি অবশ্যই পবিত্র কোরআনের হেফাজত করবেন এবং এ ঘোষণা অনুযায়ী তিনি হেফাজত করছেন তবে কোন্ পন্থায় হেফাজত করবেন তা অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ

(সূরা কেয়ামা)

"নিশ্চয় এ কোরআনের সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই, অতএব, যখন আমি তা পাঠ করি, তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই"। আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, পবিত্র কোরআনকে হাফেজের বক্ষে সংরক্ষিত করব এবং গ্রন্থাকারেও তাকে সংকলিত করব। আর মানুষের অন্তরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে আগ্রহ সৃষ্টি করব, যেন দিবারাত্রি তারা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে। এরপর জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করব, তাদের মনের গহনে এ পর্যায়ে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করব। আর তারা বিভিন্ন আয়াতের শানে নুযুল, নাছেখ এবং মনছুখ এবং বিভিন্ন আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করবে। যেহেতু পবিত্র কোরআনের হেফাজতের ব্যবস্থার পরই তার তফসীর বা ব্যাখ্যা করার প্রশ্ন আসবে, তাই আলোচ্য আয়াতে ثم অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর হেফাজতের যে ওয়াদা আল্লাহ্ পাক করেছেন তা হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে বাস্তবায়িত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদ্বীন এবং সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের হেফাজতের কাজে নিয়োজিত করেছেন। যেভাবে কোন শাসনকর্তা যদি বলে যে, "আমি সরকারী সম্পদের হেফাজত করবো"-এর অর্থ হয় যে, শাসনকর্তা এ সম্পদের হেফাজতের জন্যে প্রহরী নিযুক্ত করবেন, ঠিক এমনিভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাই খোলাফায়ে রাশেদ্বীন এবং

সাহাবায়ে কেরামকে প্রহরায় নিযুক্ত করেছেন, আর এজন্যেই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

"আর নিশ্চয় আমি পবিত্র কোরআনের হেফাজত করবো"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি পবিত্র কোরআনকে সর্ব প্রকার পরিবর্তন থেকে হেফাজত করবেন। আর হেফাজতের উপকরণ স্বরূপ খোলাফায়ে রাশেদ্বীনকে এই মহান কাজে নিয়োজিত করেছেন। এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম এই মহান কাজে আত্ম নিয়োগ করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদ্বীন পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ করে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বে তার কপি প্রেরণ করেছেন এবং সর্বত্র এর কপি পৌঁছে দেয়া হয়েছে। বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত একই ভাবে পবিত্র কোরআন লিখিত ও মুদ্রিত হচ্ছে। সমগ্র মুসলিম জাহান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। সমগ্র বিশ্ব মুসলিম একই কোরআন তেলাওয়াত করছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাই ইনশাআল্লাহ বিদ্যমান থাকবে।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে তাঁর প্রতি, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দিন"।

পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ মোতাবেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসলমানগণকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট থেকে কোরআন শিক্ষা করেছেন আর তারা ঐ কোরআনই অন্য মুসলমানগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

خيركم من تعلم القران وعلمه

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পবিত্র কোরআন নিজে শেখে এবং অন্যকে শেখায়"।

সাহাবায়ে কেরামের আমলে পবিত্র কোরআন শিক্ষা করা গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পবিত্র কোরআন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করতেন।

পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে গণ আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তার একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। একজন মোহাজের সাহাবীর বিবাহ স্থির হল। তিনি সর্বস্ব হারিয়ে শুধু ঈমানের সম্পদকে বুকে নিয়ে মদীনা

মোনাওয়্যারায় হিজরত করেছেন। স্ত্রীর মোহরাণা আদায়ের জন্যে তাঁর কাছে তখন কিছুই ছিল না, তাঁর এ অবস্থার কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জানানো হলে তিনি এরশাদ করলেনঃ

"তুমি পবিত্র কোরআনের যতখানি জান, তোমার স্ত্রীকে তা শিক্ষা দেবে। এভাবেই তোমার বিয়ের মোহরাণা আদায় হবে"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মোসায়লামাতুল কায্যাব নবুওয়্যতের দাবী করেছিল, তার সঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধ করেছিলেন, এ যুদ্ধটি ইয়ামামা নামক স্থানে হয়েছিল। এ যুদ্ধে অনেক হাফেজে কোরআন সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন। এ কারণে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে পবিত্র কোরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর সে সিদ্ধান্ত মোতাবেকই পবিত্র কোরআন লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়।[১]

এভাবে পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত হয়েছে। আর হাফেজগণের অন্তরে সংরক্ষিত হওয়ার কারণে পবিত্র কোরআনে বিলুপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত রয়েছে।

وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যাংশে অন্য একটি ব্যাখ্যাও করেছেন। তারা বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের সর্বনামটি দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, নিশ্চয় আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমি রসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজত করব, কোন দুশমন তাঁর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

একথাটি অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখেছেনঃ ইতিপূর্বে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা-ই উত্তম।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নুরুল কোরআন খণ্ড (১), পৃষ্ঠা-১৫-২৪
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (١٠) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١١)
كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (١٢) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ
خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا
فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَسْحُورُونَ (١٥) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦)
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (١٨) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١)

তরজমা

(১০) আর (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল প্রেরণ করেছিলাম।

(১১) তাদের নিকট যখনই কোন রসূল উপস্থিত হয়েছেন, তারা তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে।

(১২) এভাবে আমি পাপীষ্ঠদের অন্তরে তা সঞ্চার করি।

(১৩) তারা কোরআন করীমে বিশ্বাস করবে না। অতীতে পূর্ববর্তীদের এ আচরণই ছিল।

(১৪) আমি তাদের জন্য আসমানের দুয়ারও খুলে দেই এবং তারা সারা দিন তাতে আরোহন করতে থাকে।

(১৫) তবু তারা একথা বলবে যে, আমাদেরকে নজরবন্দী করে দিয়েছে, না তাও নয়, বরং আমাদেরকে যাদু করেছে।

(১৬) আর আমি আকাশের মধ্যে গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের চোখে সুন্দর করেছি।

(১৭) আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি।

(১৮) তবে যে চুরি করে শ্রবণ করে পালায়, জ্বলন্ত অংগার তার পেছনে ধাবিত হয়।

(১৯) আর পৃথিবীকে আমি বিস্তীর্ণ করেছি এবং তাতে পবর্তমালা স্থাপন করেছি। সব কিছুই আমি তাতে পরিমিত পরিমাণে উৎপন্ন করেছি।

(২০) আর তোমাদের জন্যে এবং যাদেরকে তোমরা জীবিকা দাওনা তাদের জন্যেও আমি তাতে জীবন ধারণের উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছি।

(২১) আর আমার কাছেই রয়েছে সব কিছুর ভাণ্ডার। আর নির্দিষ্ট পরিমাণেই আমি তা নাযিল করে থাকি।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, হে নবী! কাফেররা আপনার প্রতি যে জুলুম অত্যাচার করেছে, পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করেছে এবং আপনার প্রতি উপহাস করেছে এটি নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বেও আমি বিভিন্ন জাতির নিকট তাদের হেদায়েতের জন্যে রসূল প্রেরণ করেছি, অহংকারী, অবাধ্য লোকেরা তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সর্বযুগের সত্যদ্রোহী কাফের মুশকেরদের একই নীতি। যখনই তাদের নিকট কোন নবী রসূল প্রেরীত হয়েছেন তখন তারা নবী রসূলগণকে উপহাস করেছে এমনকি তাঁদেরকে পাগল, যাদুকর বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বিভিন্ন রকম অবান্তর ফরমায়েশ করে তাঁদেরকে বিরক্ত করেছে। হযরত মূসা (আঃ)-কে জালেম ফেরাউন পাগল বলেছিল, এমনি আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

যারা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, কোন অবস্থাতেই তারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত হয় না। আল্লাহর অবাধ্যতা এবং নাফরমানী তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক সত্যের প্রতি বিদ্রুপের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে দেন, যাতে করে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে এবং তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হয়, পরিণামে তাদের শাস্তি অবধারিত হয়।

তফসীরকার বলেছেন আলোচ্য আয়াতে مُجْرِمِيْنَ বলা হয়েছে মুশরেকদেরকে। তারা কোন অবস্থাতেই সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সংশোধনের জন্যে তথা তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন অথচ তারা তাঁকেই কষ্ট দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এ মর্মে যে, ইতিপূর্বে যারা নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে তারা তাদের কর্মকাণ্ডের শোচনীয় পরিণাম ভোগ করেছে। অতএব (হে রসূল!) যারা বর্তমানে আপনার বিরোধিতা করছে তাদের পরিণামও পূর্ববর্তী জালেমদের অনুরূপই হবে। যেভাবে তাদের পূর্ববর্তী বিদ্রোহীরা ধ্বংস হয়েছে এমনিভাবে এদের ধ্বংসও অবধারিত।

অতএব, আল্লাহর নবীর অনুসরণেই রয়েছে শান্তি, মুক্তি এবং সার্বিক কল্যাণ। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবীদের বিরোধিতাই বয়ে আনে মানুষের জন্যে ধ্বংস।[১]

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

এ কাফেররা পবিত্র কোরআনের উপর ঈমান আনবে না। তাদের পূর্ব পুরুষদেরও এ প্রথাই ছিল। অবশেষে আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নীতি অনুসারে তারা আল্লাহর নবীর উপহাসের শাস্তি স্বরূপ সর্বস্বান্ত হয়েছে। এদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেভাবে আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁদের প্রতি উপহাস করেছে এরাও ঠিক তাই করছে। অতএব, এদের পরিণতিও অনুরূপ ভাবে ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত সমূহে মক্কার কাফেরদের জন্যে উচ্চারিত হয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী যে, ইতিপূর্বে যারাই আল্লাহর রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

অতএব, তোমরা যদি আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে মশগুল হও, এবং আল্লাহর কোরআনকে অবিশ্বাস কর, তবে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ন্যায় তোমাদের ধ্বংসও হবে অনিবার্য।[২]

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ۝

যদি আমি তাদের জন্যে আসমানের দুয়ার খুলে দেই, এবং তাতে সারা দিন তারা আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা একথা বলবে যে, আমাদেরকে নজরবন্দী করে রেখেছে না তাও নয়; বরং আমাদেরকে যাদু করে রেখেছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৪
২। তফসীরে কবীর খণ্ড-১৯,পৃষ্ঠা-১৬৫

কাফেররা এ আস্ফালন করেছিল যে, যদি এই নবীর সমর্থনে ফেরেশতা আসত তবে আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনতাম, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

যদি কাফেরদের ফরমায়েশ মোতাবেক ফেরেশতাদেরকে তাদের নিকট অবতারণ করার স্থলে তাদের জন্যে আকাশের দুয়ারও খুলে দেই এবং তারা সর্বদা আকাশের দিকে আরোহন করতে থাকে, তবুও ঈমান এবং সত্য গ্রহণ তো দূরের কথা; বরং তারা বলবে এটি বুজরকী ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদেরকে নজরবন্দী করা হয়েছে, এমনকি আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে।

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا

"তবুও একথা বলবে যে আমাদের নজরবন্দী করে দিয়েছে"।

অর্থাৎ-যদি তাদের জন্যে আসমানের দুয়ারও খুলে দেয়া হয় আর ফেরেশতাদেরকে আসমানে আরোহন করতে তারা দেখে তবুও তারা ঈমান আনবে না। অথবা এর অর্থ হল যদি তাদের জন্যে আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয় এবং তারা নিজেরা আসমানের দিকে আরোহন করে তবুও তারা ঈমান আনবে না, বরং বলবে আমাদের নজরবন্দী করা হয়েছে, না বরং আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) سُكِّرَتْ শব্দটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। আর হাসান বসরী (রঃ) এ শব্দটির অর্থ করেছেন, আমাদের চোখের উপর যাদু করা হয়েছে। আর কালবী (রঃ) বলেছেন, আমাদেরকে অন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আমাদের পেছনে রেখে দেয়া হয়েছে। বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে এ বাক্যটির অনুবাদ করা হয়েছে, আমাদেরকে দেখা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ۝

বরং আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে যাদু করেছেন। নাউজুবিল্লাহ! কাফেররা সাধারণত একথা মনে করতো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রতি যাদু করতেন। এমনকি পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তারা মনে করতো যে এটি একটি যাদু, তারা সত্যকে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে।[১]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৫-৩৬

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের উপর কাফেরদের যে সব সন্দেহ ছিল, তার জবাব দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের বিবরণ শুরু হয়েছে। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের অগণিত বিস্ময়কর নির্দশন সমূহ্ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে بُرُوْجٌ শব্দটির অর্থ বড় বড় নক্ষত্র। অথবা চন্দ্র সূর্যের কক্ষ। অথবা ফেরেস্তাদের প্রহরাধীন আসমানী দুর্গ। তফসীরকারগণ এসব অর্থই বর্ণনা করেছেন। আতিয়া (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা শুধু ফেরেস্তাদের প্রহরাধীন আসমানী কেল্লাই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেখান থেকে অবাধ্য, শয়তানদেরকে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করা হয়।

وَزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ۝

"আর আমি আসমানকে সুন্দর করেছি"।

বস্তুতঃ মেঘবিহীন আকাশে অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের আলোয় উদ্ভাসিত মনোরম দৃশ্য দর্শকের চোখকে জুড়িয়ে দেয়, চিন্তাশীল মানুষের চিন্তার খোরাক যোগায়। মহান আল্লাহ পাকের নিখুঁত শিল্প–নৈপূণ্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে, এক আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের অপূর্ব মহিমা প্রকাশ করে, অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান দেয়।[১]

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ۝

"আর আমি আসমানকে প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করেছি"।

ফলে শয়তান আসমানবাসীকে প্রতারণা করতে পারেনা। অথবা আসমানের অবস্থা জানতে বা সেখানকার ব্যবস্থাপনায় নাক গলাবার জন্যে কেউ যেতে পারে না।[২]

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, পূর্বে আসমান পর্যন্ত শয়তানের গমনাগমনে বাধা ছিল না। এ কারণে শয়তান আসমানে গিয়ে অনেক খবর নিয়ে আসত এবং গণকদেরকে জানিয়ে দিত। যখন হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন তখন উপরের তিনটি আসমানে শয়তানের গমনাগমন বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্ম হয় তখন অবশিষ্ট চারটি আসমানেও শয়তানের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। এরপর শয়তান চুরি করে কোন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করলে তাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষেপ করা হয়। এভাবে শয়তানের গমনাগমন সম্পূর্ণ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৫
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৬

বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানরা ইবলিসের নিকট এ অবস্থার বর্ণনা দেয়, ইবলিস বলল, তোমরা জমিনে গিয়ে দেখ অবশ্যই কোন নতুন ঘটনা ঘটেছে। শয়তানেরা জমীনে এসে দেখে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন। তাই শয়তান বলে, আল্লাহর শপথ এটিই হল নতুন ঘটনা।[১]

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

"তবে যে চুরি করে শুনে পলায়ন করে, জ্বলন্ত অঙ্গার তার পেছনে ধাবিত হয়"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ চুরি করে আসমানী কথা শ্রবণ করে পলায়ন করার এবং পেছন থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হবার বিবরণ হল এই, শয়তানরা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত একের পর এক আরোহন করে সিড়ি নির্মাণ করে এবং চুরি করে ফেরেশতাদের কথা শ্রবণ করে। তখন ফেরেশতাগণ তাদের উপর জ্বলন্ত অংগার নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত অঙ্গারের কারণে কোন শয়তানের মৃত্যু হয় কেউ আহত হয় আর কোনটি পাগল হয়ে যায়।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ ঘোষণা করেন এবং সে ঘোষণা সম্পর্কে ফেরেশতাদের অবগত করেন আর নিষেধ ঘোষণা করেন, আর সে ঘোষণা যথানিয়মে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের নিকট নাযিল হয়। ক্রমান্বয়ে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত সে ঘোষণা প্রচারিত হয়। ফেরেস্তাগণ নিজেদের মধ্যে সে সম্পর্কে আলোচনা করে, ঐ সময়ই শয়তানেরা আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গোপনে তথ্য সংগ্রহের অপচেষ্ট করে। তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেনা কেননা, শয়তানের ঐ অপচেষ্টার সময় তাদের উপর আগ্নেয় গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। এর ফলে কেউ নিহত, কেউ আহত হয়। ঐ সময় দু'একটি কথা তারা জানতে পারে, তা অন্য শয়তানকে জানিয়ে দেয়। শয়তানেরা ঐ একটি কথাকে মূলধন করে আরো একশটি মিথ্যা কথা তার সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং নক্ষত্রবিদ বা জ্যোতিষীদের নিকট তা পৌছে দেয়। যদি তাদের হাজারো কথার মধ্যে কোন কথার অংশ বিশেষও সত্য প্রমাণিত হয় তবে তাদের ভক্তদের আনন্দ উল্লাসের সীমা থাকে না এবং নয়শত নিরানব্বইটি মিথ্যা কথার উপর একটি মাত্র সত্যের আবরণ ফেলতে সচেষ্ট থাকে।[৩]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন-কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৫
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৭
৩। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৪০

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক যখন আসমানে কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফেরেস্তাগণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশার্থে তাদের ডানা নাড়তে থাকে, ফলে এমন একটি শব্দ হয় যেমন পাথরের উপর জিঞ্জির রাখা হলে এক প্রকার শব্দ হয়। এরপর একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তখন ফেরেস্তাগণ বলেন, আল্লাহ্ পাক যা কিছু বলেছেন নিশ্চয় তা হক্ব, তিনিই সর্বশক্তিমান। ঐ মুহূর্তে যে শয়তানেরা আসমানী কথা চুরি করে শ্রবণে লিপ্ত থাকে, তারা দু'একটি কথা শ্রবণ করলে তাদের নীচে অপেক্ষমান শয়তানদেরকে জানিয়ে দেয়। এভাবে একের পর এক শয়তান একথা বলতে থাকে। আর সবচেয়ে যে নীচে থাকে সে যাদুকার বা গণকদের নিকট ঐ কথা পৌছে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নীচের শয়তানকে সে কথা জানাবার পূর্বেই তার উপর অগ্নি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, ক্ষেত্র বিশেষে জ্বলন্ত অংগার নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে তথ্য পৌছাতে সক্ষম হয়। যাদুকর এবং গণকদের নিকট আরো শত শত মিথ্যা কথা মিশিয়ে বর্ণনা করে এবং গণকদের নিকট থেকে লোকেরা এসব কথা শ্রবণ করে। একটি আসমানী কথার সত্য হওয়ার কারণে অন্য মিথ্যা কথাগুলোকে সত্যায়িত করা হয়। (বোখারী)

আল্লাম বগভী (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ফেরেস্তাগণ মেঘ-মালায় অবতরণ করে, যেখানে আসমানী কোন সিদ্ধান্ত হলে তার আলোচনা হয়। শয়তানরা গোপনে তা শ্রবণের চেষ্টা করে যা তারা গণকদের নিকট প্রকাশ করে। গণকরা তার সঙ্গে আরো একশটি মিথ্যা কথা মিশিয়ে বর্ণনা করে। এ বর্ণনা বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে।[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উর্দ্ধলোকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন, সুদৃঢ় এবং দুর্লঙ্ঘ, শয়তানরা সেখানকার কোন সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করতে পারে না। শুধু আংশিকভাবে কখনো দু' একটি কথা শ্রবণ করে আর তাতেও তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। বরং আল্লাহ্ পাকের মর্জিতেই তাঁর সৃষ্টি রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে এতটুকু অবকাশ দেয়া হয়েছে। কাফের মুশরেকরা চরম অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তি বিধান না করে যেমন অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক এমনিভাবে শয়তানদের ব্যাপারেও আল্লাহ্ পাক কিছুটা অবকাশ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। আর তাঁর প্রত্যেকটি কাজেই থাকে নিগূঢ় রহস্য নিহিত।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৭
তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৭

তৌহিদের প্রমাণ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের তৌহিদের প্রমাণ স্বরূপ উর্দ্ধলোকের সৃষ্টি রহস্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ মর্মে যে, তোমরা মহাকাশের প্রতি লক্ষ্য কর, চন্দ্র সূর্যের বিস্ময়কর কক্ষের দিকে চেয়ে দেখ। কক্ষ সমূহের আকৃতির গুণাবলী এবং বিভিন্ন অবস্থা বিস্ময়কর। চন্দ্র সূর্যের কক্ষগুলো বারোটি ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকেই বুরুজ বলা হয়, আর এ বারোটি বুরুজ আটাশটি মঞ্জিলে বিভক্ত আর প্রত্যেকটি বুরুজের জন্যে দু'টি করে মঞ্জিল রয়েছে। এ মঞ্জিলগুলো হল চন্দ্রের। আর প্রত্যেক বুরুজ বা কক্ষের জন্যে ত্রিশটি স্তর রয়েছে। এ হিসেবে বারটি বুরুজের জন্যে তিনশত ষাটটি স্তর রয়েছে। সূর্য যখন এ তিনশত ষাটটি স্তর অতিক্রম করে তখন তার একটি ভ্রমণ শেষ হয়। আর এটি হল সমগ্র উর্দ্ধলোকের ভ্রমণ, যা সূর্য এক বছরে এবং চন্দ্র আটাশ দিনে সম্পন্ন করে। এ ব্যাখ্যা তাদের নিকট যারা বুরুজকে চন্দ্র সূর্যের কক্ষ বলে। তবে মুজাহেদ এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'বুরুজ' শব্দের অর্থ হল বড় বড় নক্ষত্র।[১]

যাহোক, উর্দ্ধলোকে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের অনেক বিস্ময়কর নির্দশন রয়েছে, যা দেখে বুদ্ধিমান মাত্রকেই আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করতে হয়। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর সৃষ্টি রহস্য বুঝবার ক্ষমতা কারো নেই।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

"আর পৃথিবীকে আমি বিস্তীর্ণ করেছি, এবং তার উপর ভার চাপিয়ে রেখেছি আর সব কিছুই তার প্রতি পরিমিত পরিমাণে উৎপন্ন করেছি"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রমাণ স্বরূপ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিশাল পৃথিবীকে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেছেন। আর পৃথিবীর উপর বড় বড় পাহাড়কে সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়ের ভার চাপিয়ে জমিনকে স্থির করে রেখেছেন যাতে করে মানুষ পৃথিবীর উপর বসবাস করতে পারে। আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে। যেমন, এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

(এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে আমি আমার প্রতিনিধ নিয়োগ করবো।) এটিই ছিল মানব জাতির সৃষ্টির ঘোষণা। আল্লাহ্ পাক শুধু যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, বরং মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা বা অভিজাত সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৪

নয়, বরং মানুষের উপকারার্থেই এবং মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছু। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

(তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সব কিছ।) মানুষের জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পানাহারের সকল ব্যবস্থা তিনি করেছেন। মানুষ যাদের দ্বারা কাজ নেয়, যাদের জীবিকার দায়িত্ব মানুষের উপর ন্যস্ত রয়েছে এমন জীব-জন্তুর আহার্য আল্লাহ পাকই দান করেছেন।

وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ۝

(আর আমি সব কিছুই তাতে পরিমিত পরিমাণে উৎপন্ন করেছি) অর্থাৎ কোন সৃষ্টিই নিরর্থক নয়, নিষ্প্রয়োজনীয় নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে مَوْزُوْنٍ শব্দটির ব্যাখ্যা হল, আমি পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছি তার হেকমত রয়েছে তথা সৃষ্টি মাত্রই হেকমতপূর্ণ। প্রয়োজনীয় এবং পরিমাণ মোতাবেক। অথবা এর অর্থ হল পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছি তা অতি প্রয়োজনীয় এবং অতীব উপকারী। অথবা এর অর্থ হল, পৃথিবীতে আমি এমন জিনিস সমূহ সৃষ্টি করেছি যা অন্যান্য নেয়ামত সমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অথবা এর অর্থ হল, পৃথিবীতে আমি এমন খণিজ দ্রব্য সৃষ্টি করেছি যা ওজন করা হয়। যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তামা, সুরমা এমনিভাবে মূল্যবান পাথর ইয়াকুত, যবরজদ, ফিরোজা প্রভৃতি।[১]

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا

আলোচ্য আয়াতে তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তৌহীদের প্রমাণ স্বরূপ উর্দ্ধলোকের উল্লেখ করার পর এ আয়াতে জমীনের দলিল প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ পাক জমিনকে পানির উপর বিছিয়ে দিয়েছেন। এ পর্যায়ে দ্বিতীয় দলিল পেশ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ

“আর জমিনের উপর পাহাড়ের ভার চাপিয়ে দিয়েছি”।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৮

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন পানির উপর জমীন সৃষ্টি করলেন তখন তা নৌকার মত নড়াচড়া করতে লাগলো, তখন আল্লাহ পাক জমিনের উপর পাহাড়কে সৃষ্টি করলেন। ফলে জমীন স্থির হয়ে গেল। আল্লাহর একত্ববাদের তৃতীয় দলিল পেশ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে।

وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ

আর আমি তাতে সব কিছু পরিমিত পরিমাপে উৎপন্ন করেছি। অর্থাৎ মানব জাতির জন্যে যা প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন। আর সে অনুযায়ী আল্লাহ পাক সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।[১]

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ

আর তোমাদের জন্যে জমীনে আমি জীবন-উপকরণ সৃষ্টি করেছি। যথাঃ পানাহারের বস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র প্রভৃতি।

وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ۝

আর সে সব চতুঃষ্পদ জন্তুকে আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপকারার্থে, যাদের রিয্ক তোমরা দাওনা, আল্লাহ পাকই তাদের রিয্ক দান করে থাকেন।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ বাক্যটি অর্থ হল সন্তান-সন্ততি, গোলাম-বাঁদী, চতুঃষ্পদ জন্তু প্রভৃতি। কাফেররা মনে করতো, এদের রিয্কের দায়িত্ব তারা পালন করে, আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই তাদের রিয্ক দেন, তোমরা নও।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতে হেকমতের কথা ঘোষণা করেছেন, যা আসমান জমীন সৃষ্টির মাঝে রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা ঘোষণা করেছেন এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম দান রয়েছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[২]

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ

"সব কিছুর ভাণ্ডার আমার নিকটই রয়েছে"।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব কিছুর ভাণ্ডার আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। তাঁর কুদরতে হেকমত অনন্ত অসীম। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর চেয়ে অনেক গুণ বেশীও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন।

وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ۝

১। তফসীরে কবীর খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৭০-৭১
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৮

"তবে আমি নিদৃষ্ট পরিমাণেই তা পরিবেশন করে থাকি"।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) বলেছেন, পৃথিবীর স্থল ও সামুদ্রিক ভাগে আল্লাহ পাক যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাকের আরশে রয়েছে, এটিই আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)-এর কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন, "যেভাবে মানুষের সবকিছু তার অন্তরে থাকে, বাহ্যিকভাবে তার অন্তরের সেই ইচ্ছাগুলো কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিতে যা কিছু রয়েছে তার মহাপরিকল্পনা আল্লাহ পাকের আরশে রয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর বিচার বিবেচনা মোতাবেক তার সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে সব কিছুর সরবরাহ করেন তবে এতে সামান্যতম ব্যতিক্রম হয়না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خَزَآئِن শব্দটির অর্থ হল বৃষ্টি-অর্থাৎ বৃষ্টি হল সব কিছুর ভাণ্ডার। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসকে পানি থেকে আমি প্রাণ দিয়েছি। বর্ণিত আছে আসমান থেকে যে বৃষ্টির ফোটা পড়ে তার সঙ্গে একজন ফেরেশতা অবশ্যই আসে। যে ঐ বৃষ্টির ফোটাটিকে তার নিদৃষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয় যেখানে পৌঁছানোর হুকুম রয়েছে।[১]

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে সব কিছুই আছে তবে বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজন মোতাবেক তিনি তা পরিবেশন করে থাকেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে তিনি প্রত্যেকটি জিনিস পরিমাণ মোতাবেক উৎপন্ন করেছেন। আর তাতে মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ রেখেছেন। এরপর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে সব কিছুর ভাণ্ডার। আল্লাহ পাকই মানুষকে রিয্‌ক দিয়ে থাকেন। আর তা পরিমাণ মোতাবেক পরিবেশন করে থাকেন। অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ পাক প্রত্যেক বছর একটি নিদৃষ্ট পরিমাণ মোতাবেক বৃষ্টি নাযিল করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে তা থেকে বঞ্চিত করেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৯
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৭৩-৭৪

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ
فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾
وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ
مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ
مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২২) আর আমি মেঘবাহী বায়ু প্রেরণ করি, এরপর আসমান থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই। অথচ তোমাদের নিকট তো তার ভাণ্ডার নেই।

(২৩) আর নিশ্চয় আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যুমুখে পতিত করি, আর আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

(২৪) আর নিশ্চয় আমি জানি তাদেরকে যারা তোমাদের অগ্রগামী, আর যারা পেছনে থেকে যায় তাদেরকেও আমি জানি।

(২৫) (হে রসূল!) আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদেরকে একত্রিত করবেন, নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি মহাজ্ঞানী।

(২৬) আর নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পঁচা কাদা মাটির তৈরী খনখনে মাটি দ্বারাই।

(২৭) আর এর পূর্বে জ্বীনদেরকে সৃষ্টি করেছি লু' হাওয়ার অগ্নি দ্বারা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের একে একে চারটি দলিল বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে এ পর্যায়ে পঞ্চম দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ

আর মেঘবাহী বায়ু আমিই প্রেরণ করি। বস্তুতঃ বৃষ্টির পানি, মেঘমালা সবই মানব জাতির উপকারার্থে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেনে। এসব কিছুই করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আল্লাহ পাক তাঁর অসীম কুদরত হেকমত এবং গভীর জ্ঞান মোতাবেক এমন বায়ু প্রেরণ করেন যা মেঘ বহন করে, এরপর আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর বারিধারা বর্ষণ করেন। নদ-নদী, খাল-বিল সবই বৃষ্টির পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফরে চাষাবাদ এবং রকমারী ফল-ফসলের উৎপাদন এ পানি দ্বারাই আল্লাহ পাকের হুকুমে সুসম্পন্ন হয়। তিনি তোমাদের জন্যে পানি সরবরাহ করেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সব কিছু অকার্যকর করে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে সুস্বাদু পানীয়কে দুঃসহ করে তুলতে পারেন। আমরা যা কিছু অর্জন করি তা একমাত্র তাঁরই দান। সবইতো তাঁর সৃষ্টি, আর সব কিছুর ভাণ্ডার তাঁরই নিকট। যদি আল্লাহ পাক পানি বন্ধ করে দেন তবে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি, আর যখন অতিবৃষ্টি হয় তখনও আমরা বিপদের সম্মুখীন হই। অতএব, তাঁর দয়া এবং করুণা ব্যতীত আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। তাই আলোচ্য আয়াতে মানব জাতির প্রতি করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এরশাদ হয়েছে, আর আমি প্রেরণ করি মেঘ বহনকারী বায়ু।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ পাক যে বায়ু প্রেরণ করেন তা পানি বহন করে থাকে, মেঘমালা পানি নিয়ে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে বায়ুর মাধ্যমে চলতে থাকে। যেভাবে উষ্ট্রি দুধ দিয়ে থাকে তেমনি আকাশ থেকে বারি বর্ষিত হয়ে থাকে। ওবায়েদ এবনে ওমর বলেছেন, সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক সুসংবাদ প্রদানকারী বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর মেঘবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর বিক্ষিপ্ত মেঘমালাকে একত্রিতকারী বাতাস প্রেরণ করেন। এরপর এমন বাতাস প্রেরণ করেন যার কারণে বৃক্ষ সমূহে ফল আসে।

আবু বকর এবনে ইয়াশ বলেছেন, যে পর্যন্ত চার প্রকার বাতাস নিজ নিজ কাজ না করে সে পর্যন্ত বৃষ্টির একটি ফোটাও মাটিতে বর্ষিত হয়না। পূর্ব দিকের বাতাস মেঘমালাকে উঠিয়ে আনে, উত্তর দিকের বাতাস মেঘমালাকে একত্রিত করে, দক্ষিন দিকের বাতাসের কারণে বৃষ্টিপাত হয় আর পশ্চিম দিকের বাতাস মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেয়।[১]

একখানি হাদীসে রয়েছে, "লাওয়াকেহ" (لواقح) শব্দটির অর্থ দক্ষিনা বাতাস। যখনই দক্ষিনা বাতাস প্রবাহিত হয় তখন সঙ্গে আঙ্গুরের ছড়া নিয়ে আসে। এর পরিবর্তে যে বাতাস রয়েছে তাকে বলা হয় "রীহে আকীম" (ريح عقيم) তা আযাব নিয়ে আসে।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪০

আল্লামা বগভী (রঃ) ইমাম শাফী (রঃ) এবং তেবরানীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ যখনই কখনও সজোরে বায়ু প্রবাহিত হতো তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীতভাবে দোয়া করতেন- হে আল্লাহ! এই বাতাসকে রহমতে রূপান্তরিত কর, আযাবে পরিণত করোনা, হে আল্লাহ! এই বাতাসকে রহমতের বাতাস বানিয়ে দাও, আযাবের বাতাসরূপে প্রেরণ করোনা।

فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ

"এরপর আসমান থেকে পানি নাযিল করেছি যা তোমাদেরকে পান করতে দিয়ে থাকি"।

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَٰزِنِينَ۝

"আর তোমাদের কাছে তার ভাণ্ডার নেই"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ মানব জাতির প্রতি তাঁর আরো একটি বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন। আসমান থেকে বারিপাতের মাধ্যমে তোমাদেরকে পানীয় সরবরাহ করি। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সুস্বাদু পানীয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদেরকে প্রদান করা হয়, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তা পরিবর্তন করতে পারেন। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না। এ বিষয়টিকে সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছেন-

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ۝ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

"তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে ঐ পানিকে লবনাক্ত করে দিতে পারি, কেন তোমরা শোকর গোজার হওনা"? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেন?

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

"আর যিনি আমাকে খাবার প্রদান করেন এবং পানি পান করান"।

অতএব, এটি আল্লাহ পাকের নিতান্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালন পালন করছেন, আমাদের পানাহারের যাবতীয়

ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্‌ক দাতা, আর আমাদের জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ۝

"এবং জীবন ও মৃত্যু আমারই হাতে, আমিই তাদেরকে জীবন দিয়ে থাকি এবং আমিই তাদেরকে মৃত্যু-মুখে পতিত করি আর সবার শেষে আমিই থাকি"।

অর্থাৎ সকলেই চিরবিদায় গ্রহণ করবে, শুধু আমিই থাকবো। সৃষ্টির বিদায়ের পর স্রষ্টার বিরাজমান থাকাকে "ওয়ারাসাত" বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ মানুষের বর্তমান জীবন জীবিকা যেমন আল্লাহ্ পাকের হাতে, ঠিক তেমনি মানুষের পরিণামও তাঁরই হাতে। একে একে প্রতিটি মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, থাকবেন শুধু একমাত্র আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ

(সূরা আর রাহমান)

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের পবিত্র সত্ত্বা, যিনি মহিমাময়, যিনি মহানুভব"।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۝

আর আমি জানি তোমাদের যারা অগ্রগামী, এবং যারা পেছনে থেকে যায় তাদেরও জানি অর্থাৎ তোমাদের কোন অবস্থাই আমার নিকট গোপন নয়। মানুষের অতীত, বর্তমান এক কথায় সকলের যাবতীয় আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত। তিনি পূর্ব থেকেই সব কিছু জানেন, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী ঘটে আর আখেরাতেও তাঁর জ্ঞান অনুযায়ীই ইনসাফ কায়েম হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান যেসব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং কোন কিছুই যে তাঁর অজানা নয় একথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে সর্বময় ক্ষমতার জন্যে সামগ্রিক জ্ঞানের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ সকলের ব্যাপারে সামগ্রিক জ্ঞান আছে বলেই কেয়ামতের দিন সকলের প্রতি সুবিচার কায়েম করা হবে, কারও প্রতিই অবিচার করা হবে না।

الْمُسْتَقْدِمِينَ- الْمُسْتَأْخِرِينَ

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন, আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী হল যারা মৃত, আর পরবর্তী হল যারা জীবিত।

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল পূর্ববতী এবং পরবর্তী লোকেরা।

একরামা (রঃ) বলেছেনঃ পূর্ববর্তী লোকদের বলতে যারা জন্মলাভ করেছে, পক্ষান্তরে পরবর্তী বলতে যারা জন্মলাভ করেনি তাদের বোঝান হয়েছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতকে "মোস্তাক্দেমীন" বলা হয়েছে।

আর উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে পরবর্তী "মোস্তাখেরীন" বলা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "মোস্তাক্দেমীন" (পূর্ববর্তী) এবং "মোস্তাখেরীন" (পরবর্তী) শব্দে নামাজের সম্মুখের ও পেছনের কাতারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এববে মরদবিয়ার বর্ণনা হলো দাউদ এবনে সালেহ্ হযরত সহল এবনে হানীফ আনসারীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এ আয়াত কি জেহাদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে? হযরত সহল (রাঃ) বললেন, না এ আয়াত নাযিল হয়েছে নামাজীদের কাতার সম্পর্কে। মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা জেহাদে অংশ গ্রহণকারী সম্মুখের এবং পেছনের কাতার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

এবনে উয়াইনা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল যারা ইতিপূর্বে মুসলমান হয়েছে এবং যারা এখনও মুসলমান হয়নি। ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায়কারী এবং শেষ ওয়াক্তে নামাজ আদায়কারী।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য দুটি শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা আতা (রঃ)-এর সূত্রের বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের ১. "মোস্তাকদেমীন" শব্দের অর্থ, যারা আল্লাহর অনুগত। আর "মোস্তাখেরীন" অর্থ যারা অনুগত নয়।

২. مستقدمين অর্থ নামাজের প্রথম কাতারের লোক আর مستاخرين অর্থ নামাজের শেষ কাতারের লোক।

বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজের প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার জন্যে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। ফলে প্রথম কাতারে লোকদের ভীড় হয় তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এর অর্থ হল কে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪১

নামাজের প্রথম কাতারে রয়েছে আর কে শেষে তা আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন। এবং প্রত্যেকের নিয়ত অনুসারেই তাকে সওয়াব দান করা হবে।

৩. যাহ্যাক (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, জেহাদে অংশ গ্রহণকারী মুজাহেদ্বীনদের কাতার সম্পর্কে এ শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. المستقدمين। হল সে সব লোক যাদের মৃত্যু হয়েছে। المستاخرين। হল যারা জীবিত আছে।[১]

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন, নিশ্চয় আমি খুব ভালভাবেই জানি জন্ম, মৃত্যুর ব্যাপারে, অথবা ইসলাম গ্রহণে, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বা নামাজের জামাতে উপস্থিতিতে কে অগ্রগামী হয়েছে আর কে পেছনে রয়েছে, আল্লাহ পাক সকলের অবস্থা এবং নিয়ত সম্পর্কে অবগত। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্রিত করবেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ, তাৎপর্যবহ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অবশ্যই তাদেরকে একত্রিত করবেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি মহাজ্ঞানী। প্রত্যেককে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞানী। কে কোথায় আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। আল্লাহ পাকের ক্ষমতা অসীম, তাই কবরের মাটি, বা জীব-জন্তুর উদর, সমুদ্রের তলদেশে, বা শশ্মানের ছাইভস্ম যেখানেই থাকুক না কেন সেখান থেকে সকলকে একত্রিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি যে বিষয়ের উপর মৃত্যু বরণ করবে আল্লাহ পাক তাকে তার উপরই উঠাবেন। (আহমদ, বায়হাকী)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾

"আর নিশ্চয় আমি মানুষকে পঁচা কাঁদা মাটি দিয়েই সৃষ্টি করেছি, আর জ্বীনকে তৈরী করেছি লু হাওয়ার অগ্নি দ্বারা"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক অন্যান্য সৃষ্টির উল্লেখ করে তওহীদের প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। এ আয়াতে মানুষ ও জ্বীন জাতি সৃষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৭৮

মানুষের সৃষ্টি স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের শিল্প-নৈপূণ্যের এক অপূর্ব জীবন্ত নির্দশন। আলোচ্য আয়াতে الانسان শব্দটির উল্লেখ করে আদি পিতা আবুল বাশার হযরত আদম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মানুষের সৃষ্টি পদার্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, প্রথমটি হল صلصال অপরটি হল حما مسنون মাটিকে আগুনে পোড়ানো হলে যখন তা খনখন করে বাজতে থাকে, তাকে صلصال বলা হয়। আর পঁচা, দুর্গন্ধময় কাঁদা মাটিকে حما مسنون বলা হয়।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন صلصال হল সেই উত্তম পবিত্র কাঁদা, যার পানি শুষ্ক হওয়ার পর তাতে ছিদ্র হয়। আর যখন তাকে স্বস্থান থেকে সরানো হয় তখন খনখনে শব্দ হয়।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ দুর্গন্ধময় কাঁদা মাটিকে صلصال বলা হয়। যেমন, গোশ্‌ত যখন দুর্গন্ধ হয় তখন বলা হয় صل اللحم বা اصل اللحم আর এ শব্দটি থেকেই صلصال এর উৎপত্তি।

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রঃ) লিখেছেনঃ মাটিতে পানি মিশিয়ে প্রথমে কাঁদা তৈরী করা হয়, আর তা শুকিয়ে গেলে খনখনে শব্দ হতে থাকে। আর এভাবে মানবদেহ তৈরী হয়। মাটির বৈশিষ্ট্য এবং কাঠিন্য তাতে বর্তমান থাকে।

হযরত আদম (আঃ)-এর দেহ থেকে পানি শুকিয়ে যায় এবং তা খনখনে বা ঠনঠন করে বাজতে থাকে, তখন পর্যায়ক্রমে তাতে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সাধিত এবং তাতে আকৃতি দেয়া হয় যা পুতুলের মত তৈরী হয়। এরপর তাতে রুহ্ ফুঁকে দেয়া হয় তথা প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর (রঃ) লিখেছেনঃ حما مَّسْنُوْنٌ এবং طين لازب শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, মাটি এবং পানি মিশ্রিত করে তা বাতাসে শুকানো হয়। এরপর এক পর্যায়ে তাকে আগুনে পোড়ান হয় فخار শব্দ দ্বারা তা প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ এ আগ্নেয় ভাগই মানুষের দেহে শয়তানের শয়তানীর মূল উৎস। হয়তো এ কারণেই সূরা আর রাহমানে এরশাদ হয়েছেঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

১। ফওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৪১

"মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্র বিহীন অগ্নি শিখা থেকে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, মুজাহেদ এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ مسنون বলা হয় মন্দ এবং দুগর্ন্ধময় মাটিকে।

আরবরা যখন বলেন, مَنَنْتُ الماء তখন এর অর্থ হয় আমি পানি প্রবাহিত করেছি তথা মাটির উপর পানি প্রবাহিত করে মানব দেহের কাঠামো তৈরী করা হয়। এরপর তাতে আকৃতি দেয়া হয়, তা একটি পুতুলের ন্যায় তৈরী করা হয় এবং তাকে শুকানো হয়, যখন ভালভাবে শুকিয়ে যায় এবং খনখনে শব্দ হতে থাকে তখন তাতে রুহ ফুঁকে দেয়া হয়।[১]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি বলে সৃষ্টির প্রথম মানুষকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য আয়াতে الانسان বলে হযরত আদম (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নিকট ঈসার সৃষ্টি আদমের সৃষ্টির ন্যায়"। তাকে আল্লাহ পাক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক তাঁকে কাঁদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ

(আমি নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করব কাঁদা মাটি দ্বারা) আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে খনখনে মাটি দ্বারা। বিভিন্ন আয়াতের ঘোষণা দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা হল প্রথমে মাটি, এরপর কাঁদা, এরপর খনখনে মাটি দ্বারা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ পাক যে কোন জিনিস দিয়ে যে কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারেন। এটি শুধু তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জির ব্যাপার। মাটি, কাঁদা, এরপর এই সুন্দর আকৃতি এবং বিস্ময়কর প্রকৃতি এসবই আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নির্দশন। সব প্রশংসা তাঁরই, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই সবকিছুর একমাত্র সত্ত্বাধিকারী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪২

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ۝

জ্বীন সৃষ্টির উপরণ

"আর আমি জ্বীনকে তৈরী করেছি লু' হাওয়ার অগ্নি দ্বারা"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনম, "জান্ন" হল সকল জ্বীনের পিতার নাম। যেমন হযরত আদম (আঃ) ছিলেন সকল মানুষের আদি পিতা। হাসান বসরী এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ "জান্ন" শব্দ দ্বারা ইবলিসকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, জান্ন হল জ্বীনের পিতা এবং ইবলিস হল শয়তানের পিতা। জ্বীনদের মধ্যে কিছু মুসলমানও রয়েছে কিছু কাফেরও রয়েছে। তাদের জন্ম হয়, মৃত্যু হয় কিন্তু শয়তানদের মধ্যে কোন মুসলমান নেই এবং তাদের মৃত্যুও হয় না। যখন ইবলিসের মৃত্যু হবে তখনই সকল শয়তানের মৃত্যু হবে।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেনঃ কিছু জ্বীন মানুষের মত রয়েছে, তাদের সন্তান-সন্ততি হয় এবং তারা পানাহার করে। আর কিছু জ্বীন রয়েছে বাতাসের ন্যায়, তাদের সন্তান-সন্ততিও হয় না, তারা পানাহারও করেনা।

مِنْ قَبْلُ

অর্থাৎ-আদম সৃষ্টির পূর্বে আমি জ্বীন সৃষ্টি করেছি।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক জ্বীন সৃষ্টি করেছিলেন লু' হাওয়া থেকে।[১]

السَّمُوْمِ

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এটি সেই গরম বাতাস যা মানুষের দেহে তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে এবং তাকে ধ্বংস করে।

কালবী (রঃ) আবু সালেহ (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, السموم। একটি অগ্নি যা আসমান এবং তার নিম্নদেশের মাঝের আবরণ হিসেবে থাকে। এটি ধূম্রবিহীন হয়, কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন 'নারুস সামুম' হল অগ্নি শিখা আর অন্য তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এটি হল দোযখের অগ্নি।

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফেরেশতাদের একটি বিশেষ শাখার নাম হল জ্বীন। এ শাখাকে আল্লাহ পাক লু' হাওয়া দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ইবলিস তাদেরই অন্যতম।

এতদ্ব্যতীত, সকল ফেরেশতাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৮

যাহোক, এ আয়াতে দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক জ্বীন সৃষ্টি করেছেন অগ্নি মিশ্রিত সূক্ষ্ম বায়ু থেকে যা অত্যন্ত উত্তপ্ত। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা এবং আদি জ্বীনকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইবলিস শয়তান এ জ্বীন সম্প্রদায়েরই অন্যতম।[১]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ
ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ
ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾
قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(২৮) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন ফেরেশতাদেরকে আপনার প্রভু বললেন, পঁচা কাঁদার তৈরী খনখনে মাটির দ্বারা আমি একটি মানুষ সৃষ্টি করবো।

(২৯) এরপর যখন আমি তাকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার তরফ থেকে রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হও।

(৩০) তখন ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রে সেজদা করলো।

(৩১) কিন্তু ইবলিস শুধুমাত্র সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।

(৩২) আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইবলিস! তোমার কি হল, তুমি যে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

(৩৩) সে বললো, পঁচা কাঁদার তৈরী খনখনে মাটি দ্বারা যে মানুষকে আপনি তৈরী করেছেন আমি তাকে সেজদা করবার নই।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪২

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যখন খনখনে মাটি দ্বারা আদমের দেহ তৈরী করে তাতে রূহ ফুঁকে দেব তথা প্রাণ সঞ্চার করব, আর এভাবে একটি জড় পদার্থ জীবন্ত মানবে রূপান্তরিত হবে, তখন তোমরা তাকে সম্মানসূচক সেজদা দেবে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আদম (আঃ)-এর পূর্বে মাটি দ্বারা কোন মখলুক সৃষ্টি করা হয়নি। যেহেতু মাটিতে রয়েছে বিনয় এবং নম্রতার বৈশিষ্ট্য, তাই আদম (আঃ) কে আল্লাহ্ পাক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যেন আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে বিনীত ভাবে হাযির হয়, আর আল্লাহ্ পাকের অনুগত বন্দা হয় এবং বন্দেগীর সুউচ্চ স্থানে পৌঁছতে পারে কেননা, প্রত্যেকটি জিনিসই তার মূলের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

মূলতঃ এ কারণেই হযরত আদম (আঃ) বিনয়ের গুণ অর্জন করেছিলেন। যখন জান্নাতের জীবনে তাঁর দ্বারা একটি ভুল হয়েছিল, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবরে বিনীত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। পক্ষান্তরে ইবলীসকে অগ্নি দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, তাই সে অহংকার করে এবং মাটির তৈরী আদমকে হেয় মনে করে, অহংকার এবং হিংসা তাকে এমনভাবে অন্ধ করে তোলে যে, আল্লাহ্ পাকের হুকুম অমান্য করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন স্বয়ং হযরত আদম (আঃ)-কে তৈরী করেছিলেন এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে মনোনীত করেছেন এবং ফেরেস্তাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরা আদমকে সম্মানসূচক সেজদা দাও। আলোচ্য আয়াতে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌۢ

"আর স্মরণ করে সে সময়কে যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, "আমি পঁচা কাঁদার তৈরী খনখনে মাটি দ্বারা একটি মানুষ তৈরী করব। যখন আমি তার দেহকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদাবনত হও"।

তফসীরকরগণ বলেছেন, এটি ছিল সম্মানসূচক সেজদা। পূর্বকালের শরীয়তে এ ধরণের সম্মানসূচক সেজদা বৈধ ছিল।

আলোচ্য আয়াতে مِنْ رُّوْحِىْ এরশাদ হয়েছে, অর্থাৎ আমার রূহ বলা হয়েছে। তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের আদম (আঃ)-এর রূহকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হল বিশেষ সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ মানব রূহের উচ্চ মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার নিমিত্তেই আল্লাহ্ পাক রূহকে নিজের রূহ বলে আখ্যা দিয়েছেন

অর্থাৎ সরাসরি আমার আদেশক্রমে রূহ আদমের দেহে প্রবেশ করেছে, তথা তাঁর প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে।

অথবা মানব রূহকে আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজের রুহ্ এজন্যে বলেছেন যে, শুধু মানব রূহের মধ্যেই আল্লাহ্ পাকের নূরের তাজ্জালী গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে, অন্য কোন সৃষ্টির এ যোগ্যতা নেই। মানুষের দেহের তৈরীতে যেহেতু মাটির অংশ সমধিক, তাই বলা হয় যে মানুষকে মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু মানব দেহে শুধু মাটিই নয়, আরো কিছু পদার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন, পানি, বাতাস, অগ্নি প্রভৃতি। মানুষকে আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাতের, তাঁর নূর বা জ্যোতি বিকীরণের এবং তাঁর প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা অনুভব করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে। মানুষের এ পরিপূর্ণতার কারণেই তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে।

فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ۝

(অতএব, তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হও।)

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ل কে الى এর অর্থে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তোমরা আদমের দিকে ফিরে সেজদা কর। যেভাবে মানুষকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মানুষ কা'বাকে সেজদা করেনা, বরং আল্লাহ্ পাককে সেজদা করে কাবামুখী হয়ে কেননা, আল্লাহ্ পাকের নূরের তাজ্জালীর কেন্দ্র হল কাবা শরীফ, এটি কা'বা শরীফের বৈশিষ্ট্য। এজন্যে কেবলামুখী হয়ে সেজদা করার নির্দেশ রয়েছে সমগ্র মানব জাতির প্রতি। ঠিক এমনিভাবে আদম (আঃ)-এর দিকে ফিরে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ফেরেস্তাদেরকে।

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ۝

ফেরেস্তারা সকলে সম্মিলিভাবে তখন সেজদা করল,

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ

এতদ্বারা একথা বোঝা যায় যে, হয়তো কিছু ফেরেশতা সেজদা করেছে, কিন্তু যখন كلهم শব্দটি সংযোজিত হয়েছে তখন এর অর্থ হল সকল ফেরেশতাই সেজদা করেছে। তবুও একথাটি থেকে যায় যে, তারা কি একই সঙ্গে সকলে সেজদা করেছে? নাকি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করেছে, এরপর যখন اجمعون শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তখন প্রমাণিত হয়েছে যে সকলে সমবেতভাবে সেজদা করেছে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ ফেরেশতারা আদমকে (আঃ) এজন্যে সেজদা করেছে যে, তারা আদম (আঃ)-এর মাঝে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য প্রত্যক্ষ করেছে অথবা, এটি শুধু আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনার্থেই করেছে। আর اجمعون كلهم বাক্য দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে, সকলে সমবেতভাবে একই সঙ্গে সেজদা করেছে, তবে

যে সেজদা করেনি তথা সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে হল ইবলিস। সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে সে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কেননা, হযরত আদম (আঃ) যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছেন- ইবলিস এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন করা যে একান্ত জরুরী এ সত্যও সে উপলব্ধি করেনি। যেহেতু ইবলিস ফেরেস্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, বরং সে ছিল জ্বীনদের অন্যতম, তাই সে আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করেছে।

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾

"আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ হে ইবলিস! তোমার কি হল তুমি যে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? অথবা তুমি কেন সেজদা করলে না"?

قَالَ لَمۡ أَكُن لِّأَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهُۥ

"ইবলিস বলল, আমি এমন মানুষকে সেজদা করতে পারব না, যাকে তুমি খনখনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ, অথচ আমাকে সৃষ্টি করে অগ্নি দ্বারা"।

অভিশপ্ত ইবলিস নিজেকে উত্তম মনে করেছিল অথচ সে এ সত্য উপলব্ধি করেনি, উচ্চ মর্যাদা সম্মান নির্ভর করে শুধু আল্লাহর পাকের হুকুমের উপর। তিনি যাকে সম্মানিত করেন, সে-ই সম্মানিত হয়। আর তিনি যাকে অপমানিত করেন, সে-ই অপমানিত হয়। ইবলিস এ সত্যও উপলব্ধি করেনি যে, ফেরেশতাগণ নূর দ্বারা সৃষ্টি, তারা নূরানী সৃষ্টি, তারা কখনও আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেনা, এ নূরানী সৃষ্টিও আল্লাহ পাকের মনোনীত প্রতিনিধি আদম (আঃ)-কে সেজদা করেছে।

অথচ ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য, একথা ইবলিসের অজানা ছিল না।

যাদেরকে আল্লাহ পাক নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারা যখন আদম (আঃ)-কে সেজদা করেছেন, তখন যাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তার এ ব্যাপারে আপত্তি করার কোন অধিকার নেই এবং কোন যুক্তিও নেই।

মূলতঃ ইবলিস অহংকার এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে আদম (আঃ)-কে সেজদা দিতে অস্বীকার করেছে।

مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ

আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ হে ইবলিস! তোমার কি হয়েছে, তুমি কেন সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না, সে বলল, পঁচা কাঁদার তৈরী খনখনে মাটি দ্বারা যে মানুষকে সৃষ্টি করেছ, আমি তাকে সেজদা করবার নই।

অন্য আয়াতে ইবলিসের ঔদ্ধ্যত্বপূর্ণ বক্তব্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

أَنَا خَيۡرٌ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٍ

ইবলিসের ধ্বংসের কারণ

"আমি তার চেয়ে উত্তম, আমাকে সৃষ্টি করেছ অগ্নি দ্বারা, তাকে সৃষ্টি করেছ কাঁদা মাটি দ্বারা"।

মূলত ইবলিসের এ অহংকার এবং আদম (আঃ)-এর প্রতি তার হিংসাই তার ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ
الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ
مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ
بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৩৪) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তাহলে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা কেননা, নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত।

(৩৫) এবং বিচারের দিন পর্যন্ত তোর প্রতি রইলো আমার লা'নত।

(৩৬) ইবলিস বললো, হে আমার প্রতিপালক! তবে আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

(৩৭) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুই তাদের অন্তর্ভুক্ত।

(৩৮) উক্ত নির্দৃষ্ট দিন পর্যন্ত।

(৩৯) ইবলিস বললো, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেমন আমাকে পথহারা করলেন, তেমনি আমিও পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপাচারকে শোভন করে তুলবো এবং আমি তাদের সকলকেই পথহারা করবো।

(৪০) তবে আপনার মনোনীত বান্দাগণকে নয়।

(৪১) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, এটিই আমার নিকট পৌঁছাবার সরল পথ।

(৪২) যারা তোর অনুগামী হয় সেই পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আমার বান্দাগণের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না।

(৪৩) আর নিশ্চয় তোর অনুসারীদের সকলের নির্ধারিত স্থান হবে দোযখ।

(৪৪) দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে, প্রত্যেক দরজার জন্যেই তাদের এক একটি দল বিভক্ত রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন যে, ইবলিস অহংকারের কারণে আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালন করেনি, এমনকি সে নিজেকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট মনে করেছে। তবে এ ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে সে দলিল পেশ করারও আস্পর্ধা দেখিয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাকে অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত তার প্রতি লা'নত দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝

তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা কেননা, নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত। কেয়ামত পর্যন্ত তোর প্রতি লা'নত হোক, সর্বকালের জন্যে তুই অভিশপ্ত।

فَاخْرُجْ

(বেরিয়ে যা) প্রশ্ন হল কোথা থেকে বের হবে? ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল, জান্নাত থেকে বের হওয়া, অথবা আসমান থেকে বের হওয়া, অথবা এর অর্থ হল ফেরেশতাদের দল থেকে বের হওয়া। এভাবে আল্লাহ্ পাক তাকে বেহেশত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তার উপর লা'নত দিয়েছেন, সে হয়েছে মরদুদ এবং অভিশপ্ত।[১]

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৮৩

"আর কেয়ামত পর্যন্ত তোর উপর আমার লা'নত হতে থাকবে"।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ কেয়ামত পর্যন্ত কথাটির অর্থ এই নয় যে, কেয়ামতের পর সে অভিশপ্ত থাকবেনা; বরং এর অর্থ হল চিরকাল তার প্রতি আল্লাহর লা'নত এবং অভিশাপ হতে থাকবে কেননা, আখেরাতে দোযখের অনন্ত শাস্তি তার জন্যে চির নির্ধারিত রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যখন আমার অবাধ্য হলে তথা আমার আদেশ অমান্য করলে অতএব, তুই জান্নাত থেকে বা আসমান থেকে বা ফেরেশতাদের দল থেকে বেরিয়ে যা, তোর উপর চিরদিন লা'নত হতে থাকবে। তুই আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বহিষ্কৃত।

অথবা এর অর্থ হল, যদি ভবিষ্যতে কোন দিন তুই আসমানের নিকটবর্তীও হয়েছিস তবে তোর উপর জ্বলন্ত অঙ্গার বর্ষিত হবে, প্রস্তর খণ্ডের মত তোর উপর নক্ষত্রপুঞ্জ নিক্ষিপ্ত হবে। আলোচ্য আয়াতে ইবলিসের জন্যে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। এর পাশাপাশি রয়েছে ইবলিস শয়তানের আপত্তিকর জবাব। কেননা, ইবলিস দাবী করেছিল যে সৃষ্টির দিক থেকে সে হযরত আদম (আঃ) থেকে উত্তম, এ আয়াতে ইবলিসের এ শয়তানী প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্ব, উচ্চ মর্যাদা প্রভৃতি আল্লাহ পাকের আদেশক্রমেই হয়, সৃষ্টির কোন উপকরণের মাধ্যেমে তা নির্ধরিত হয় না। যে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, এটিই হল তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

"আর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোর প্রতি লা'নত হতে থাকবে"। এরপর যখন আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির সিদ্ধান্ত হবে তখন তোর জন্যে চিরশাস্তি ঘোষিত হবে। অথবা এর অর্থ হল, কেয়ামত পর্যন্ত তোর প্রতি লা'নত হতে থাকবে, এরপর এমন শাস্তি দেয়া হবে যার কারণে দুনিয়ার লা'নতের কথাও ভুলে যাবে। আর একথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কেয়ামত পর্যন্ত শাস্তির কথা ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো চিরকাল শাস্তির কথা প্রকাশ করা। আল্লামা বগভী লিখেছেন, ইবলিস আসমানে অভিশপ্ত এবং জমীনেও সে অভিশপ্ত। আর আসমান জমীনের স্রষ্টা আল্লাহ পাকও তার প্রতি লা'নত করেছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ[১]

وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৬
তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৪১

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, লা'নতের অর্থ হল আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া অতএব, ইবলীস চিরদিন আল্লাহ্ পাকের লা'নত ভোগ করতে থাকবে।

ইবলীস শয়তান যখন তার শাস্তির কথা শ্রবণ করলো এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হল তখন সে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ লাভের আবেদন করলো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْٓ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ۞

"হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন"। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন,

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ۞

"তোমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হল"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে

اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۞

(নিদৃষ্ট সময়) পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ দেয়া হল) এ নিদৃষ্ট সময় কোন্টি এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। নিদৃষ্ট সময় অর্থ হল প্রথম শিংগায় ফুঁক দেয়ার সময় যখন সকলেই মৃত্যুবরণ করবে, আর নিদৃষ্ট সময় এজন্যেই বলা হয়েছে যে, একথা সর্বজনবিদিত তখন সকলেরই মৃত্যু হবে। অথবা নিদৃষ্ট সময় এজন্যে বলা হয়েছে যে ঐ সময়টি সম্পর্কে শুধু আল্লাহ্ পাকই অবগত, আর কেউ নয়। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে কেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান"।[১]

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْٓ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ

ইবলিস বলল, হে পরওয়াদেগার! আমাকে যখন বিতাড়িত করেছেন এবং লা'নত দিয়েছেন এমন অবস্থায় আমাকে একটু অবকাশ দান করুন, কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দেবেন না অর্থাৎ যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৮৪

আল্লাহ পাক ইবলিসের আরজী কবুল করলেন যে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হবে-

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ "যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয় তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত"।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ ইবলীসের দোয়া কবুল হওয়া তার প্রতি কোন সম্মান নয়, বরং তার দুর্ভাগ্য এবং বিপদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এর মাধ্যমে। কেননা, তার জীবনকাল বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তার অপরাধের ফিরিস্ত দীর্ঘ হওয়ার বাস্তব ব্যবস্থাই হয়েছে।[১]

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেনঃ ইবলীসকে অবকাশ দেয়ার অন্য কারণ হল এ পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র, এখানে কর্ম, আখেরাতের তার ফল ভোগ করতে হবে প্রতিটি মানুষকে। এর পাশাপাশি এ পৃথিবী মানুষের পরীক্ষাগারও। প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেকটি কথা এবং কাজে মানুষের পরীক্ষা হয়। কে আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত আর কে অবাধ্য, কে আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসারী আর কে নয় একথার পরীক্ষা হচ্ছে সর্বত্র। ইবলিসই মানুষকে আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও নাফরমান হতে প্ররোচনা দেয়। তাই পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে ইবলিসকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

তবে এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইবলিস কোন মানুষকে অন্যায় কাজে বাধ্য করতে পারে না। শুধু মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারে মাত্র। আর এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক একাধিকবার ইবলিসের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন।[২]

সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"আমি কি তোমাদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়োনা। নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু"।

কোন কোন তফসীরকার একথা লিখেছেন, ইবলিস শয়তান কেয়ামত পর্যন্ত যে অবকাশ চেয়েছিল, তথা তাকে মৃত্যু না দেয়ার আরযী পেশ করেছিল তা এ কারণে

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৭
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৪১

যে, কেয়ামত পর্যন্ত যদি মৃত্যু না আসে, আর কেয়ামতের পরে কারো মৃত্যু হবে না, এমনিভাবে সে মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

অর্থাৎ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, চিরদিনের জন্যে নয়। এ নির্দিষ্ট কাল কি এর ব্যাখ্যা একাধিক।

(১) প্রথম শিংগায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত।

(২) অথবা প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত।

(৩) অথবা ইবলীস ততদিন জীবিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ পাক তার জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন, যা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না।

অর্থাৎ একথার এলম শুধু আল্লাহ্ পাকেরই আছে।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দিলে সৃষ্টি মাত্রেরই মৃত্যু হয়ে যাবে, সে পর্যন্ত ইবলিসকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

আর কোন তফসীরকার বলেছেনঃ দু'বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার সময়ের ব্যবধান হবে চল্লিশ বছর। এ সময়ের মধ্যেই ইবলীসের মৃত্যু হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, সে মুহূর্তেই ইবলিসের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায় আর সে শোক প্রকাশ করে ক্রন্দন করতে শুরু করে। বর্ণিত আছে যে, ইবলিসই সর্ব প্রথম ক্রন্দন করেছিল। অভিশপ্ত ও শোকাহত হওয়া সত্ত্বেও হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতিহিংসার কারণে ইবলিস কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার আরযী পেশ করেছিল।[২]

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

"ইবলিস বললো, হে আমার প্রতিপালক! মানুষের জন্যেই তো আমার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো তাই আমিও মানুষকে দেখিয়ে দেব, পৃথিবীকে তাদের সম্মুখে আকৃষ্ট করে তুলবো এবং তাদেরকে পথহারা করবো, তাদের থেকে আমার প্রতিশোধ নেব"।

অথবা এর অর্থ হল ইবলীস আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছে, যেহেতু আমাকে পথহারা করেছেন তাই আমিও মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করব। নাফরমানী কাজকে তথা পাপাচারকে লোভনীয় মোহনীয় করে তুলব, সকলকে পথভ্রষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১০
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৩, পৃষ্ঠা-৮

কিন্তু যারা মনোনীত একনিষ্ঠ বিশেষ বন্দা, তাদেরকে আমি পথহারা করতে পারব না। তবুও তাদের ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি করব না। যাদেরকে আপনি হেদায়েত করবেন, তারা আমার দ্বারা প্ররোচত হবে না কেননা, তাদের মধ্যে এখলাসের গুণ থাকবে।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ এ এখলাস তথা একনিষ্ঠতাই আমার নৈকট্য ধন্য হবার সঠিক পথ। এটিই সোজা সরল সঠিক পথ। এতে আঁকা বাকা কিছু নেই। অর্থাৎ যারা শুধু এবং শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ পায়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হল হক্ব বা সত্যের পথ সোজা সরল পথ।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল হক্ব বা সত্য পথ যা আল্লাহ্ পাকের দিকে নিয়ে যায়, অন্য কোন দিকে নয়। আর আখফাশ (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হল সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব। এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর মনোনীত বন্দাদেরকে গোমরাহী ও পথভ্রষ্ঠতা থেকে রক্ষা করবেন। শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্ পাকই তাদেরকে হেফাজত করবেন। আর এ পর্যায়ে তারা সরাসরি আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভ করবে।

ইমাম কেসায়ী (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী যেমন কেউ যদি তার শত্রুকে বলে যে, তুমি আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না, ঠিক তেমনি এ আয়াতেও ইবলীসের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যেমন সূরা ওয়াল ফাজরে আল্লাহ্ পাক এভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

'নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন'।

ইমাম কেসায়ীর তফসীরের প্রেক্ষিতে هذا। সর্বনামটি দ্বারা ইবলীসের পথের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা সে নিজের জন্যে অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পথ।[১] আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৭-৪৮

যারা তোর অনুগামী, সেই পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আমার বন্দাদের উপর তোর কোন জোর চলবে না। যারা আমার খাঁটি বন্দা তারা তোর আক্রমণ থেকে, তোর চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যারা তোর অনুসারী হবে, তারা নিক্ষিপ্ত হবে দোযখে।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা এই, যারা পথভ্রষ্ট যারা দিশেহারা, তাদের উপরই শয়তানের প্ররোচনা কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্ পাকের একনিষ্ঠ এবং বিশিষ্ট বন্দা, তাদের উপর শয়তানের জোর চলবে না, আল্লাহ্ পাকই তাদের হেফাজত করবেন।

কেননা, শয়তান কাউকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করতে পারেনা, শুধু মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারে, মন্দ কাজের প্রতি সে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে, কেয়ামতের দিন সে নিজেই বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ

অর্থাৎ– তোমাদের উপর আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, শুধু কথা এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে (মন্দ কাজের জন্যে) আহবান করেছি আর তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ۞

নিশ্চয় যারা শয়তানের ফাঁদে পড়বে, তার অনুগামী হবে, তাদের সকলের জন্যে দোযখ তৈরী হয়ে আছে।

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ط

দোযখের বিবরণ

দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ এখানে সাতটি দরজা বলে দোযখের সাতটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এ সাতটি স্তর হল (১) জাহান্নাম, (২) লাযা, (৩) হোতামা, (৪) সায়ীর, (৫) সাকার, (৬) জাহীম, (৭) হাবিয়া।

এবনে মোবারক এবং ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর "আজ যোহদ" নামক গ্রন্থে এবং এবনে জরীর ও এবনে আবিদ্দুনিয়া দোযখের অবস্থার বর্ণনায় লিখেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) তাঁর এক হাত আরেক হাতের উপর রেখে আঙ্গুলগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন করে বলেছিলেন, দোযখের দরজাগুলো এভাবে একটির উপর আরেকটি হবে। একটি স্তর শেষ হলে আরেকটি স্তর দোযখীদের দ্বারা পরিপূর্ণ করা হবে। এভাবে সাতটি স্তর পূর্ণ করা হবে।

আল্লামা বগভী হযরত আলীর (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক জান্নাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন অর্থাৎ একটি জান্নাতের উপর আরেকটি জান্নাত নেই। কিন্তু দোযখকে একটির উপর আরেকটি তৈরী করেছেন। দোযখের প্রথম স্তর হল জাহান্নাম। এরপরের স্তর হল লাযা, এরপরের স্তর হল হোতামা, এরপরের স্তর হ'ল সায়ীর, এরপর সাকার, এরপর জাহীম এবং এরপর হাবীয়া।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জাহান্নাম শব্দটি দোযখের একটি বিশেষ স্তরের নাম এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্পূর্ণ দোযখ অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১]

لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۝

"প্রত্যেক দরজার জন্যেই এক একটি দল বিভক্ত রয়েছে"।

শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেনঃ যেভাবে বেহেস্তের আটটি দরজা রয়েছে, যা নেককারকের মাঝে বন্টন করা হবে, ঠিক এমনিভাবে দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে যা বদকারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। হয়ত বেহেস্তের একটি দরজা এজন্যে বেশী রয়েছে যে, কোন কোন তৌহিদ পন্থীকে আল্লাহ পাক শুধু তাঁর মহান দানে ধন্য করেই জান্নাতে নেবেন, আমলের ভিত্তিতে নয়। আর আমলের ভিত্তিতে যারা জান্নাতে যাবেন তাদের জন্যে সাতটি দরজা রয়েছে, এমনিভাবে দোযখেরও সাতটি দরজা রয়েছে।[২]

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, দোযখের প্রথম স্তরে সেই তৌহিদ-পন্থীরা থাকবে, যাদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে দোযখে প্রবেশ করানো হয়। তাদের গুনাহ বা পাপকার্য হিসেবেই তাদেরকে দোযখে রাখা হবে। এরপর ঈমানের কারণেই তাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। দোযখের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে নাছারা। তৃতীয় স্তরে ইহুদী, চতুর্থ স্তরে সাবী, পঞ্চম স্তরে মজুসী (অগ্নিপূজক), ষষ্ঠ স্তরে মুশরেক বা পৌত্তলিক এবং সপ্তম স্তরে থাকবে মুনাফেকরা।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগ শেষ হওয়ার পরে যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর আবির্ভাবের পরও তারা নাছারা বা খ্রীষ্টান রয়ে গেছে, তারাই দোযখের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে। এমনিভাবে, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের পর যারা ইহুদী রয়ে গেছে, পরবর্তী নবীর শরীয়ত মেনে চলেনি, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতিও ঈমান আনেনি এমনকি, তাঁর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আনেনি,

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৯
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭১

তাঁর শরীয়ত মেনে চলেনি, সেই ইহুদীদের শাস্তি হবে, দোযখের তৃতীয় স্তরে। আর সাবী হল সেই তওহীদ-পন্থী লোক যারা কোন নবীর শরীয়ত মানে না। একটি বর্ণনায় রয়েছেম তারা নিজেদেরকে হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসারী মনে করে। আর মজুসী হল অগ্নিপূজক এবং নক্ষত্রের পূজারী। মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ[১]

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় মুনাফেরকরা দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জাহান্নামের সাতটি দরজা তথা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে একটি স্তর তাদের জন্যে রয়েছে যারা আমার উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। অথবা তিনি বলেছেন, যারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাল্লামের উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।

কুরতবী (রঃ) বলেছেনঃ দোযখের প্রথম স্তরের নামই জাহান্নাম। এ স্তরে অন্য স্তরের চেয়ে কম আযাব রয়েছে। এ উম্মতের গুনাহগারদের জন্যে জাহান্নাম বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। আর জাহান্নামকে "জাহান্নাম" এজন্যে বলা হয় যে, তার অগ্নি নারী-পুরুষ উভয়ের চেহারা পরিবর্তন করে দেবে এবং তাদের গোশ্‌ত খেয়ে ফেলবে। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর হল হাবিয়া। এটি সর্বাধিক গভীর।

বাজ্যার হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোজখে এমন একটি স্তর রয়েছে যাতে সে সব লোকই থাকবে, যারা আল্লাহর গজবকে ডেকে নিজের ক্রোধকে প্রমশিত করেছে এবং আল্লাহর গজবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি।

ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) সংকলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে কষ্টদায়ক, বিপজ্জনক, দুর্গন্ধময় দরজা হল সেই ব্যভিচারীদের জন্যে যারা জেনে শুনে ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে।

বায়হাকী খলিল এবনে মুর্র্যার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা মুলক এবং সূরা হামীম আস সেজদা পাঠ না করে নিদ্রিত হতেন না এবং এরশাদ করতেন, হামীম বিশিষ্ট সূরা হল সাতটি, আর দোযখের স্তরও হল সাতটি। কেয়ামতের দিন ঐ সাতটি সূরার মধ্যে 'হামীম আস সেজদা' এসে দোযখের দরজায় দাঁড়িয়ে যাবে এবং আরয করবে, 'হে আল্লাহ! যে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৪৯

ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান রাখত এবং আমাকে পাঠ করত, সে এতে প্রবেশ করবে না'।[১]

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ কোন কোন দোযখীর পায়ের গিরা পযন্ত অগ্নি হবে। আর কোন দোযখীর কোমর পর্যন্ত। আর কোন কোন দোযখীর ঘাড় পর্যন্ত অগ্নি থাকবে।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ গুনাহ এবং নাফরমানীর বিচারে যে দোযখী যেমন শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তাকে দোযখের সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। অথবা দোযখীদের সংখ্যা যেহেতু অনেক হবে, তাই তাদের জন্যে সাতটি দরজা রাখা হয়েছে।[৩]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ﴿٤٥﴾
اُدْخُلُوهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ
اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ
مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَ
اَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيمَ ﴿٥١﴾
اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৫) নিশ্চয় পরহেযগারগণ বাস করবে বাগান ও ঝর্ণামালায়।

(৪৬) তাদেরকে বলা হবে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে এতে প্রবেশ কর।

(৪৭) আর আমি তাদের অন্তরের মনোমালিন্য দূর করে দেব। তারা ভাই ভাই হয়ে ভ্রাতৃত্ব ভাব নিয়ে একে অন্যের সম্মুখে আসন গ্রহণ করবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫০
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১০
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫ ৪২

(৪৮) সেখানে তারা কোন প্রকার কষ্ট পাবেনা এবং কেউ তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে না।

(৪৯) (হে রসূল!) আমার বন্দাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৫০) আর আমার শাস্তিও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

(৫১) আর তাদেরকে জানিয়ে দিন ইব্রাহীমের মেহমানের কথা।

(৫২) যখন তারা তার গৃহে প্রবেশ করে এবং সালাম বলে তখন সে বলেছিল, আমরা তোমাদের আগমনের কারণে আতঙ্কিত।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۞

শানে নুযুল

সা'লাবীর বর্ণনা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াত-

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

(তাদের সকলের জন্যে দোযখের ওয়াদা রইলো) এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র হযরত সালামান ফারসী (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত এবং বিহবল হয়ে পলায়ন করেন। তিনদিন পর্যন্ত তিনি পলায়নপর ছিলেন। অবশেষে তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমেত হাযির করানো হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) আরজ করেন ঃ এ আয়াত

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ

যখন নাযিল হয় তখন আমার অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়। শপথ সেই আল্লাহর পাকের, যিনি আপনাকে সত্যের বাহক করে প্রেরণ করেছেন, এ আয়াত দ্বারা আমার অন্তর খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পাপীষ্ঠদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে নেককার ঈমানদার পরহেযগার লোকদেরকে আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দান করবেন

১। তাফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫০

তার উল্লেখ রয়েছে। আর মুত্তাকী পরহেযগার হল সে সব লোক যারা আল্লাহ্ পাকের তৌফিকে শয়তানের প্রতারণা এবং প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে। ইবলীস শয়তানের শত চেষ্টাতেও তারা দুনিয়ার পাগল হয় না, বরং আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকে। এরশাদ হয়েছেঃ[১]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ

বেহেশ্তের বিবরণ

নিশ্চয় যারা পরহেযগার হবে, যারা সৎ ও সত্য পথের অনুসারী হবে, যারা শয়তানের ধোকা থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলবে, আল্লাহ্ পাকের শাস্তির ভয়ে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আশায় পাপাচার পরিহার করবে, তারা জান্নাতের চিরসুখ লাভ করবে। বেহেশতের মনোরম বাগানে তারা জীবন যাপন করবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর এবং নিশ্চিন্তে জান্নাতে বাস কর।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا

"আর আমি তাদের অন্তরের মনোমালিন্য দূর করে দেব"।

বেহেশতবাসীদের বৈশিষ্ট্য

অর্থাৎ দুনিয়াতে যেভাবে পরস্পরের মধ্যে হিংসা হয়, মনোমালিন্য থাকে বেহেশতবাসীদের মধ্যে এসব কিছু মোটেই থাকবে না। কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের নাম মাত্রও থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে থাকবে ভ্রাতৃত্ব এবং মমত্ববোধ। বেহেশতবাসীগণ নিতান্ত ভাই ভাই হয়ে নিঃশংক চিত্তে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে বেহেশতে অবস্থান করবে।

মূলতঃ এ হল বেহেশতবাসীদের বৈশিষ্ট্য। মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ এমনকি, মনোমালিন্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেমন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে "জামাল" এবং "সিফফীন" নামক যুদ্ধের সময় পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বেই মানুষের পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য দূর করে দেবেন বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর সংগীগণ উভয়ে পরহেযগার ছিলেন। তাঁরা জান্নাতবাসী হয়েছিলেন। দুনিয়াতে তাঁদের মাঝে যে মনোমালিন্য হয়েছিল তা বেহেশতে প্রবেশের পূর্বেই বের করে দেয়া হবে বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্যে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, আমি তালহা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) আমরা সে সব লোক যাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে-

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৯১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭১

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا...

(আমি তাদের অন্তরের মনোমালিন্য দূর করে দেব।)

বর্ণিত আছে যে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে ফেতনা হয়েছিল, তখন সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হয়েছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) ঐ ফেতনায় শাহাদাত বরণ করেন। হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ) 'জামালের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আবদুল্লাহ এবনে আহমদ 'জাওয়ায়েদুজ জহদ' নামক গ্রন্থে একটি বর্ণনার উদ্বৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের ফটক পর্যন্ত যখন পৌঁছবে তখন একে অন্যের প্রতি ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখবে, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ বের করে দেয়া হবে, তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাবে।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে غل শব্দটির অর্থ দুনিয়ার জীবনের হিংসা-বিদ্বেষ নয়; বরং এর অর্থ হলো জান্নাতে বিভিন্ন মর্তবার পার্থক্য হবে। এ পার্থক্যের কারণে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ হবে না। কেউ কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে না।

عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ۞

অর্থাৎ তারা একে অন্যের সম্মুখে আসন গ্রহণ করবে। এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হান্নাদ মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধতি দিয়েছেন যে, জান্নাতবাসীগণ কেউ কারো পেছনে থাকবে না।

আল্লামা বগভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, জান্নাতবাসীগণ যখন তাদের কোন মোমেন ভাইয়ের সাথে মোলাকাত করতে ইচ্ছা করবে তখন যে কুষনে সে আসন গ্রহন করবে সে কুষন তাকে তার ভাইয়ের নিকট পৌঁছে দেবে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত এবং কথাবার্তা হবে।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ۞

"বেহেশতবাসীর কোন কষ্ট হবে না এবং জান্নাত থেকে তাদেরকে কখনও বের করা হবে না"।

এ আয়াতে জান্নাতবাসীদের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতে জান্নাতবাসীদের কোন প্রকার কষ্ট হবে না। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করতে থাকবে। জান্নাতবাসীগণ যা ইচ্ছা করবে বা যা আকাংখা করবে সঙ্গে সঙ্গে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবে, কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না। আর কোন আকাঙ্ক্ষা এতটুকু বিলুপ্ত করা হবে না তাই তাদের কোন কষ্টও হবে না।

এজন্যে মরমী কবি বলেছেনঃ

بہشت آنجاکه آزارے نه باشد = کسے راباکسے کارے نه باشد

"বেহেশত এমনি একটি স্থান যেখানে কোন প্রকার কষ্ট হবে না, কারো কাছে কারো কোন ঠেকা থাকবে না"।

তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, বেহেশতবাসীদের কোন প্রকার কষ্ট হবে না।

وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ

(আর তাদেরকে বেহেশত থেকে বের করা হবে না।)

অর্থাৎ বেহেশতের অনন্ত অসীম সুখ শান্তি তারা চিরদিন ভোগ করবে। বেহেশতের আনন্ত উল্লাস হবে চিরস্থায়ী, কোন নেয়ামতই অপূর্ণ থাকবে না। কোন দুঃখ কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। হাদীস শরীফে আছে, জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে হে জান্নাতবাসী! তোমরা এখন চিরসুস্থ, কোন রোগ তোমাদের কাছেও আসবে না, তোমাদের জীবন অনন্ত, তোমাদের মৃত্যু নেই, তোমরা বেহেশতের চির অধিবাসী। অতএব, জান্নাতের নেয়ামত সমূহ শুধু যে পরিপূর্ণ তাই নয়, বরং চিরস্থায়ীও। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার প্রতি এ আদেশ হয়েছে যে, আমি খাদিজাকে জান্নাতে স্বর্ণ নির্মিত মহলের সুসংবাদ জানাই, যেখানে কোন চিৎকার নেই, কোন কষ্ট নেই, আর জান্নাতবাসীকে কখনও জান্নাত থেকে বের করা হবে না।

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ জান্নাতবাসীগণকে বলা হবে হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনও রুগ্ন হবে না, সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু আসবে না, তোমরা সর্বদা যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধকাল আসবে না, আর জান্নাতেই থাকবে, কখনও তোমাদেরকে এখান থেকে বের করা হবে না।[১]

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

"(হে রসূল!) আমার বন্দাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর আমার শাস্তিও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক"।

শানে নুযুল

একদিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাবে বনী শায়বার দিক থেকে হরম শরীফের দিকে আগমন করেছিলেন। তখন তিনি কয়েকজন

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১১

সাহাবায়ে কেরামকে হাস্যরত দেখে বলেছিলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা জান্নাত এবং দোজখের অবস্থা শ্রবণ করছ, দোযখ তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, এতদসত্ত্বেও তোমরা কি করে হাসছ? একথা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দু'হাত তুললেন, এমন সময় জীব্রাঈল (আঃ) আসলেন এবং এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আমার বন্দাদেরকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করবেন না। তাদেরকে আপনি জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। কিন্তু এ সুসংবাদ থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ্র অবাধ্য ও নাফরমান থাকে, তাদের উদ্দেশ্য এ সর্তকবাণী উচ্চারণ করুন, নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

আল্লামা বগভী কাতাদা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম কাতাদা বলেছেনঃ আমাদের নিকট হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা পৌঁছেছে যে, তিনি এরশাদ করেছেনঃ যদি বন্দা আল্লাহ্ পাকের ক্ষমা করার পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হত তবে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকত না। পক্ষান্তরে তারা যদি আল্লাহ্র আযাবের পরিমাণ সম্পর্কে জানত, তবে ভয়ে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে যেত।

তিরমিজী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি মোমেন বন্দা আল্লাহ্র আযাবের কথা জানত তবে জান্নাতের আশাই ছেড়ে দিত। আর কাফেররা যদি আল্লাহ্র রহমতের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হত, তবে জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন যে, রহমতের সৃষ্টির দিন আল্লাহ্ পাক ১০০শ' রহমত সৃষ্টি করেন, তন্মধ্যে ৯৯টি রহমত নিজের কাছে রেখে দেন। আর ১টি রহমত সমগ্র সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে দেন। যে রহমত সমূহ আল্লাহ্ পাকের নিকট রয়েছে, যদি কাফেররা সে সম্পর্কে অবগত হয় তবে তারা জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হবে না। আর যে আযাব আল্লাহ্ পাকের নিকট রয়েছে যদি মোমেনগণ সে সম্পর্কে অবগত হয়, তবে দোজযখের শাস্তি সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত হবে না।

ইমাম আহমদ এবং ইমাম মুসলিম হযরত সালমান (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক জমিন আসমান সৃষ্টির দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক রহমত আসমান জমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান। তন্মধ্যে একটি রহমত পৃথিবীতে দিয়েছেন, ফলে মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং পশু পক্ষী পরস্পরকে ভালোবাসে, আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত পশ্চাতে রেখে দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন এ রহমতকে ঐ রহমত সমূহের সঙ্গে একত্রিত করা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে নিজেকে গফুর (অত্যন্ত ক্ষমাশীল) এবং রহীম (অতিশয় দয়াময়) বলেছেন। আর আযাবের ব্যাপারে বলেছেন তার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু নিজেকে আযাব দাতা বলে বর্ণনা করেননি। অথচ আযাব দেয়াও তাঁরই কাজ। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মাগফেরাত ও রহমত গজবের চেয়ে অধিকতর।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ ۞

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর নবুওয়্যতের প্রমাণ বর্ণনা করেছেন। এরপর তাঁর একত্ববাদ বা তৌহীদের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এরপর কেয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি নেককার ও বদকারদের অবস্থা ও পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমতের কথা এবং তাঁর কঠিন কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর করুণা এত বেশী যে, ইবলিস শয়তানের মনেও আশা আকাঙ্ক্ষা জাগে। আর তাঁর ক্রোধ এত বেশী যে, আজরাইলও ভয় কাঁপে থরথর।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট ফেরেশতাদের আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সন্তান প্রদানের সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন ফেরেশতাগণ। এর পাশাপাশি ঐ ফেরেশতাগণই হযরত লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ জাতির শাস্তি বিধানের জন্যেও প্রেরিত হয়েছেন। একদিকে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদের জন্যে রহমত এবং করুণা প্রেরণ করেছেন, অন্যদিকে অবাধ্য কাফেরদের জন্যে নেমে আসছে কঠোর কঠিন শাস্তি। মূলতঃ এখানেই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা। আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম। আর গযবও কঠিন। মানুষের কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আর কখনও তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর গযবকে তরান্বিত করা উচিত নয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ

(হে রসূল!) যদি লোকেরা আমার রহমত এবং গযবের কথা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে ইব্রাহীমের মেহমানদের কথা জানিয়ে দিন। এ মেহমান ছিল আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা। আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট তাঁর পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দিয়ে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ এসেছিলেন মানব আকৃতিতে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে মেহমান ভেবে

বকরী জবেহ করে ভুনা গোশ্‌ত মেহ্‌মানদের সম্মুখে রাখেন। কিন্তু তারা খাবারের দিকে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ না করায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আতঙ্কিত হন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝

"নিশ্চয় আমরা তোমাদের আগমনের কারণে আতংকিত"।

ফেরেশতাগণ একদিকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে তাঁর পুত্র এসহাক (আঃ)-এর সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। অন্যদিকে হযরত লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের আদেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে তিনি প্রথমে তাঁর মেহ্‌মান ভাবেন এবং তাদের মেহ্‌মানদারীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাদের আচার আচরণে তিনি বিস্মিত হন। শুধু বিস্ময়ই নয়, বরং তিনি কিছুটা আতঙ্কিতও হন, এ আতঙ্কের বা ভয়ের কারণ কি ছিল এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ বলেছেন, এর একটি কারণ হল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন তখন তাদের চেহারায় কহর এবং আযাবের নির্দশন পরিলক্ষিত হয়। অথবা এর কারণ হল তারা অসময়ে এসেছিল এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীতই তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিল। অথবা এ ভয়ের কারণ হল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেহ্‌মানদের সম্মুখে যে খাবার পরিবেশন করেছিলেন তা তারা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আশঙ্কা করলেন যে, হয়তো এরা দুশমন হবে। এ কারণে তাঁর মনে ভয়ের উদ্রেক হয়।

وَجِلُوْنَ

'ওয়াজল' শব্দটি অর্থ হল কোন আসন্ন বিপদের কারণে মানব-মনের অস্থির ও ব্যাকুল হওয়া।

ইমাম রাজী (রঃ) وجلون শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন خائفون অর্থাৎ আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। আর ভয়ের কারণ হল যেহেতু তারা খাবার গ্রহণে অস্বীকৃত জানিয়েছে এবং অসময়ে অনুমতি ব্যতীত তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছে।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ তদানীন্তন কালে যখন কোন আগন্তুকের মেহ্‌মানদারীর লক্ষ্যে খাবার পরিবেশন করা হত, আর আগন্তুক সে খাবার গ্রহণ না করতো তখনই ধারণা করা হতো যে আগন্তুক কোন ভাল উদ্দেশ্যে আসেনি, বরং ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যেই এসেছে। আর এটিই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভয় এবং আতঙ্কের কারণ।

قَالُوا
لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن
مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ
الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ
مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

তরজমা

(৫৩) আগন্তুকরা বললেন, ভয় করবেন না, নিশ্চয় আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দান করছি।

(৫৪) ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি আমাকে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায়ও এ সুসংবাদ দিচ্ছ? তোমরা এখন কিসেরই বা সুসংবাদ দান করছো?

(৫৫) তারা বললেন, আমরা সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, অতএব আপনি নিরাশ হবেন না।

(৫৬) ইব্রাহীম বললেন, একমাত্র পথভ্রষ্ট ব্যতীত আর কেউ তার প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হতে পারেনা।

(৫৭) ইব্রাহীম জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর প্রেরিতগণ! তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

(৫৮) তারা বললেনঃ আমরা এক পাপীষ্ঠ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

(৫৯) তবে লুতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, নিশ্চয় আমরা তাদের সকলকে রেহাই দেব।

(৬০) শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী রক্ষা পাবেনা। আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৬১) অতঃপর যখন ফেরেশতাগণ লুতের পরিবারের নিকট উপস্থিত হন।

তফসীরুল কোরআন

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ۞

মেহমানরা বললেন, আপনি ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে একটি জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দেই অর্থাৎ আপনার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে যে বয়স্ক হয়ে বড় আলেম হবে। জ্ঞানে-গুণে, বুদ্ধি-বিবেচনায় সে হবে আদর্শ এবং অদ্বিতীয়। শুধু তাই নয়, সে নবুওয়্যতের উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে।

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ۞

এ সুসংবাদে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিস্মিত হন, কেননা তিনি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বৃদ্ধ। এমনি অবস্থায় সন্তান লাভের সুসংবাদ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এর পাশাপাশি এমন সুসংবাদে আনন্দিত হওয়াও স্বাভাবিক।

فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ

অর্থাৎ- এমন কথার সুসংবাদ তোমরা দিচ্ছ, যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে না। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার এ বার্ধক্যাবস্থায় সন্তান কিভাবে লাভ হবে তাতো বোধগম্য হচ্ছে না।

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথার জবাবে ফেরেশতাগণ আরও জোর দিয়ে বলেন, আমরা আপনাকে সুসংবাদ যা দিয়েছি তা সত্য, তা আল্লাহ পাকের হুকুম যা পরিবর্তন হওয়ার নয়।

فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ۞

অতএব, আপনি কোন অবস্থাতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না, আপনি এ বৃদ্ধ বয়সেও পুত্র সন্তান লাভ করবেন। আল্লাহ পাকের কুদরত অনন্ত অসীম, তিনি পিতা-মাতা ব্যতীতও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে সন্তান দেয়া কোন বিস্ময়কর বিষয়ই নয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর নবী, আল্লাহর বন্ধু, তিনি আল্লাহর কুদরতের কথা অস্বীকার করছিলেন না, কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ এমনটি ঘটেনা, এজন্যে তিনি বিস্মিত হন।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দু'টি কথার সুসংবাদ দেয় (১) সন্তান লাভের সুসংবাদ (২) যেমন তেমন সন্তান নয়; বরং সে হবে জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ।

عَلِيۡمٍ

শব্দটির ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তারা এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে আপনার পর আপনার এ সন্তান নবুওয়্যত লাভ করবেন। আর কেউ বলেছেন যে, তারা এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, এই সন্তান দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানী হবে।[১]

قَالَ وَمَنۡ يَّقۡنَطُ مِنۡ رَّحۡمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوۡنَ۝

ইব্রাহীম বললেন, যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না, অর্থাৎ যারা আল্লাহর রহমত সম্পর্কে ওয়াকেফ নয়, যারা মা'রেফাতে এলাহীতে অজ্ঞ, যারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত, তাঁর অন্তহীন এলম এবং মহান কুদরতের ব্যাপকতা সম্পর্কে অবগত নয়, তারাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এমনই গুনাহ যেমন আল্লাহর গজব থেকে নিঃশঙ্ক হওয়া। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নই, কেননা আল্লাহ রহমত থেকে শুধু পথভ্রষ্ট লোকেরাই নিরাশ হয়, আল্লাহ্ পাকের মহান কুদরত সম্পর্কেও আমি সন্দিহান নই, শুধু আমার বার্ধক্যের কারণে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে।

قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ اَيُّهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ۝

ইব্রাহীম জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট ছিল, যেমন হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত মরয়ম (আঃ)-কে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে একজন ফেরেশতাই প্রেরিত হয়েছিল। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ফেরেশতাদের আগমনের বিষয়টি আরও গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ অনুভূত হলো। তিনি মনে করলেন, ফেরেশতাদের আগমনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, শুধু সুসংবাদ দেয়ার জন্যে ফেরেশতাদের একদলের আগমন হয়নি। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! আর কি উদ্দেশ্যে তোমরা প্রেরিত হয়েছ? এতদ্ব্যতীত, যদি শুধু সন্তান লাভের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে আগমন হয় তবে তারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট পৌঁছা মাত্রই এই সুসংবাদ দিত। এই সুসংবাদ তো দিল তাঁর ভয় দূর করার নিমিত্তে, তারা তো এসেছিলেন মেহমান

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৯৬

হিসেবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

قَالُوۡۤا اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰی قَوۡمٍ مُّجۡرِمِیۡنَ۝

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ জাতির শাস্তির জন্যে প্রেরিত হয়েছি। তবে লুত (আঃ)-এর পরিবারবর্গ ও যারা তাঁর অনুসারী তাদেরকে ধ্বংস করার আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়নি।

اِنَّا لَمُنَجُّوۡهُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ۝ اِلَّا امۡرَاَتَهٗ

(আমরা লুতের স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের আর সকলকে রক্ষা করবো।)

قَدَّرۡنَاۤ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الۡغٰبِرِیۡنَ۝

লুত (আঃ)-এর স্ত্রীর ধ্বংস হওয়া স্থির-নিশ্চিত। মূলতঃ কোন ব্যক্তি বা সমাজকে ধ্বংস করা বা রক্ষা করা শুধু আল্লাহ্ পাকেরই কাজ আর কারো নয়, কিন্তু যেভাবে সরকারী কর্মচারীরা সরকারীর সিদ্ধান্তকে নিজেদের সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করে ঠিক তেমনি ফেরেশতাগণও এ পর্যায়ে قدرنا শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এতদ্ব্যতীত, যেহেতু ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ পাকের বাণী বাহক, তাঁদের প্রতিটি কথা ও কাজ আল্লাহ্ পাকেরই কথা ও কাজ হয়, তাই এ উক্তি করা হয়েছে।[১]

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করছেন যে, আমরা আল্লাহ্ পাকের হুকুমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, লুত (আঃ)-এর স্ত্রী ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। লুত (আঃ) এবং তাঁর পরিবারের অন্য সদ্যস্যদের রক্ষা করা হবে। হযরত লুত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতঃষ্পুত্র ছিলেন।

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوۡطِ ۣالۡمُرۡسَلُوۡنَ۝

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে বিদায় নিয়ে ফেরেশতাগণ লুত (আঃ)-এর বাড়ীতে পৌঁছলেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫৪

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾
وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ
وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾
وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا
تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

তরজমা

(৬২) লুত বলেনঃ তোমরা তো অচেনা লোক মনে হয়।

(৬৩) তারা বললেন না, আমরা সেই জিনিষ নিয়েই আপনার নিকট এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করে।

(৬৪) এবং আমরা আপনার নিকট সঠিক সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্য কথা বলছি।

(৬৫) অতএব, আপনি রাতের কোন এক সময়ে আপনার পরিবারবর্গ সহ বের হয়ে পড়ুন। আর আপনি সকলের পেছনে থাকবেন। কেউই যেন পেছন ফিরে না তাকায়। আর সকলে যেখানে যাওয়ার হুকুম সেখানেই চলে যাও।

(৬৬) এবং আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, ভোর হতে না হতেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।

(৬৭) এদিকে শহরবাসী উল্লাস করতে করতে হাযির হয়।

(৬৮) লুত বলেনঃ এরা আমার মেহমান অতএব, তোমরা আমাকে অপমানিত করোনা।

(৬৯) আর তোমরা আল্লাহর ভয় কর এবং আমাকে অপমান করোনা।

তফসীরুল কোরআন

ফেরেশতারা যখন হযরত লুত (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছে, এতদ্ব্যতীত তোমরা এ নগরীতে সম্পূর্ণ নবাগত, তোমরা এখানকার লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নও।

ইমাম রাযী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ হযরত লুত (আঃ) ফেরেস্তাদেরকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি, কেননা ফেরেস্তারা সুন্দর, অল্প বয়স্ক যুবকের বেশে সেখানে হাযির হয়েছিলেন, তিনি ভয় করলেন যে, তাঁর পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় এ আগন্তুক মেহমানদের সঙ্গে কোন মন্দ আচরণ না করে বসে। সেজন্যে তিনি তাদেরকে বললেন, মনে হচ্ছে তোমরা অপরিচিত অর্থাৎ আমি তোমাদের পরিচয় পাইনি, কি উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছ তা-ও আমি জানি না, তখন ফেরেশতারা আত্ম পরিচয় দিলেন।

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ۝

তারা বলেন, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আমরা মানব আকৃতিতে হাযির হলেও আমরা-মানব সন্তান নই, আমরা ফেরেশতা এবং আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, আপনার পাপীষ্ঠ জাতির শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে। এ দুবৃত্তরা যে আযাব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত এবং যে বিষয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত হত, আমরা সে বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা নিয়ে এসেছি। ফেরেশতাগণ সর্বদা সত্য মীমাংসা নিয়েই নাযিল হয়। আমরা যে সংবাদ আপনাকে দিচ্ছি তা ধ্রুব সত্য, জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আপনি তাদের থেকে নাজাত পাবেন। আমরা সত্যবাদী, নিতান্ত সত্য কথাই আপনাকে বলছি। ফেরেশতারা আরো বললেন, এখানকার কর্মসূচী হল-

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ

কিছু রাত থাকতে আপনি স্বীয় পরিবারবর্গ সহ গৃহ থেকে বের হয়ে পড়ুন এবং নিজে সকলের পেছনে থাকুন।

তফসীরকারগণ এ নির্দেশের কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, পেছনে থাকলে সঙ্গী সাথীদের তত্ত্বাবধানে সুবিধা হয়। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতও এটিই ছিল। তিনি যখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যুদ্ধে গমন করতেন তখন সকলের পেছনে থাকতেন, যাতে করে দুর্বলদের দেখা-শুনা করা সহজ হয়।[১]

অথবা পেছনে থাকার আরেকটি কারণ হতে পারে এই যে, পেছনে থাকলে সকলকে দ্রুতবেগে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কেননা, হযরত লুত (আঃ)-এর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১৩

পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর আযাব শুরু হওয়ার পূর্বেই যেন তাঁরা সে এলাকা থেকে বের হয়ে যান, এটিই ছিল কাম্য।

وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ

এ পর্যায়ে আরেকটি কর্মসূচী হল, এ স্থান থেকে হিজরত করার সময় কেউ যেন ভুলক্রমেও পেছনে ফিরে না তাকায়। কেননা, পাপীষ্ঠ লোকদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব শুরু হবে, তখন তাদের হাহাকার আর্তনাদ শ্রবণ করে যদি তাদের দিকে ফিরে তাকায় এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে যদি কারো অন্তরে সহমর্মিতার সৃষ্টি হয়, তবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ সে-ও শাস্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ এর অর্থ হলো যদি কেউ কোন কারণে লুত (আঃ)-এর সঙ্গে যেতে না পারে, ঐ শহরে পাপীষ্ঠাদের সঙ্গেই থেকে যায় তবে সেও আযাবে গ্রেফতার হবে। আর কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যটির এ অর্থও বলেছেনঃ কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়, অর্থাৎ দেশ ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার অলসতা যেন না থাকে, বরং যথাসাধ্য দ্রুতবেগে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যাও। আর ক্ষণিকের জন্যেও পেছনে তাকাবে না, বরং যত দ্রুত সম্ভব গজবের স্থান ছেড়ে চলে যাও।

وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ۝

আর তোমরা যেখানকার হুকুম সেখানে যাও। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যেখানে যাওয়ার হুকুম হয়েছে, সেখানে চলে যাও। হযরত লুত (আঃ)-কে কোথায় যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় কোন ঘোষণা নেই, তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সিরিয়া চলে যাওয়ার হুকুম হয়েছিল তাঁর প্রতি। আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, জর্ডান যাওয়ার আদেশ হয়েছিল। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ জীব্রাঈল (আঃ) পথ-নির্দেশক হিসেবে ছিলেন, তিনি যে স্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন, সেখানে যাওয়ার আদেশ হয়েছিল।[১]

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ۝

"আর আমি লুতের নিকট এ আদেশ প্রেরণ করি যে ভোর হতে না হতেই তাদের শেকড় কেটে যাবে"।

অর্থাৎ তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হবে। তাদের মূলোৎপাটন করা হবে। তাদের কেউ থাকবে না। আর এটিই আল্লাহ পাকের অটল সিদ্ধান্ত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৫
তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২০১

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ۝

"আর শহরবাসী অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে হাযির হয়"।

অর্থাৎ সদুম নামক নগরীর দুবৃত্তরা যখন শ্রবণ করে যে, অল্প বয়সী সুশ্রী যুবকের দল হযরত লুত (আঃ)-এর মেহমান হয়েছে তখন তারা মনে করে যে, তাদের মনের মত শিকার পাওয়া গেছে, তাদের শয়তানী, উন্মাদনা বা কু-প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। তারা একে অন্যকে এ সংবাদ পরিবেশন করে এবং অত্যন্ত উল্লসিত অবস্থায় তারা হাযির হয়।

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ۝

হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে বললেন, দেখ এরা আমার বহিরাগত মেহমান। আমার প্রতি লক্ষ্য করে তোমরা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আমাকে অপমানিত করোনা। মেহমানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং মেহমানের অপমানতো আমারই অপমান।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ۝

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, (অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়োনা) এবং আমাকে অপমানিত করোনা, দেশ ও জাতির বদমান করোনা।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ
الْعٰلَمِيْنَ۝ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ۝ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ
لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ۝ فَجَعَلْنَا
عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ۝ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ۝ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ۝ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۝ وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ۝
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ۝

তরজমা

(৭০) তারা বললো, আমরা কি সারা দুনিয়ার মানুষকে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?

(৭১) লুত বললেন, তোমরা যদি একান্ত কিছু করতে চাও, তবে আমার এ কন্যাগণ রয়েছে।

(৭২) (হে রসূল!) আপনার জীবনের শপথ! তারা তাদের নেশায় মেতে রয়েছে।

(৭৩) এরপর সূর্যোদয়ের সময়ই মহা গুরু গর্জন তাদেরকে পাকড়াও করলো।

(৭৪) আমি উক্ত জনপদকে উল্টিয়ে উপর নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করলাম।

(৭৫) নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন পর্যবেক্ষণ-শক্তি-সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

(৭৬) উক্ত জনপদ লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।

(৭৭) নিশ্চয় এতে মোমেনদের জন্যে রয়েছে যথেষ্ট নিদর্শন।

(৭৮) আর আইকাবাসীরা তো ছিল পাপীষ্ঠ।

(৭৯) সুতরাং আমি তাদের শাস্তি বিধান করেছি, এরা উভয়েই প্রকাশ্য পথে অবস্থিত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত লূত (আঃ) তাঁর পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তথা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আর আমাকে অপমানিত করোনা। কিন্তু দুবৃত্তরা হযরত লুত (আঃ)-এর নীতি কথায় আদৌ কর্ণপাত করেনি, বরং আরও বেশী ঔদ্ধ্যত্ব প্রকাশ করেছে।

قَالُوٓا اَوَلَمۡ نَنۡهَكَ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ۝

তারা বলে, আমরাতো ইতিপূর্বে আপনাকে নিষেধ করেছি যে, সারা দুনিয়ার মানুষের দরদী হতে যাবেন না, কোন আগন্তুককে আশ্রয় দেবেন না। কোন আগন্তুকের সাথে আমাদের ব্যবহারের ব্যাপারে নাক গলাবেন না এবং আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে নিজের কাছে আশ্রয় দেবেন না। আমরা তাদের সঙ্গে যা ইচ্ছা ব্যবহার করবো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, লুত (আঃ)-এর এ পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় শুধু যে চরিত্রহীন এবং নৈতিকতা বর্জিত ছিল তাই নয়; বরং তারা ডাকাতও ছিল। পথিক মুসাফিরকে লুণ্ঠন করে বেড়াত। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে এসব অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি কর্ণপাতও করতেন না।

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ۝

হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে নসিহত করে বললেন, তোমাদের এ দুর্গতি কেন? যে কাজ সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে বৈধ পন্থায় হতে পারে তা তোমরা অন্যায় ভাবে কেন করতে চাও? কামাচারের জন্যে আমার কন্যা তুল্য (সমাজের) মেয়েরা রয়েছে, তোমরা তাদেরকে যথা নিয়মে বিয়ে-শাদী কর। এতে তো কোন বাধা নেই। তোমরা কেন অন্যায় অশ্লীল কুকর্মে আকৃষ্ট হচ্ছো।

কিন্তু লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় আদৌ তাঁর নসিহতের প্রতি কর্ণপাতও করেনি, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۝

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, (হে রসূল!) আপনার প্রাণের শপথ করে বলেছি, তারা পাশবিকতার নেশায় মত্ত রয়েছে এমনভাবে যে, কোন কল্যাণ বাণীই শ্রবণের মত অবস্থায় তারা নেই। আল্লামা বগভী (রঃ) আবদুল জাওযার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবেন আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল, এজন্যে আল্লাহ পাক তাঁর প্রাণ ব্যতীত আর কারো শপথ গ্রহণ করেননি, কেননা প্রিয়তম বস্তুরই শপথ করা হয়।

এ আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা এই, একথাটি ফেরেশতাদের। তাঁরা হযরত লুত (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ হে লুত! আপনার জীবনের শপথ করে বলছি যে, তারা পাশবিকতার উন্মত্ত নেশায় এমনভাবে মত্ত রয়েছে যে, তারা আপনার উপদেশ শ্রবণ করবে না। অথবা কথাটি আল্লাহ পাকেরই, আর আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) আপনার জীবনের শপথ! লুত সম্প্রদায় মূলতঃ পাশবিকতার নেশায় উন্মত্ত ছিল। তাই তারা লুতের (আঃ) নছিহত শ্রবণ করছিলনা।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ۝

ফলে সূর্যোদয়ের সময়ই এক কঠিন গুরু-গর্জন তাদেরকে পাকড়াও করে। এ গর্জন ছিল হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর। এ গর্জন শুরু হয়েছিল সোবহে সাদেকের সময় থেকে যা সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরিণামে লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

"উক্ত বসতিকে আমি উপর নীচ করে দেই"। অর্থাৎ হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের হুকুমে জনপদকে উল্টে দেন।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ۞

"আর আমি তাদের উপর কংকর বর্ষণ করি"।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্যে তিন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন (১) গুরু-গর্জন (২) তাদের জনপদকে উল্টে দেয়া (৩) আসমান থেকে তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ۞

"নিশ্চয় এ ঘটনায় রয়েছে বহু নির্দশন সে সব লোকদের জন্যে যারা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা রাখে"।

مُتَوَسِّمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ "যারা পর্যবেক্ষণ করে"।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ "যারা পরিচয় পায়"।

কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ "যারা নছিহত হাসিল করে"।

আর মুকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ "যারা চিন্তা করে তাদের জন্যে রয়েছে এতে নছিহত"। অর্থাৎ এসব প্রকাশ্য ঘটনা দেখে পাপাচারের পরিণতি লক্ষ্য করে যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে এবং পরিণতিকে ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে এতে বহু নিদর্শন, যারা ঘটনাবলী দেখে আত্ম-সংশোধনে প্রয়াসী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে এতে উপদেশ।[২]

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের বুদ্ধিমত্তা এবং পরিণামদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য রেখো, সে আল্লাহর নূর দেখে। এপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, মোমেন আল্লাহ পাকের নূর এবং আল্লাহ পাকের তওফিককে দেখে।

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ আল্লাহ পাকের বান্দাগণ মানুষকে তাদের নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারে।[৩]

আয়াতের মর্মকথা

মূলকথা হল যারা চিন্তাশীল, যারা পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা সম্পন্ন এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির অধিকারী, তাদের জন্যে হযরত লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ জাতির ইতিহাসে

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৩০-৩৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫৭
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১৪

অনেক কিছুই শিক্ষনীয় রয়েছে। তাদের চরিত্র কত ঘৃণ্য ছিল এবং শাস্তি কত ভয়ংকর এবং পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে! তাই পাপাচারের মাধ্যমে আল্লাহর আযাবকে আহবান করা উচিত নয়।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ۝

আর ঐ জনপদটি রাস্তার পার্শ্বেই রয়েছে। মক্কা শরীফে থেকে সিরিয়া যাত্রার পথেই ঐ জনপদ অবস্থিত। আল্লাহর কোপগ্রস্ত জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে ঐ জনপদে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۝

নিশ্চয় এ বিবরণে মোমেনদের জন্যে রয়েছে নির্দশন। অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্যে রয়েছে অবশ্যই নছিহত।

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ۝

আর নিঃসন্দেহে আইকাবাসী ছিল জালেম। আইকাবাসী বলতে আলোচ্য আয়াতে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আল আইকা, শব্দটির অর্থ হল জঙ্গল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের গ্রাম ঘন বন-জঙ্গলে ঘেরাও ছিল। এজন্যে তাদেরকে আইকাবাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এটি ছিল এমন স্থান যেখানে বৃক্ষ ছিল প্রচুর, কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ মদীয়ান এবং আইকাবসী দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রেরিত হয়েছিলেন। শেরক, মূর্তি পূজা, পৌত্তলিকতা, ওজনে ফাঁকি দেয়া এসবই ছিল তাদের জঘন্য অপরাধ।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

"আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করি"। তথা তাদের শাস্তি বিধান করি। আল্লাহ পাক সাতদিন পর্যন্ত তাদেরকে অত্যন্ত তপ্ত অবস্থায় রাখেন। এরপর একটি মেঘখণ্ড তাদের মাথার উপর দেখা যায়। লোকেরা দ্রুত তপ্ত অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার্থে ঐ মেঘখণ্ডের ছায়ায় জড়ো হয়। এরপর আল্লাহ পাক ঐ মেঘখণ্ড থেকে তাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করেন। এভাবে পাপীষ্ঠারা জ্বলে ছাই হয়ে যায়। একে পবিত্র কোরআন يوم الظلة বলে নামকরণ করেছে।

وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ۝

"তারা উভয়েই তো প্রকাশ্য পথে অবস্থিত"।

অর্থাৎ হযরত লূত (আঃ)-এর জনপদ সদুম এবং হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জনপদ আইকা উভয়ই মক্কা এবং সিরিয়ার মধ্যপথে, রাস্তার পার্শ্বেই রয়েছে। অথবা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বস্তি আইকা এবং মাদীয়ান উভয়কে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আর এটি প্রকাশ্য পথের ধারেই রয়েছে। মক্কার কাফেররা যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করছিল এবং পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করছিল, তাদের সিরিয়া গমনের পথে অবস্থিত ধ্বংস প্রাপ্ত এ জনপদগুলো দেখে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকা উচিত।[১]

এসব ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য

আলোচ্য ঘটনাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্যে হল রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করা। হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করেছে, ওজনে কম দিয়েছে, পৌত্তলিকতায় মত্ত রয়েছে, এরপর আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে অর্থাৎ যারা আল্লাহর নবীকে অমান্য করবে, তাঁর আর্দশকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের শাস্তি অবধারিত।[২]

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ
الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ
كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ
اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾

তরজমা

(৮০) হিজরবাসীও রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫৮
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৭

(৮১) আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম তবুও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

(৮২) তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতো নিশ্চিন্ত মনে।

(৮৩) এরপর অতি প্রত্যুষে গুরু গর্জন তাদেরকে পাকড়ও করে।

(৮৪) সুতরাং কোন উপার্জনই তাদের কাজে আসেনি।

(৮৫) আর আসমান ও জমীন এবং তার মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অকারণে সৃষ্টি করিনি এবং কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব, (হে রসূল!) আপনি সৌজন্যের সাথে (তথা উত্তমভাবে) তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলুন।

(৮৬) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

(৮৭) আর নিশ্চয় আমি আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা পুনঃপুন আবৃত্ত হয়, আর মহান কোরআনও দান করেছি।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াত সমূহে এ পর্যায়ে চতুর্থ ঘটনার বিবরণ রয়েছে। সামুদ জাতিকে হিজরবাসী বলা হয়েছে। তাদের নিকট হযরত সালেহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। 'হিজর' মদীনা শরীফ এবং সিরিয়ার মধ্যে অবস্থিত একটি ময়দান। মদীনা শরীফ থেকে উত্তর দিকে এর অবস্থান। এখানেই সামুদ জাতি বসবাস করতো। তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল।

যদিও একজন নবীকেই অস্বীকার করেছে আর একজন নবীকে অস্বীকার করাই হল সকল নবীগণকে অস্বীকার করা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ۝

(হিজরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।)

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ۝

আমি তাদেরকে নিদর্শন সমূহ দান করেছি, কিন্তু তারা সে নিদর্শন থেকে বিমুখ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتِنَا (আমাদের নিদর্শনের) অর্থ হল হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট প্রেরিত সহীফা, অথবা আল্লাহর নবীর মোজেযা। যেমন পাহাড় থেকে একটি উষ্ট্রি বের হয়ে আসা এবং তার অনেক দুধ হওয়া এবং কূপের সমস্ত পানি পান করে ফেলা। এসব নিদর্শন সমূহ দেখে তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতো কিন্তু তারা তা করেনি, বরং তারা আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করেছে।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ۝

তারা পাহাড় কেটে কেটে গৃহ নির্মান করতো যেন নিরাপদে থাকে অর্থাৎ তাদের বাড়ী-ঘর হত অত্যন্ত মজবুত এবং সুদৃঢ়। ভেঙ্গে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকত না, চোর ডাকাত প্রবেশ করারও কোন সম্ভাবনা থাকত না। অথবা এর অর্থ হল এই, তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকার কারণে আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্পর্কেও ছিল নিশ্চিন্ত এবং নির্ভীক। তাদের ধারণা ছিল তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কেউ তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ۝

এরপর অতি প্রত্যুষেই গুরু গর্জন তাদেরকে পাকড়াও করল। যারা অহরহ ভোগ বিলাসে মত্ত থাকত, পাথরের পাহাড় কেটে এমন ভাবে মজবুত গৃহ সমূহ নির্মাণ করত যেন তারা চিরদিন তাতে থাকবে, কোনদিন মৃত্যু তাদের কাছে আসবে না। এ ছায়া মায়া ঘেরা পৃথিবী থেকে কোনদিন তারা বিদায় গ্রহণ করবে না। ধন-দৌলত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য তাদেরকে গর্বিত করে রেখেছিল। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসেছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল, কঠোর গুরু গর্জন তাদের জীবনের অবসান ঘটিয়ে দিল তখন তাদের জনবল, ধনবল, বাহুবল কোন কিছুই তাদের উপকারে আসেনি। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

তাদের কোন উপার্জনই কোন প্রকার উপকারে আসেনি। অর্থাৎ তাদের সুদৃঢ় বাড়ী-ঘর, অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য এবং তাদের জনবল ও তাদের প্রযুক্তি জ্ঞান কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। হাদীস শরীফে আছে, নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাবুকের যুদ্ধের সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরবাসী সামুদ জাতির এলাকা অতিক্রম করেন। তিনি তাঁর মাথা মোবারক ঢেকে রাখেন এবং তাঁর বাহনের গতিও দ্রুত করে দেন। সাহাবায়ে কেরামকে তিনি নির্দেশ দেন, তোমরা এ এলাকা অতিক্রম করার সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় থাক। আল্লাহ্ পাক না করুন, যে আযাব তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমাদের উপর যেন না আসে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হল মানুষ যেন এমন স্থানে প্রমোদ ভ্রমণে না যায়, আনন্দ উল্লাস না করে, বরং আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়ে যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়, সতর্কতা অবলম্বন করে, সাবধান হয়।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫৯
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৪৬

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ

"আর আসমান জমীন এবং তার মধ্যবর্তী কোন কিছুই আমি অকারণে সৃষ্টি করিনি"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ অতীতের জাতি সমূহের অবস্থা এবং পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সবর অবলম্বনের এবং ক্ষমা-সুন্দর আদর্শ পেশ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যারা অবিশ্বাস করে, তাঁর প্রতি বিদ্রুপ করে তাদের ব্যাপারে সবর অবলম্বনের তা'লীম দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, তারা যা কিছু বলুক বা করুক, আপনি ধৈর্য সহকারে দ্বীনের তাবলীগ অব্যাহত রাখুন, তাদের ব্যাপারে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত থাকুন, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাদের ব্যাপারে যথাসময়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ط

"আর আমি আসমান জমীন এবং তার মধ্যবর্তী কোন কিছুই অকারণে সৃষ্টি করিনি"।

এসব কিছুই স্রষ্টা ও পালনকর্তার সৃষ্টি নৈপূণ্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদসত্ত্বেও যদি কাফেররা আল্লাহ অস্তিত্বতে অস্বীকার করে, হে নবী! আপনার নবুওয়্যতকে অমান্য করে তবে আপনি তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না, আপনি তাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের সাথে বিতর্ক করার কোন প্রয়োজন রয়নি। ভদ্রভাবে তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলাই এখন উচিত। ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর নবীগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, তাদেরকে দুনিয়াতেই শাস্তি দেয়া হয়েছে, যদি কোন অবাধ্য জাতিকে দুনিয়াতে শাস্তি না-ও দেয়া হয়, তবু তাদের শাস্তি অবধারিত। কেননা

وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ۞

"নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে"। এবং কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং সুন্দরভাবে পাশ কাটিয়ে চলুন।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ۞

নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী, কোন কিছুই তাঁর অজানা নেই। তিনি যে সকলকে সৃষ্টি করেছেন, সকলের সবকিছু সম্পর্ক তিনি সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন, মানুষের জীবনের শুরু এবং শেষ সবই আল্লাহ্ পাকের হাতে, এ জীবন এবং পুনঃজীবন এবং কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান এসব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয়ে থাকে। কে নেক, কে বদ তা তাঁর অজানা নয়। অতএব, প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ীই তিনি পুরস্কার অথবা শাস্তি দেবেন। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাক আপনাকেও জানেন এবং আপনার দুশমনদেরও অতএব, সব বিষয় আপনি আল্লাহ্ পাকের উপর সোপর্দ করুন। অথবা এর অর্থ হল, আল্লাহ্ পাক আপনাকেও সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার দুশমনদেরকেও। আল্লাহ পাক খুব ভাল ভাবেই জানেন, আপনার জন্যে কখন কোন পন্থা উপকারী হবে। এ মুহূর্তে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে সমীচিন।[১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ۝

"আর (হে রসূল!) আমি আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বারে বারে (নামাজে) পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহান কোরআন"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন سبع مثانی দ্বারা সূরা ফাতেহাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এর আয়াত সাতটি।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), আতা (রঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এ মতই পোষণ করেন। বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ام القران। (সূরা ফাতেহা) সাত আয়াত।

المثانی। অর্থাৎ যা নামাজে বারে বারে পাঠ করা হয়।

'মাসানী' নামকরণের তাৎপর্য

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যেহেতু সূরা ফাতেহা নামাজে প্রত্যেক রাকাআতে পাঠ করা হয় এজন্যে এ সূরাকে 'মাসানী' (مثانی) বলা হয়েছে।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতেহার দুটি অংশ রয়েছে। এক অংশ আল্লাহ পাকের জন্যে যাতে আল্লাহ পাকের প্রশংসা রয়েছে। আর অন্য অংশ হলো দোয়া যা বান্দার জন্যে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ সূরা ফাতেহাকে আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫৯

হোসাইন এবনে ফজল مثانى (মাসানী) নামকরণের এ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সূরা ফাতেহা দু'বার নাযিল হয়েছে। একবার মক্কা শরীফে আর একবার মদীনা শরীফে এবং প্রত্যেক বার সূরা ফাতেহার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছিলেন।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন مثانى শব্দটির অর্থ হল নির্বাচিত, বাছাই করা। কেননা, সূরা ফাতেহাকে আল্লাহ্ পাক এ উম্মতের জন্যে বাছাই করেছেন। অন্য কোন উম্মতকে তা দান করেননি। আবু যায়েদ বলখী (রঃ) বলেছেনঃ

ثنيت العنان

এর অর্থ হল- আমি লেগামকে ফিরিয়ে দিয়েছি, যেহেতু সূরা ফাতেহা মন্দ লোকদেরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে দেয় এজন্যে তাকে مثانى বলা হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন مثانى শব্দটি ثنى থেকে নিষ্পন্ন কেননা, এ সূরায় আল্লাহর প্রশংসা স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের মহান গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে سبعا শব্দ দ্বারা সাতটি বড় বড় সূরা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্ব প্রথম সূরা বাকারাহ্, সূরা আনফাল এবং সূরা তওবা। এ দু'টি সূরা একই হুকুমে এজন্যে দুটি সূরার মধ্যখানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ হয় না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সাতটি বড় বড় সূরার শেষ সূরা তওবা। আর কারো মতে সাতটি বড় সূরার মধ্যে সর্বশেষ সূরা হল সূরা ইউনুস। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রঃ) "মাসানী (مثانى) নামকরণের এ কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এই সাতটি সূরার মধ্যে ফরজ সমূহ, অপরাধের শাস্তি, ভাল মন্দের দৃষ্টান্ত সমূহ এবং শিক্ষনীয় ঘটনাবলী বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এ সম্পর্কে একথাও বর্ণিত আছে যে مثانى শব্দটি ثنى শব্দ হতে নিষ্পন্ন। পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার শুধু যে সর্বত্র প্রশংসনীয় হয়েছে তাই, বরং এটি অত্যন্ত বড় মোযেজা। কেননা এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে কেউ সক্ষম হয়নি। আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাকের গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে। এজন্যে এটি প্রশংসাকারীও, এ প্রেক্ষিতেই পবিত্র কোরআনকে مثانى বলা হয়েছে।

মোহাম্মদ এবনে নাসির হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তৌরাতের স্থলে আমাকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করেছেন। আর ইঞ্জিলের স্থলে সে সূরা সমূহ দান করেছেন যেগুলোর শুরুতে الر এবং طس রয়েছে। আর যবুরের স্থলে طس থেকে حم বিশিষ্ট সূরা সমূহ দান করেছেন। আর حم বিশিষ্ট সূরা সমূহ বাড়তি দান রয়েছে আমার প্রতি। বড় বড় সূরা ইতিপূর্বে আর কোন নবীকে দান করা হয়নি, শুধু আমাকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ)-কে ছয়টি দেয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফলক হাত থেকে ফেলে দেন, তখন দু'টি সূরা উঠিয়ে নেয়া হয় আর চারটি তাঁর নিকট রাখা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত সওবান (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তওরাতের স্থলে আমাকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করেছেন, আর ইঞ্জিলের স্থলে مئين আর যবুরের স্থলে مثانى এবং আমার প্রতিপালক আমাকে আরও অনেক কিছু দিয়েছেন।

তাউসের মতে, "মাসানী" শব্দ দ্বারা সমগ্র কোরআনকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যেমন, কোরআনে করীমেও এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে–

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনকে مثانى বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনকে مثانى বলার কারণ হল, এতে বিভিন্ন ঘটনা বারে বারে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাসীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সাহাবী হযরত আবু সায়ীদ এবনে মুআল্লা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি নামাজে রত ছিলাম, এমন সময় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, নামাজে রত থাকার কারণে আমি সাড়া দিতে পারলাম না, নামাজ শেষ করে আমি তাঁর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কেন আসলেনা? আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূল্লাল্লাহ! আমি নামাজে ছিলাম। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি কি আল্লাহ পাকের এ বাণী শ্রবণ করনি,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখনই তিনি তোমাদেরকে ডাকেন"।

শোনো! আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে পবিত্র কোরআনের বড় সূরার কথা বলবো, কিছুক্ষণ পর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন, তাহলো সূরা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন। আর এটিই "সাবয়ুল মাসানী"। অন্য হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সূরা ফাতেহাই হলো সাবয়ে মাসানী।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১৬

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَآ
أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

তরজমা

(৮৮) আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি (হে রসূল!) আপনি কখনও দৃষ্টিপাত করবেন না, আর তাদের জন্যে দুঃখও করবেন না। আর মোমেনদের জন্যে নিজের পাখা অবনমিত করে রাখুন।

(৮৯) আর (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো শুধু এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।

(৯০) যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম, বিভক্তকারীদের উপর।

(৯১) যারা কোরআনকে বিভিন্নভাবে খন্ড-বিখণ্ড করেছে।

(৯২) অতএব, শপথ আপনার প্রতিপালকের! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে প্রশ্ন করবো।

(৯৩) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।

তফসীরুল কোরআন

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত পবিত্র কোরআন প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কাফেরদেরকে আল্লাহ্ পাক যে ধন-দৌলত দিয়েছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

(হে রসূল!) কাফেরদেরকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ আমি দিয়েছি তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। একথা মনে করার কোন অবকাশ নেই যে, এসব দানের যোগ্য অধিকারী হল মুসলমানগণ। তাই মুসলমানদেরকে সম্পদ দান করলেই ভাল হত, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে দুনিয়ার ধন-সম্পদের কোন গুরুত্ব নেই।

একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ্ পাকের নিকট সমগ্র বিশ্বের সকল সম্পদের মূল্য একটি মশার ডানার সমানও নয়। যেমন কোরআনে করীমেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

"(হে রসূল) আপনি বলে দিন, পার্থিব জীবনের সম্পদ অতি তুচ্ছ, আর পরহেযগারদের জন্যে আখেরাতই উত্তম"।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়া নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী আর দুনিয়ার সকল সম্পদও ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে যখন দুনিয়ার এ জীবনের অবসান ঘটবে তখন দুনিয়ার সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

তৃতীয়তঃ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী কাফেরদের জন্যে ভবিষ্যত জীবনে মহা বিপদেরই কারণ হবে। এসব সুখ-সামগ্রীতে মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়ে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত থেকে আল্লাহকে ভুলে যায়, ভুলে যায় তাঁর বিধানকে, ফলে আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান হয়ে জীবন যাপন করে। এভাবে আখেরাতের শাস্তি তার অবধারিত হয়। দুনিয়ার সম্পদ ও ঐশ্বর্যই তার শাস্তির কারণ হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

আর কাফেরদেরকে ভোগ বিলাসের যে সম্পদ দান করেছি তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, কেননা (হে রসূল!) আপনাকে দান করেছি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম, যা অদ্বিতীয় অতুলনীয়, এ নেয়ামত লাভের পর অন্য কোন কিছুর গুরুত্ব রয়নি। তাই পৃথিবীর কোন নেয়ামতের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিপাতের কোন অবকাশই রয়নি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। এ মর্মে যে, (হে রসূল!) আপনাকে যে মহান পবিত্র কোরআন দান করেছি, এরপর আপনি

দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। কাফেরদেরকে যে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত দেয়া হয়েছে তা পবিত্র কোরআনের মোকাবেলায় অতি হীন এবং তুচ্ছ। হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তিকে পবিত্র কোরআনের মহান নেয়ামত দান করা হয় আর অন্য ব্যক্তিকে দুনিয়ার সম্পদ দান করা হয়, যে পবিত্র কোরআন পেয়েছে সে যদি মনে করে দুনিয়াদারকে উত্তম নেয়ামত দেয়া হয়েছে তাহলে সে বড়কে ছোট মনে করেছে, ছোটকে বড় মনে করেছে।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নেয়ামতের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে দেখবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) এই হাদীসকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, কোন পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নেয়ামত দেখে এমন নেয়ামত লাভের জন্যে আক্ষেপ করোনা। কেননা, তুমি জান না যে মৃত্যুর পর তার কি অবস্থা হবে। মুসলিম শরীফ, তিরমিজী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি তোমার চেয়ে যার সম্পদ কম তার দিকে দেখ, যার নেয়ামত তোমার চেয়ে বেশী তার দিকে দেখবে না। আল্লাহর যে নেয়ামত তোমার নিকট রয়েছে তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার এটিই উত্তম পন্থা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আয়াতের অর্থ হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনাকে মহান কোরআন দান করা হয়েছে। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। অতএব, আপনি দুনিয়ার সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না যা কাফেরদেরকে দেয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে যে একবার বনী কোরায়জা এবং বনী নজির ইহুদী গোত্রের নিকট সাতটি কাফেলা আসে। তাদের নিকট ছিল অনেক মূল্যবান সম্পদ। হিরা, জহরত, পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং সুগন্ধি বস্তু। এসব দেখে মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন, যদি এগুলো আমাদের হত তবে আমরা শক্তিশালী হতাম এবং আল্লাহর রাহে দান করতে পারতাম। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। এ মর্মে যে হে মোমেনগণ! তোমাদেরকে সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফাতেহা দান করেছি যা উৎকৃষ্টতর সেই সম্পদ থেকে যা এই সাতটি কাফেলার নিকট রয়েছে। এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) এবং আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কারো অর্থ-সম্পদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখা নিষিদ্ধ।[২]

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬২
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২১০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১৭

আর (হে রসূল!) কাফেরদের জন্যে দুঃখ করবেন না। একথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. যেহেতু কাফেররা ঈমান আনেনি, এত দলিল প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও মুসলমান হয়নি। (হে রসূল!) এজন্যে আপনি তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না। তাদের হেদায়েতের জন্য আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তাদের ব্যাপারে আপনি রেসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন সঠিক ভাবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। তাই তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না।।

২. অথবা এর অর্থ হল, কাফেরদের ন্যায় মুসলমানদেরকে অর্থ-সম্পদ দেয়া হয়নি, এজন্যে আপনি দুঃখ করবেন না।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۝

মোমেনগণই আপনার একান্ত আপনজন, তাদের সঙ্গে আপনি বিনম্র এবং সমবেদনাপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকুন। কেননা, আপনার দয়া মায়ার যোগ্য মোমেনগণই, কাফেররা আপনার শত্রু, তারা দয়া মায়ার যোগ্য নয়। তাই মোমেনদের প্রতি দয়া করুন, তাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহার করুন। কেননা, তারাই পবিত্র কোরআনের ন্যায় অমূল্য সম্পদ কবুল করেছে।

وَقُلْ اِنِّىْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ۝

আর যারা পবিত্র কোরআনের নেয়ামত গ্রহণ করেনি, তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেনি তাদেরকে (হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন, আমি তোমাদের জন্যে ভয় প্রদর্শক, আমি তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করছি, ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছি। আমি জানিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান না আন তবে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হবে।

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ۝

এমনি আযাব যেমন আযাব আমি সেই লোকদের উপর নাযিল করেছি যারা আসমানী গ্রন্থকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। আসমানী গ্রন্থের কোন অংশকে তারা মানতো আর কোন অংশকে মানতো না। এ কাফেরদের প্রতিও এমনিভাবে আযাব আপতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতের مقتسمين শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদী খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, তারা পবিত্র কোরআনকে ভাগ করে রেখেছিল। পবিত্র কোরআনের যে অংশ

তাদের মনপূতঃ হত তা গ্রহণ করতো। আর যে অংশ তাদের মতের অনুকূল না হত তাকে মানতো না। এভাবে তারা কোরআনে করীমকে বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করেছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قران শব্দটি আভিধাণিক অর্থে গ্রহন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কিতাবকে ইহুদী ও নাসারারা পাঠ করতো তা হল তৌরাত ও ইঞ্জিল। যেহেতু ইহুদী ও খৃষ্টানরা আল্লাহর কিতাব তৌরাত ইঞ্জিলে রদবদল করেছিল তাই তাদেরকে مقتسمين বলা হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহর কিতাবকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছিল। আর কোন কোন তফসীরকারের মতে, مقتسمين শব্দ দ্বারা মক্কার মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, তারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিদ্রুপ করতো, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরার নামে উপহাস করতো এবং নিজেদের মাঝে তা ভাগ করে নিত। তারা বলতো, "বাকারা", মায়েদা" আমি নেব, "আনকাবুত" তুমি নেবে। শুধু তাই নয়, বরং মক্কার কোরায়েশরা পবিত্র কোরআনকে কেউ যাদু বলতো, কেউ কাব্য বলতো। আর কেউ প্রাচীন কালের কাহিনী বলে আখ্যা দিত, এমনকি পাগলের প্রলাপ বলার মত ধৃষ্টতাও দেখাত। এভাবে কোরআনে করীমকে তারা বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করতো।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে- اَلْمُقْتَسِمِيْنَ। শব্দ দ্বারা ইহুদী ও নাসারাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তেবরানী আল-আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আলোচ্য আয়াতে المقتسمين। অর্থ কি? তিনি এরশাদ করেছেন, ইহুদী ও নাসারা। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলঃ আলোচ্য আয়াতে عضين শব্দটির অর্থ কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ (পবিত্র কোরআনের) কোন অংশে ঈমান এনেছে, কোন অংশকে অস্বীকার করেছে।

আরবী ভাষায় বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ কামুসে عضين শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে- عضين শব্দটি বহুবচন হলো عضة এর যার অর্থ হল একটি টুকরো। আর عضة মূলত ছিল عضوة এবং আরবী ভাষায় বলা হয় الشاة। عضى (অর্থাৎ বকরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে খন্ড-বিখন্ড করেছে)। ঠিক এমনিভাবে ইহুদী নাসারারা পবিত্র কোরআনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে, এক অংশকে তারা হক্ব বলেছে, আর এক অংশকে

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৪৫

বাতিল বলেছে। তারা বলত, এ অংশ তৌরাত ইঞ্জিল মোতাবেক তাই তা হক্ব। আর এ অংশ তৌরাত ইঞ্জিল মোতাবেক নয়, তাই বাতিল। আর কোন কোন ইহুদী নাসারা পবিত্র কোরআনকে বিদ্রুপ করে বলত, সূরা বাকারা আমার, সূরা আলে এমরান তোমার।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে المقتسمين শব্দ দ্বারা ইহুদী নাসারাকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের المقتسمين অর্থ সে সব কাফের যারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত। কেউ বলত, কোরআন হল যাদু, আর কেউ বলতো, এটি হল কাব্য, আর কেউ বলত, এটি হল অতীত কালের ইতিহাস।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ المقتسمين হল মক্কার সে সব কাফের, যাদেরকে হজ্বের সময় ওলীদ এবনে মগীরাহ মক্কার বিভিন্ন পথে এ উদ্দেশ্যে মোতায়েন করত, তারা যেন হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর খবর দেয়। তারা বলত, আমাদের শহরে একজন লোক রয়েছেন, যার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমরা কিন্তু তার কাছেও যেও না। এদের মধ্যে কেউ বলত তিনি যাদুকর, আর কেউ বলত তিনি পাগল, কেউ বলত তিনি কবি (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

একদিনের ঘটনা। ওলীদ এবনে মগীরাহ কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে বসেছিল। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, যিনি নবুওয়্যতের দাবী করেন তাঁর সম্পর্কে বহু কথা শ্রবণ করছি, তোমার কি মত? সে বলল, তারা যা বলে ঠিকই বলে। যাদেরকে ওলীদ মক্কার বিভিন্ন পথে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে মোতায়েন করত, তাদের সংখ্যা নিয়েও কথা আছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ। আর মোকাতেল এবনে সোলায়মান বলেছেনঃ তারা ছিল ষোল জন।

যদি اَلْمُقْتَسِمِيْنَ শব্দ দ্বারা ইহুদীদেরকে উদ্দেশ্যে করা হয়, যেমন আবু সউদ এবং আল্লমা আলুসী (রঃ) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন, তবে তাদের প্রতি যে আযাব এসেছে তা হল ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জার হত্যা এবং বনু নজীর গোত্রের দেশ থেকে বহিষ্কার করার মাধ্যমে তাদের প্রতি আযাব আপতিত হওয়া। পক্ষান্তরে, যদি المقتسمين শব্দ দ্বারা মক্কার কাফের ওলীদ এবনে মগীরাহ গয়রহকে উদ্দেশ্যে করা হয়; তবে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের যে পরাজয় বরণ করতে হয়, তারা মাধ্যমেই আল্লাহর আযাব তাদের প্রতি নাযিল হয়।

কোন কোন তফসীরকার المقتسمين শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর দ্বারা সে সব লোকদেরকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে শপথ করেছিল। এ মত পোষণ করেছেন এবনে যায়েদ এবং এবনে কোতায়বা। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে المقتسمين। শব্দের অর্থ হবে শপথ গ্রহণকারী।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) তাঁর তফসীরে المقتسمين। শব্দের ব্যাখ্যায় অন্যান্য তফসীরকারদের অভিমত বর্ণনার পর লিখেছেন যে, তাঁর মতে المقتسمين। শব্দ দ্বারা মক্কার সেই দুবৃত্তদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা ওলীদ এবনে মগীরাহর পরামর্শ মোতাবেক মক্কার বিভিন্ন পথে মোতায়েন থাকত এবং হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার কারণে অবশেষে তাদের পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, مقتسمين অর্থ শপথকারী, যারা ইতিপূর্বে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরোধিতা করত এবং তাদের প্রতি নির্যাতনের ব্যাপারে পরস্পর শপথ গ্রহণ করত, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণ করত, কাফেররা যে বিষয়টি অস্বীকার করত, সে বিষয়ের উপর শপথ করতে অভ্যস্ত ছিল। এজন্যে তাদেরকে শপথকারী বলা হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার এবং আমার প্রতি আল্লাহ পাকের যে হেদায়েত নাযিল হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে তার জাতির নিকট এসে বলে, হে লোক সকল! আমি শত্রুদের সৈন্যবাহিনী স্বচক্ষে দেখে এসেছি অতএব, তোমরা সতর্ক হও, আত্মরক্ষার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ কর। যারা সে ব্যক্তির কথা মানে, তারা রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে যারা ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং নিশ্চিন্ত থাকে, হঠাৎ দুশমন এসে তাদেরকে হত্যা করে। এটি হল দৃষ্টান্ত সে সব লোকের যারা আমাকে মানে এবং যারা আমাকে মানে না। এ লোকদের অবস্থা হল এই যে, তারা আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে, তার কোন অংশকে মানে, আর কোন অংশকে মানে না।[৩]

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদের সকলকে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব, তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৪
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৩
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১৮

আমলের জন্য জবাবদেহী করতে হবে

আলোচ্য আয়াত আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র সত্ত্বার শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, আমি কাফেরদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব। তাদেরকে সহজে ছেড়ে দেয়া হবে না, তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কার খেয়েছিলে? কার এবাদত করেছিলে? কলেমায়ে তৈয়্যেবার আহ্বান সম্পর্কে কি করেছিলে? কলেমার হক্ব কেন আদায় করনি? যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকে কেন অস্বীকার করেছ? আমার প্রেরিত নবীগণের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলে?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাল কেয়ামতের দিন মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে কুফর ও নাফরমানী সম্পর্কে, পাপাচার সম্পর্কে, পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করা সম্পর্কে আর শুধু জিজ্ঞাসাবাদই করা হবে না, বরং এর জন্যে শাস্তিও দেয়া হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) ইমাম বোখারী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিরমিজী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হল কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মুসলিম শরীফে হযরত আবু বারদা আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি পুলসেরাত পার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাকে চারটি প্রশ্ন না করা হয়।

১. প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি কাজে তা ব্যয় করেছে ২. তার দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে দৈহিক শক্তি কি কাজে ব্যয় করেছে। ৩. প্রশ্ন করা হবে এলম সম্পর্কে যে তা অর্জনের পর কি আমল করেছে। ৪. অর্থ সম্পদ কোথা থেকে রোজগার করেছে ও কিভাবে ব্যয় করেছে।

তিরমিজী এবং এবনে মরদবিয়াও এই হাদীস সংকলন করেছেন। ইসবেহানী তরগীবে এবং তেবরানী আল আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা জ্ঞান বিতরণে পরস্পর সহমর্মিতা প্রকাশ কর, কারো নিকট কোন কিছুর এলম গোপন রেখো না। এলমের ব্যাপারে খেয়ানত করা অর্থ সম্পদের ব্যাপারে খেয়ানতের চেয়েও কঠিন, আল্লাহ পাক এ ব্যাপারেও তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

তেবরানী আল আওসাতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের ইমামত করে, তার আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা

উচিত, আর তার জানা উচিত যে, সে মোকতাদীদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে, এ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি সে সঠিকভাবে ইমামতি করে তবে তাদের পেছনের লোকদের সমান সওয়াব তাকে প্রদান করা হবে। আর যদি নামাজে কোন প্রকার ত্রুটি থাকে তবে তার গুনাহও ইমামের হবে। হযরত মাআজ এবনে যবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে মাআজ! কেয়ামতের দিন মোমেনকে তার প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এমনকি, তার নয়ন যুগলে সুরমা ব্যবহার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।

এবনে আবি হাতেম আনফা এবনে আবদুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জাহান্নামের সাতটি পুল রয়েছে, আর পুলসেরাত তার উপর রয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিকে প্রথম পুলের উপর রেখে ঘোষণা হবে যে, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সর্ব প্রথম নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যার ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যার নাজাত পাওয়ার সে নাজাত পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় পুলের উপর যখন পৌঁছবে তখন আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কিভাবে তা আদায় করা হয়েছে। এখানেও যার ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হয়ে যাবে, যার রক্ষা পাওয়ার সে রক্ষা পাবে এরপর যখন তৃতীয় পুলের উপর পৌঁছবে তখন আত্মীতার হক্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখেছে না বিনষ্ট করেছে। এখানেও যার ধ্বংস হওয়ার সে ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যার নাজাত পাওয়ার সে নাজাত পেয়ে যাবে। আত্মীয়তার বন্ধন সেদিন বলবে, হে আল্লাহ! যে আমার সম্পর্ককে বজায় রেখেছে, তাকে তুমি তোমার কাছে রাখ। আর যে আমার সম্পর্ককে বিনষ্ট করেছে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর।

এবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বন্দার নিকট প্রশ্ন করবেন এমনকি একথাও বলবেন, যখন তুমি মন্দ কাজ হতে দেখেছিলে, তখন তার প্রতিবাদ কেন করলে না? তখন স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে সঠিক জবাব দেয়ার তওফিক দান করবেন। বান্দা আরজ করবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার দরবার থেকে (রহমতের) আশা করছিলাম আর মানুষের ব্যাপারে আমার ভয় ছিল, এজন্যে আমি নীরব ছিলাম, আর সে কাজটিকে আমি অন্যায় জানতাম।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর যার দায়িত্বে যে কাজ রয়েছে সে

সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, শাসনকর্তা সকলের উপর দায়িত্ববান, তাই সকল মানুষ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের দায়িত্বে থাকে, তাই তার পরিবারবর্গ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রীলোক তার স্বামীর বাড়ী-ঘর এবং সন্তানদের দায়িত্বে রয়েছে, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম (খাদেম বা চাকর-নওকর) তার মুনীবের অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব থাকে, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যাহোক তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবান করা হবে।

তেবরানী আল কবীরে হযরত মেকদাম (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত মেকদাম (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের নেতা বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে, কেয়ামতের দিন সে ঐ সম্প্রদায়ের সম্মুখে পতাকা উত্তোলন করে থাকবে, আর লোকেরা তার পেছনে থাকবে। সে জাতি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর সে জাতির নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। যে ব্যক্তি দশজনেরও নেতা বা শাসনকর্তা হবে, কেয়ামতের দিন তার নিয়ন্ত্রণাধীন লোকদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ মর্মে বহু হাদীস সংকলিত রয়েছে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিন এ প্রশ্ন করা হবে না, তুমি কি এ কাজ করেছ? কেননা, এমন প্রশ্নের কোন প্রয়োজনই নেই। আল্লাহ পাক সব কিছুই জানেন। কারো কোন কাজ আল্লাহ পাকের অজানা নেই, বরং জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি এ কাজটি কেন করলে? এ অর্থেই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ

সেদিন কোন মানুষ বা জ্বীনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। অর্থাৎ গুনাহ করেছে কিনা একথা জিজ্ঞাসা করা হবে না, বরং জিজ্ঞাসা করা হবে কেন গুনাহ করলে?

এ পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রশ্ন দু প্রকার। (১) প্রশ্ন করা হয় জানার জন্য আর এই প্রকার প্রশ্ন কেয়ামতের দিন কাউকে করা হবে না। (২) প্রশ্ন করা হয় তিরষ্কার করার এবং শাস্তি ঘোষণা করার জন্যে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থেই ঘোষণা করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৫-৬৬

لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ আমি অবশ্যই সকলকে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো।[১]

فَاصْدَعْ بِمَا
تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٩٤ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۝٩٥
الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٩٦ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ۝٩٧ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ
السّٰجِدِيْنَ ۝٩٨ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝٩٩

তরজমা

(৯৪) অতএব, আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন, আর মুশরেকদেরকে পরোয়া করবেন না।

(৯৫) বিদ্রুপকারীদের বুঝবার জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট।

(৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মা'বুদ বানায়, তারা অতি সত্বর জানতে পারবে।

(৯৭) আর নিশ্চয় আমি জানি, তারা যা বলে তাতে (হে রসূল!) আপনার মন সংকুচিত হয়।

(৯৮) অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

(৯৯) (হে রসূল!) মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের বন্দেগী করতে থাকুন।

তফসীরুল কোরআন

অতএব, (হে রসূল!) আপনাকে প্রদত্ত নির্দেশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন আর মুশরেকদের পরোয়া করবেন না।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২১৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৭

فَاصْدَعْ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেছেন, "প্রকাশ কর"।

আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর প্রিয় রসূলকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ এবনে ওবায়দার বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গোপনে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

আরেকটি তরজমাও বর্ণিত আছে। আর তা হল দ্বীন ইসলামের দাওয়াতকে অব্যাহত রাখুন।

যাহ্যাক (রঃ) এর তরজমা করেছেন, মানুষের নিকট দ্বীন ইসলামের কথা ঘোষণা করুন।

আখফাস (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে হক্বকে বাতিল থেকে সুস্পষ্ট ভাবে পৃথক করে রাখুন।

সিবাওয়াইহ বলেছেন, এর অর্থ হলো যেভাবে আপনাকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে সে অনুযায়ী ফয়সালা করুন।

وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ۞

"আর (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদের পরোয়া করবেন না"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত জেহাদের আয়াত দ্বারা মনসুখ হয়ে গেছে।[১]

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ۞

"(হে রসূল!) যারা আপনাকে বিদ্রূপ করে, তাদের সঙ্গে বুঝবার জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট"।

অর্থাৎ তাদেরকে তাদের অন্যায় আচরণের জন্যে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৭

এ আয়াতে তফসীরে আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন কিছুকে ভয় করবেন না, আল্লাহ্ পাক আপনার জন্যে যথেষ্ট।

বিদ্রুপকারীদের ভয়াবহ পরিণতি

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কিছু দুবৃত্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বদা বিদ্রুপ করত, তাঁকে এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারেই তারা লিপ্ত থাকত। যারা এ দুবৃত্তদের নেতৃত্ব দিত, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম তফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন।

১। ওলীদ এবনে মগীরাহ মখযুমী, সে ছিল দুবৃত্তদের সবচেয়ে বড় সর্দার।

২। আস এবনে ওয়ায়েল সাহমী।

৩। আসওয়াদ এবনে মোত্তালেব এবনে হারেস এবনে আসাদ এবনে আবদুল ওজ্জাহ। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম তাকে বদদোয়া করেছিলেন এবং বলেছিলেন, (হে আল্লাহ! তাকে অন্ধ কর এবং নিঃসন্তান কর।)

৪। আসওয়াদ এবনে আবদে ইয়াগুস এবনে ওয়াহাব এবনে মোনাফ এবনে জোহরা।

৫। হারেস এবনে কায়েস এবনুত তালালা গং।

একদিনের ঘটনা। এ দুবৃত্তরা কা'বা শরীফে তওয়াফ করছিল। ওলীদ এবনে মাগীরাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্ব অতিক্রম করে যাচ্ছিল। এমন সময় হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আসলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গেলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটি কেমন? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, মন্দ বন্দা। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে, আল্লাহর তরফ থেকে এরপর জিব্রাঈল (আঃ) ওলীদের পায়ের গিরার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

একদিন ওলীদ খাজায়ী গোত্রের এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। খাজায়ী ব্যক্তি তার তীর ঠিক করছিল। ওলীদ তখন ইয়ামনী চাদর গায়ে দিয়ে পরিধেয় বস্ত্রটিকে টাখনুর নীচে এমনকি, মাটির সাথে মিশিয়ে অত্যন্ত গর্বভরে এগিয়ে চলছিল। ঘটনাক্রমে খাজায়ী ব্যক্তির তীরের মাথার সঙ্গে তার লুংগী ফেঁসে যায়। সে যেহেতু অত্যন্ত অহংকারী ব্যক্তি ছিল, সেজন্যে একটু ঝুঁকে লুংগিটি সরিয়ে নেয়া পছন্দ করেনি, বরং সজোরে পা তুলে নেয়, ফলে তীরের মাথা একটু তার পায়ের গিরায় লাগে এবং তাতে হালকা আঁচড় লাগে আর তাতেই তার মৃত্যু হয়।

আস এবনে ওয়ায়েলও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্ব অতিক্রম করছিল। জীব্রাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কেমন? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছিলেন, মন্দ বন্দা। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আসের পায়ের তালুর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আপনার কাজ হয়ে গেছে (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে আপনার আর কিছু করতে হবে না)।

একদিন আস আনন্দঘন মুহূর্তে তার উষ্ট্রীর উপর আরোহন করল এবং তার দু'পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে বের হল। একটি স্থানে গিয়ে সে উষ্ট্রী থেকে অবতরণ করল। সেখানে এক টুকরা কাপড় পড়েছিল। সে তার উপর পা রাখল। কাপড়ের টুকরাতে কোন কাঁটা ছিল যা তার পায়ে বিদ্ধ হল। সে চিৎকার করল, আমাকে কোন কিছু দংশন করেছে কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরও তার তালুতে কিছুই দেখা গেলো না, অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ঐ পা ফুলে উষ্ট্রের ঘাড়ের ন্যায় হয়ে গেল। আর তখনই সেখানে তার মৃত্যু হল।

আসওয়াদ এবনে মোত্তালেবও জীব্রাইল (আঃ)-এর উপস্থিতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্ব অতিক্রম করেছিল। জিব্রাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কেমন? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, মন্দ বন্দা। জীব্রাঈল (আঃ) যথারীতি বললেন, আপনার কাজ করে দেয়া হয়েছে। তখন জীব্রাঈল (আঃ) তার চক্ষুর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসওয়াদ অন্ধ হয়ে গেল। হযরত আবদুল এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জীব্রাঈল (আঃ) একটি সবুজ পাতা আসওয়াদের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন, যার কারণে তার দর্শন শক্তি লোপ পায় আর তার চক্ষুতে এত ব্যথা হয় যে, সে দেয়ালের সঙ্গে মাথা সজোরে ঠুকছিল এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কালবীর (রঃ) বর্ণনা রয়েছে, আসওয়াদ তার গোলাম সহ একটি বৃক্ষতলে বসেছিল। জীব্রাঈল (আঃ) সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তার মাথা ধরে বৃক্ষের সঙ্গে ঠুঁকে ঠুকে দিচ্ছিলেন আর তার মুখের উপর কাঁটা বসিয়ে দিচ্ছিলেন। সে চিৎকার দিচ্ছিল এবং বলছিল, আমাকে সাহায্য কর। গোলাম বলল, আমি তো কাউকে দেখছি না, আপনি নিজেইতো এ কাজ করছেন। তখন সে বলল, আমাকে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিপালক হত্যা করেছে। এ কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল।

আসওয়াদ এবনে আবদে ইয়াগুসও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পার্শ্ব অতিক্রম করছিল। জীব্রাঈল (আঃ) তার সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্ন করলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সে মন্দ বন্দা, যদিও সে আমার মামার পুত্র। জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, এখন আর তার মোকাবেলা করার আপনার প্রয়োজন নেই। একথা বলেই জীব্রাঈল (আঃ) তার পেটের দিকে

ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার এস্তেস্কার রোগ দেখা দিল। এ রোগের কারণে মানুষের পিপাসা হয় অনেক বেশী, কিন্তু পিপাসা নিবারণের চেষ্টায় রুগ্ন ব্যক্তি যদি পানি পান করে তবে তার মৃত্যু হয়। এভাবে আসওয়াদের মৃত্যু হল।

কালবী (রঃ)-এর বর্ণনা হল, আসওয়াদ একদিন ঘর থেকে বের হয়। তার পায়ে লু হাওয়া লাগে। লু হাওয়ার কারণে তার দেহ জ্বলে ভষ্ম হলে সে কাল হাবশীর ন্যায় হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় সে বাড়ী ফিরে। কিন্তু তার পরিবারবর্গ তাকে চিনতে পারল না এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে একথাটি শুধু বলে ছিল, আমাকে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিপালক হত্যা করেছে।

হারেস এবনে কায়েস সম্পর্কেও জিব্রাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, মন্দ বন্দা। জীব্রাঈল (আঃ) হারেসের মাথার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আপনার কাজ করে দেয়া হল। এরপর তার নাক থেকে পুঁজের মত বের হতে লাগল। আর এভাবেই তার মৃত্যু হয়।

এ পর্যায়ে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সে লবণাক্ত পানির মাছ খেয়েছিল, সে কারণে তার পিপাসা অনেক বেড়ে যায়। পিপাসা নিবারণের জন্যে সে পানি পান করতে থাকে। অবশেষে তার পেট ফেটে যায় এবং তার মৃত্যু হয়।

মূলত আলোচ্য আয়াতের إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ এর এটিই অর্থ, যারা পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপহাস করে, তাদের শাস্তির জন্যে আমিই যথেষ্ট। বাজ্যার এবং তেবরানী হযরত আনাস এবনে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ

একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু লোকের পার্শ্ব অতিক্রম করে গমন করছিলেন। তারা তাঁর পেছন দিক থেকে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে উপহাস করছিল এবং একথাও বলেছিল, এ হল সে ব্যক্তি যে নিজেকে নবী বলে। তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই ছিলেন, জীব্রাঈল (আঃ) তাদের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, ফলে তাদের শরীরে নখের দাগের মত বসে গেল। কিছুক্ষণ পর সে দাগটি ফোঁড়ায় পরিণত হল এবং তা গলে গেল। অবস্থা এত ভয়াবহ হয় যে কেউ তাদের কাছে যেতে পারছিল না। তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-১৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২১৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮-৭০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৪-৮৫
জাদুল মাছীর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২২
তফসীরে দোররে মনসুর খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১০৭

আর এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, (হে রসূল!) আপনার দুশমনদেরকে আমি দেখে নেব, তাদের ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাদের সঙ্গে বোঝা-পড়ার ব্যাপারে আমিই যথেষ্ট। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলীতে আল্লাহ পাকের এ ঘোষণাই বাস্তবায়ন হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার এ পর্যায়ে লিখেছেন যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিদ্রুপ করত, তাদের মধ্যে কেউ মাথা দিয়ে তাঁর প্রতি ইশারা করত, কেউ তাদের চক্ষুকে এ কুকর্মে ব্যবহার করত, কেউ তাদের অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা এ কাজ করত। এজন্যে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) দুবৃত্তদের সে অঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে অঙ্গ দ্বারা সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রুপ করত।

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ۞

'যারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্যকে মা'বুদ বানাতে চায়, অচিরেই তারা বুঝতে পারবে'।

বস্তুতঃ যে কাফেরদের শাস্তি দুনিয়াতে হয়েছে তারা তাদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে কুফরী ও নাফরমানির পরিণাম বুঝতে পেরেছে, মধ্যলোক এবং পরকালের শাস্তিতো তাদের জন্যে অবধারিত রয়েছেই।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ۞

আর আমি জানি যে, কাফেরদের কথায় (হে রসূল!) আপনার মনঃকষ্ট হয়, তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং উপহাসে আপনি ব্যথিত হন। কিন্তু তাদের কথায় আদৌ আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তাদের অকথ্য উক্তিতে আপনার যে মনে কষ্ট হয় তার প্রতি লক্ষ্য না করে আপনি আল্লাহ পাকের হামদের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ۞

অর্থাৎ সবদিক থেকে মনকে মুক্ত করে এক আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে আপনি মশগুল থাকুন।

"সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী", "সোবহানাল্লাহিল আযীম" পাঠ করতে থাকুন। আল্লাহ পাকের নামের জিকরের মাধ্যমেই মানব মনে শান্তি আসে। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

সতর্ক হও, মনে রেখো, আল্লাহর জিকরেই মানব মনে আসে শান্তি। আর এভাবে মানুষের মনের কষ্ট দূর হয়।

অথবা এর অর্থ হল তাদের কুফরী ও নাফরমানী থেকে এবং আপত্তিকর মন্তব্য থেকে আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করুন এবং আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করুন এজন্যে যে, তিনি আপনাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আপনি নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল আপনি বিনয় প্রকাশ করুন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল নামাজ আদায় করুন।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামাজে মশগুল হতেন। কেননা, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করা যায়, এভাবে তিনি আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হতেন।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ۝

আর (হে রসূল!) মৃত্যুর সময় আসা পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের এবাদত করতে থাকুন। আলোচ্য আয়াতে 'একীন' শব্দটি এক্ষেত্রে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন অন্য আয়াতেও একীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ۝ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ

একীন হল নিশ্চিত বিষয়। যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষের জন্যেই মৃত্যুর আগমন একটি নিশ্চিত বিষয়, এ পৃথিবীতে যার আগমন হয়েছে তাকে এখান থেকে অবশ্যই গমন করতে হবে। তাই এরশাদ হয়েছে- (হে রসূল!) যত দিন আপনি জীবিত আছেন, এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকুন।

আল্লামা বগভী হযরত যোবায়ের এবনে নাজীরের সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করার বা ব্যবসায়ী হওয়ার কোন আদেশ ওহীর মাধ্যেমে দেয়া হয়নি, বরং ওহী প্রেরিত হয়েছেঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ.......

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের হামদের তাসবীহ পাঠ করুন, সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন এবং মৃত্যু আসার মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের বন্দেগী করতে থাকুন[১]"।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৯ রমজান মোতাবেক ২৫ মার্চ, ১৯৯২ ইং
রোজ বুধবার বেলা ১টায় সূরাতুল হিজরের তফসীর সমাপ্ত হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭০-৭১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরাতুন নাহ্‌ল

সূরা নাহ্‌ল প্রসঙ্গে

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ, এতে ১২৮ আয়াত এবং ১৬ টি রুকু রয়েছে।

নামকরণ

'নাহ্‌ল' বলা হয় মধু মক্ষিকাকে। যেহেতু এতে মধু মক্ষিকার কথা রয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুন নাহ্‌ল'। এ সূরার আরেকটি নাম হ্‌ল সূরাতুন নেয়াম। যেহেতু এ সূরায় আল্লাহ্ পাকের অনেক নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে তাই তাকে সূরা নেয়াম বলা হয়। আর এ নেয়ামত সমূহের আলোচনা মূলত তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত দলীল প্রমাণ। এর দ্বারা শেরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তৌহীদের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো তাদের সন্দেহ খন্ডন করা হয়েছে। তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর নবুওয়্যত, রেসালাতের বাস্তবতা এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ সূরার শেষ রুকুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রেসালতের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু মক্কায়ে মোয়াজ্জমার কাফের মুশরেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতে খড়্গহস্ত ছিল তাই সূরার শেষে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্য ধারণের এবং তাকওয়া পরহেযগারীর নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে। তবে এবনে এসহাক এবং এবনে জরীর আতা এবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরার সর্বশেষ ৩ আয়াত মদীনা মোনাওয়্যারায় ওহোদের যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে।

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّثَمَانٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١) يُنَزِّلُ
الْمَلٰۤئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا
اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ (٢) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ
تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ
مُّبِيْنٌ (٤) وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا
تَاْكُلُوْنَ (٥) وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ (٦)

তরজমা

(১) আল্লাহ্ পাকের আদেশ এসে গেছে। অতএব, তাড়াহুড়া করোনা। তারা যা কিছুর সাথে শেরক করে তিনি তা থেকে পবিত্র এবং উর্ধ্বে।

(২) আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তিনি নিগুঢ় তথ্য সহ তাঁর ফেরেশতাকে নাযিল করেন এবং বলেন যে, লোকদেরকে সতর্ক করে দাও, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ বন্দেগীর যোগ্য নেই। অতএব, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

(৩) তিনি আসমান জমীনকে সঠিক ভাবেই তৈরী করেছেন, তিনি তাদের শরীক বর্ণনার অনেক উর্ধ্বে।

(৪) মানুষকে তিনি (একটি ফোটা) শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, এতেই সে কলহ দ্বন্দ্বকারী হয়ে গেল।

(৫) (হে মানব জাতি!) তোমাদের জন্যেই আল্লাহ্ পাক চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদের শীত বস্ত্র এবং বহু প্রকার উপকার রয়েছে এবং এ চতুঃষ্পদ জন্তুদের কোনটা তোমরা খেয়েও থাক।

(৬) এবং তোমরা যখন গোধূলী লগ্নে চতুঃস্পদ জন্তুগুলোকে চারণ-ভূমি থেকে গৃহে নিয়ে আস এবং যখন তাদেরকে সকালে চারণ-ভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

তফসীরুল কোরআন

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ

এ সূরায় তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এজন্যে মুশরেক ও পৌত্তলিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে এ সূরা শুরু করা হয়েছে। যাতে করে তারা তৌহীদের দলিল প্রমাণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেননা তৌহীদে বিশ্বাস হল দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বপ্রথম মানুষকে তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন।

শানে নুযুল

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরবের মুশরেকদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করতেন, কেয়ামত সম্পর্কে সাবধান করতেন, তাই তারা বলতো, কেয়ামত এবং আযাবের কথাতো অনেক শুনি। এ আযাব কবে আসবে? কবে হবে কেয়ামত? তারই জবাবে আলোচ্য আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, আল্লাম বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো-

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

অর্থাৎ কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। তখন কোন কোন কাফের বললো, এ ব্যক্তি বলে, পেছনের সময়ও নিকটবর্তী হয়েছে। যাহোক, কিছু দিনের জন্যে তোমরা তোমাদের কার্যকলাপ মুলতবি রাখ। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর যখন তারা দেখলো যে, কেয়ামত আসলো না তখন তারা বললো আমাদেরকে যে বিষয়ের ভয় দেখানো হয়েছে তার তো কোন নাম নিশানাই নেই। তখন নাযিল হল-

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ.......

অর্থাৎ "মানুষের হিসাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে"। এ আয়াত শ্রবণ করে কিছু কাফের ভীত সন্ত্রস্ত হল, আরও কিছু দিন অপেক্ষা করলো কিন্তু যখন কেয়ামত আসলো না, তারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন অথচ কিছুই হয়নি। তখন আলোচ্য আয়াত-

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ

নাযিল হল অর্থাৎ "আল্লাহর আদেশ এসেই পড়েছে", লোকেরা তখনই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো এবং মনে করলো যে, হয়তো কেয়ামত সত্যি সত্যিই এসে গেছে। এমন সময় আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্য- فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ নাযিল হল। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত হল এবং ভয় ভীতি কম হল।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ নাযিল হল তখন সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। এরপর فلا تستعجلوه নাযিল হল। استعجال এর অর্থ হল কোন জিনিসকে তার নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বে চাওয়া। যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দুটি আঙ্গুল দ্বারা এরশাদ করলেন, আমি এবং কেয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি। হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার অর্থ এই, আমার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না, আমার নবুওয়্যতের জমানা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

তিরমিজী শরীফে হযরত মোস্তাওরাদ এবনে সাদ্দাদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আমাকে কেয়ামতের সময়ই প্রেরণ করা হয়েছে। তবে আমার আগমন হয়েছে কেয়ামতের পূর্বে। এরপর তিনি তাঁর আঙ্গুল মোবারকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, যেমন এ আঙ্গুলটি ঐ আঙ্গুলের পূর্বে, কিন্তু দু'টিই রয়েছে পাশাপাশি।

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব কেয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে অন্যতম। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে যখন প্রেরণ করা হয়, (নবুওয়্যতের পয়গাম নিয়ে) যখন তিনি আসমান সমূহ অতিক্রম করছিলেন তখন আসমানবাসীগণ বলেছিল, আল্লাহু আকবার, কেয়ামত কায়েম হয়ে গেল। কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে যে, امر الله অর্থ হল শাস্তি এবং হত্যাকাণ্ডের শাস্তি। ঘটনা হল এই, নজর এবনে হারেস নামক এক কাফের বলেছিলঃ হে আল্লাহ! এই নবী যদি তোমার তরফ থেকে সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি তোমার তরফ থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর। অর্থাৎ কাফেররা নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বেই আযাবের জন্যে তাড়াহুড়ো করেছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। নজর এবনে হারেস বদরের দিন নিহত হয়।

যেহেতু কাফেররা আযাবের জন্যে তাড়াহুড়ো করছিল তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, তোমরা আযাবের জন্যে তাড়াহুড়ো কেন করছো? আযাব তার নিদৃষ্ট সময়েই আসবে। আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত অটল রয়েছে,

সত্যের জয় সুনিশ্চিত, আর বাতিলের পরাজয় অবধারিত। শুধু যে আখেরাতেই তোমাদের শাস্তি হবে তাই নয়, দুনিয়াতেও তোমরা তোমাদের অপকর্মের পরিণাম ভোগ করবে। যে বিষয়ের আগমন সুনিশ্চিত, যা সমাগত, যা অবশ্যই আসবে তাকে এসে গেছে বলে ধরে নেয়াই পরিণামদর্শী মানুষের কাজ। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ যেন এসেছে। আর একটু যে বিলম্ব হচ্ছে তা আদৌ অকারণে নয়, বরং এতে রয়েছে তোমাদেরই কল্যাণ, হয়তো এর মধ্যে তোমাদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে জীবনকে ধন্য করবে। অতএব সাবধান হও, কুফরী ও নাফরমানী পরিহার কর। আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সচেষ্ট হও। মনে রেখ, যখন আল্লাহর আযাব আসবে তখন কোন কিছুই তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

কাফেরদের শেরক বর্ণনা থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র, তিনি এর বহু উর্ধ্বে। অর্থাৎ- আমি আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করি, তারা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর সাথে শেরক করে আল্লাহ পাক তা থেকে উর্ধ্বে, তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, আপনি যে আল্লাহর তরফ থেকে সংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়া বা আখেরাতে আমাদের প্রতি আযাব হবে, একথা আমরা মেনে নিয়েছি। আর এ কারণেই আমরা মূর্তি পূজা করি কেননা, মূর্তিরা আল্লাহর নিকট আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে একং আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত লাভের ব্যাপারে সাহায্য করবে। একথার জবাবেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "কাফেররা শেরকের যে বর্ণনা দিয়েছে তা থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র এবং অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ পাকের কোন শরীক নেই, আল্লাহর আযাব আসলে কোন কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না"।

يُنَزِّلُ الْمَلَٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ

আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন তথা পবিত্র কোরআন দিয়ে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেন।

আলোচ্য আয়াতে 'রুহ' শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যেভাবে রুহ ফুঁকে দিলে প্রাণহীন দেহ জীবিত হয় তেমনি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা দ্বারা মৃত অন্তর জীবিত হয়। এজন্যে এ পর্যায়ে রুহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর নবীর নিকট ফেরেশতা এজন্যে প্রেরিত হন যেন তাঁরা মানুষকে সতর্ক করেন এবং ঘোষণা করেন যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা এক আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ পাক তাঁর বিচার বিবেচনা মোতাবেক যাঁকে ইচ্ছা তাঁর নিকটই ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেন। কে নবুওয়্যত লাভের যোগ্য, কার নিকট ওহী প্রেরণ করা যাবে এ সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকেরই, এ বিষয়টি আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। পবিত্র কোরআনের সূরা আনআমে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ

আর সূরা হজ্জে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ

যাহোক, রসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যই হল তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা দেয়া, কুফর ও নাফরমানী থেকে মানুষকে রক্ষা কর, তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করা। আর এ আহবান জানিয়েছেন নবীগণ।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বিশেষভাবে দু'টি বিষয়ের সাথে ওহীর সম্পর্ক রয়েছে ১. তৌহিদ তথা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান যা মানুষ মাত্রের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয়। ২. তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায় তৌহিদের বিশ্বাসের মাধ্যমে। আর কর্মক্ষমতার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায় তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক যে মহান স্রষ্টা, তিনিই যে পালনকর্তা, বিশ্বজগত যে তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যেরই অপূর্ব জ্বলন্ত নির্দশন তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ

পূর্ববর্তী আয়াতে সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত এবং তৌহিদের এলম হাসিল করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এ বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

"(হে রসূল!) আপনার পূর্বে যত রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, তাঁদের নিকট এ প্রত্যাদশ পাঠিয়েছি যে, "নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর"।

তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের পর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের উপর। কেননা, মানব জীবন সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত এবং সুন্দর ও সফলকাম হয় তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে, আল্লাহ পাক পূর্বাপর সকলকে তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ

"আর ইতিপূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই উপদেশ প্রদান করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক"।

মূলতঃ যখন মানব মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় তখনই সে কল্যাণকর কাজে অগ্রসর হয় এবং মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। যাহোক, তৌহিদে বিশ্বাস ও তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের তাগিদের পর আলোচ্য আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বহু দলিল প্রমাণের বিবরণ স্থান পেয়েছে। কুদরত হেকমতের দলিল স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের কোন একটি বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, করুণাময় আল্লাহ পাক যেমন তোমাদের স্রষ্টা এবং পালনকর্তা তেমনি তিনি তোমাদেরকে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করে রেখেছেন। শুধু তাই নয়; বরং তোমাদের শত নাফরমানী সত্ত্বেও, তিনি তোমাদের শাস্তি বিধানের ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করেন না। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল তাঁর মারেফাত হাসিল করা, তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার হওয়া, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম আসমান জমীনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আসমান জমীন সঠিকভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের শরীক বর্ণনা থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। বস্তুতঃ জমিন আসমান তথা নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, তার সুশৃংখল পরিচালনা, সব কিছুর সুনিয়ন্ত্রণ-এসব আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জীবন্ত স্বাক্ষর। আল্লাহ্ পাকের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকলে কবে আসমান জমিন ভেঙ্গে চুরমান হয়ে যেত! তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

(সূরা আম্বিয়াঃ রুকু-২)

"যদি আসমান জমিনে আল্লাহ পাক ব্যতীত একাধিক মা'বুদ থাকত তবে আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যেত"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) بالحق শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হেকমতের সাথে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বিশেষ পরিমাণে, বিশেষ আকৃতিতে এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন। নিখিল বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি নৈপূণ্যই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এর স্রষ্টা এক, অদ্বিতীয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক, বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। যিনি কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত আসমান সমূহকে স্থাপন করে রেখেছেন যাতে কোন ফাটল নেই, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, কোন প্রকার দুর্বলতা নেই। এমনিভাবে বিশাল বিস্তৃত জমীনকে বিছিয়ে রেখেছেন, তাকে মানুষের বাসোপযোগী করে দিয়েছেন এবং ঐ জমীনের অভ্যন্তরে সর্বকালের মানুষের জন্যে উপজীবিকা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আসমান জমীন আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কোথায় এর শুরু, কোথায় বা শেষ তা কেউ জানে না। সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি বস্তু তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার জ্বলন্ত প্রমাণ, জীবন্ত স্বাক্ষর। এজন্যেই আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ....سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(সূরা আলে এমরান)

নিশ্চয় আসমান জমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিজীবি মহলের জন্যে বহু নির্দশন করেছে। প্রকৃত বুদ্ধিমান তারাই, যারা স্মরণ করে আল্লাহ তায়ালাকে দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসে এবং শায়িত অবস্থায় এবং যারা আসমান ও জমিনের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে, তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই বলে ওঠে, ওগো পরওয়ারদেগার! তুমি নিরর্থক সৃষ্টি করোনি এসব কিছু, পবিত্র তুমি, অতএব আমাদের রক্ষা করো দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে"।

মূলতঃ যারা বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে খানিকটা চিন্তা ও গবেষণা করে, তারা অবশ্যই সর্বত্র এক মহাশক্তির অদৃশ্য ক্ষমতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে, এক অল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ করে, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর এভাবেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয় এবং বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে বিশ্ব মানবের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন থাকে। পবিত্র কোরআন এ আয়াতে বিশ্ব মানবের প্রতি এক আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস স্থাপনের এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানিয়েছে।

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ স্বরূপ আসমান জমিনের সৃষ্টির উল্লেখ করার পর এরশাদ হয়েছে–

تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝

'তারা যা কিছুকে আল্লাহর সাথে শেরক করে আল্লাহ পাক তা থেকে অনেক উর্ধ্বে'।

বস্তুত শেরক, পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতায় মানবতার চরম অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়। যারা বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং সৃষ্টি-রহস্যের মাঝে চিন্তা ও গবেষণা করে তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধানতম অন্তরায় শেরক থেকে আত্মরক্ষা করে।

এর পরবর্তী আয়াতে স্বয়ং মানুষের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার আহবান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ۝

"একটি মাত্র ফোটা শুক্র থেকে আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে"।

বস্তুতঃ মানুষ যদি তার নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তবে তার আর দূরে যেতে হয়না, বরং তার নিজের অস্তিত্বই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের মহিমা প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট। একটি তুচ্ছ অপবিত্র শুক্র বিন্দু দিয়ে যার সৃষ্টি সে মানুষ আজ বুদ্ধিমান হল, শক্তিশালী হল, ধী-শক্তির অধিকারী হল, কে তাকে দিল তার অস্তিত্ব, মানবাকৃতি কার দান? কার কৃপায় সে আজ সৃষ্টির সেরা মানুষে পরিণত হয়েছে? তিনিই আল্লাহ পাক যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যদি কোন মানুষ তার সৃষ্টির কথা চিন্তা করে তবে সে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হতে পারেনা, বরং তার কর্তব্য হয় আজীবন আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা পেশ করতে থাকা। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(সূরা বাকারা)

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে, হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে (তথা মানবতার উন্নত আদর্শ গ্রহণ করবে)। সেই আল্লাহ পাক যিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে শয্যরূপে এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ তৈরী করেছেন এবং আসমান থেকে বারি বর্ষণ করে তোমাদের উপজীবিকা স্বরূপ

রকমারী খাদ্য দ্রব্য, ফল-ফলারী উৎপন্ন করেছেন। অতএব, কোন কিছুকেই আল্লাহ পাকের সাথে অংশী স্থাপন করোনা। এবং তোমরা একথার সত্যতা সম্পর্কে অবগত।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর নাফরমান হয়, অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, সে তার অতীতকে ভুলে যায়, বর্তমানকে মাটি করে এবং ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষেকে, যাঁর দানে ধন্য হয়ে মানুষ সৃষ্টির সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে তাঁকে অস্বীকার করার মধ্যে রয়েছে মানবতার অবমাননা। কোন মানুষ যদি আত্ম বিশ্লেষণ করে, আত্ম পরিচয় লাভ করে তবে সে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করে। তাই বলা হয়েছে–

من عرف نفسه فقد عرف ربه

(যে আত্ম পরিচয় লাভ করেছে সে তার পালনকর্তার পরিচয়ও লাভ করেছে।)

মূলতঃ আলোচ্য আয়াতে মানুষকে আত্ম পরিচয় লাভ করে আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের মহিমা উপলব্ধি করার আহবান জানানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের خصيم مبين শব্দের অর্থ হল প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। অর্থাৎ যাকে তুচ্ছ অপবিত্র শুক্র বিন্দু থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সে আজ আল্লাহ পাকের একত্ববাদের ব্যাপারে, কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। সে বলে-

مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

(কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন এগুলো পঁচে যাবে।)

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে উবাই এবনে খালফ জাহমী সম্পর্কে। একদিন একটি পঁচা হাড় নিয়ে সে হাযির হল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললো, আপনি কি বলেন, আল্লাহ এই মৃত হাড়কে জীবিত করবেন? আর তখনই এ আয়াত নাযিল হয়।

তফসীরকার সুদ্দী (রহঃ) লিখেছেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, আয়াত যার সম্পর্কেই নাযিল হোক কিন্তু এর অর্থের ব্যাপকতা রয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ কেয়ামতকে অস্বীকার করবে, পুনর্জীবন এবং পুনরুত্থানকে অমান্য করবে তার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত প্রযোজ্য। যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে সে এ সত্য উপলব্ধি করেনা যে, যিনি শুক্র

থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনঃজীবন দেয়া আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

আর তোমাদের জন্যে তিনি চতুঃষ্পদ জন্তুও সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদের শীতবস্ত্র এবং বহুমুখী উপকার রয়েছে। এর কোন কোন জীব-জন্তু তোমাদের খাদ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। শুধু মানুষের সৃষ্টিই নয়, বরং মানুষের সুখ-সম্পদের ব্যবস্থাও আল্লাহ পাক করেছেন। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন তিনিই করেছেন। আর মানুষের উপকারার্থে তিনি জীব-জন্তু, গৃহপালিত পশু যথা উষ্ট্র, অশ্ব, গরু, ছাগল প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। এসব পশুর পশম দ্বারা মানুষ তার শীতবস্ত্র তৈরী করে। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক উপকার রয়েছে। এগুলোর দুগ্ধ মানুষ পান করে আর সেই দুগ্ধ দ্বারা ঘি, পনির সহ আরো কত রকমারী খাদ্য দ্রব্য তৈরী করা হয়। এসব জন্তুর গোশ্ত, চর্বি সাধারণতঃ মানুষ খেয়ে থাকে। এসব কিছু মানুষের প্রতি করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাকে দান করেছেন জীবন ও জীবনের উপজীবিকা, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁর অনুগত থাকা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝

"এবং যখন তোমরা গোধূলি লগ্নে চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোকে গৃহে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণ-ভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা তার সৌন্দর্য উপভোগ কর"।

অর্থাৎ-এই চতুঃষ্পদ জন্তু শুধু যে তোমাদের বিভিন্ন প্রকার উপকারে আসে তাই নয়, বরং এগুলো দ্বারা ঐশ্বর্য মহিমাও প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ যখন অপরাহ্নে তাদেরকে চারণ-ভূমি থেকে বাড়ীতে নিয়ে আস, তখনকার দৃশ্য হয় বড় মনোরম এবং আনন্দদায়ক। এমনিভাবে যখন প্রভাতে চারণ-ভূমিতে নিয়ে যাও, তখনও দেখার মত একটা দৃশ্য দেখা যায়। অন্য দর্শকরা ঐ সুন্দর দৃশ্য দেখে মন্তব্য করে অমুকের কত সম্পদ! এর দ্বারা সমাজে তোমাদের মর্যাদা প্রকাশ পায়। নিঃসন্দেহে এসব কিছু তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান। এসব দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, জীব-জন্তু দ্বারা একান্ত জরুরী উপকার যা পাওয়া যায় তার উল্লেখের পর সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথার

প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদি অহংকার না থাকে, তবে সৌন্দর্য বা ঐশ্বর্যের ব্যবস্থাপনা ক্ষতিকর হয় না, আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত লাভের পাশাপাশি যদি তাঁর প্রতি শোকর গুজারী অব্যাহত থাকে। কিন্তু যদি দুনিয়ার আসবাবপত্র, সম্পদ ও শক্তি দ্বারা কারো মনে অহংকারের উদ্রেক হয়, তবে তা তার জন্যে হয় অত্যন্ত ক্ষতিকর।[১]

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۗ
اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٧ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا
وَزِيْنَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا
جَآئِرٌ ۗ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١٠

তরজমা

(৭) আর তারা তোমাদের ভার বহন করে দূর দেশে নিয়ে যায়, যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু।

(৮) আর তোমাদের আরোহন এবং শোভা সৌন্দর্যের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর এবং গর্ধব, আর তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা জান না।

(৯) সরল পথ আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বাঁকা পথও আছে। আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎ পথে পরিচালনা করতেন।

(১০) তিনিই তো আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের জন্যে রয়েছে পানীয়, তা দ্বারা গাছপালা উৎপন্ন হয়, তাতে তোমরা জীব-জন্তু চারণ করে থাক।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৪৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৪

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের একেকটি নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে যা তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম আসমান জমিন সৃষ্টির উল্লেখ করার পর মানব জাতির সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে। এরপর মানুষের উপজীবিকার কথা এরশাদ হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে মানুষের যান বাহনের যে সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন তার উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে–

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط

জীব-জন্তুগুলো তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দুর দেশে যেখানে প্রাণান্ত কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি কত দয়াময়, যেখানে মানুষ কোন সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত প্রাণান্ত কষ্ট করে পৌঁছতে পারেনা, সেখানে আল্লাহ্ পাকের সৃষ্ট জীব-জন্তুর উপর আরোহন করে মানুষ অতি সহজেই পৌঁছতে পারে। শুধু যে নিজেরাই পৌঁছতে পারে তাই নয়, বরং তাদের বোঝাও চাপিয়ে দিতে পারে জীব-জন্তুর উপর। এভাবে দূর দেশে অনায়াসে মানুষের আসা যাওয়া করা সম্ভব হয়, এটি মানুষের প্রতি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। এজন্যে মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া। হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি, লক্ষ্য কর তোমাকে তোমার বোঝা নিজেই বহন করতে হত। অথচ আল্লাহ্ পাক তোমাদের কষ্ট দূর করার জন্যে, তোমাদের আরামের জন্যে জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যারা তোমাদের বোঝা বহন করে থাকে–

اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অতীব করুণাময়, অতিশয় দয়ালু"।

তিনি তোমাদের উপকারার্থে এসব জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা দূর দূরান্তে সফর করতে পার, তোমাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র, খাদ্র দ্রব্য বহন করতে পার।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط

"আর তিনি তোমাদের আরোহন এবং শোভা সৌন্দর্যের জন্যে অশ্ব, খচ্চর, গর্দভও সৃষ্টি করেছেন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, অশ্বের গোশ্ত হারাম বা মাকরূহ। হেদায়া নামক

গ্রন্থে রয়েছে, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর নেয়ামতের উল্লেখ করে এরশাদ করেছেনঃ অশ্ব, খচ্চর এবং গর্ধভের উপর তোমরা আরোহন কর এবং এসব জীব-জন্তু তোমাদের শান-শওকত এবং ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটায়। অথচ খাদ্য মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু। আর খাদ্য বস্তু সরবরাহ করা মানুষের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার, কিন্তু আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে এর উল্লেখ করেন নি। এর তাৎপর্য হল এসব জন্তু আরোহন ও ঐশ্বর্য শোভা প্রকাশের জন্যেই, যদি খাদ্য হিসেবে এগুলোর ব্যবহার করা হত তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই এর উল্লেখ করতেন।[১]

আরবের মুশরেকরা অশ্বেরও পূজা করতো। তদানীন্তন কালে অশ্ব, খচ্চর এবং গর্ধভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আধুনিক কালে ইতিহাস বেত্তা হিট্টি তার আরবের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, নজদের অশ্ব এবং হেসা নামক স্থানের গর্ধভ এবং আম্মানের খচ্চর সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। হয়তো এ কারণেই এ তিনটি জন্তুর উল্লেখ আলোচ্য আয়াতে করা হয়েছে।[২]

وَزِينَةً

অর্থাৎ- এসব জীব-জন্তু শুধু যে তোমাদের আরোহন এবং পরিবহনে কাজে লাগে তাই নয়, বরং এর দ্বারা তোমাদের ঐশ্বর্য শোভার বহিঃপ্রকাশও হয়, তোমাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারেও এসব জীব-জন্তুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

আর তোমরা যা জাননা এমন সবও তিনি সৃষ্টি করে থাকেন। অর্থাৎ শুধু এসব জীব-জন্তুই নয়, বরং মানুষ এখনও জানে না, জানতে পারেনি এমন অনেক কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে আখেরাতের সাথে। অর্থাৎ জান্নাতে মোমেনদের জন্যে এমন আরাম আয়েশ এবং আনন্দ উল্লাসের আসবাবপত্র আল্লাহ পাক সৃষ্টি করবেন যা তোমরা মোটেই জান না, যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কর্ণও কখনও শ্রবণ করেনি, কোন অন্তর কখনও কল্পনা করেনি, এমনিভাবে কাফেরদের জন্যে দোযখে এত কঠিন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা তোমাদের জন্যে সত্যিই কল্পনাতীত।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে সে সব জীব-জন্তুর আলোচনা করেছেন যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর সে সব জীব-জন্তুর আলোচনা করেছেন যেগুলো মানুষের আরোহন এবং

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭৬
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৪৯

পরিবহনের কাজে লাগে। আর

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

বলে সে সব জন্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলো সরাসরি মানুষের কাজে লাগে না।[১]

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ........

"আল্লাহ পাকের নিকটই সকল পথ পৌঁছে থাকে, কোন কোন পথ বাঁকাও রয়েছে যা আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছে না। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই সকলকে সঠিক পথের হেদায়েত করতেন"।

বিশ্বের বুকে চলাফেরার কথা এবং দুনিয়ার পথের কথার বলার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক পথে চলার কথাও স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়ে। পৃথিবীতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেখাকে মানুষ মঞ্জিলে মকসুদে হাযির হয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের নিকট পৌঁছার পথ তথা আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হওয়ার পথও সহজ, সরল এবং সঠিক। যার বুদ্ধি বিবেচনা আছে আর সেই বুদ্ধি বিবেচনাকে সে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সে সরল সঠিক পথের সন্ধান পায়। কেননা, আলোচ্য আয়াত সমূহের নিদর্শনগুলোর আলোকে সে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত দেখতে পায় এবং আল্লাহর পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। তৌহীদের পথে এগিয়ে চলে। তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হয় তথা আল্লাহ পাকের মহান দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। পক্ষান্তরে যার বুদ্ধিই নেই, অথবা বুদ্ধি থাকলেও সে বাঁকা পথে চলে অভ্যস্ত, সরল সঠিক পথে চলার তৌফিক সে পায় না, চিরদিনই সে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়া তার নসিব হয় না।

وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

আল্লামা সানাউল্লাহ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক সরল সঠিক পথ সকল মানুষকে দেখিয়েছেন, সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন। কিন্তু সরল সঠিক পথে চলার তৌফিক খুব কম লোকই পেয়েছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পেরেছে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

"আর আমার বন্দাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই শোকর গুজার হয়"।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৪

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করতে পারে, যারা তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত সমূহ লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তারাই সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। মূলতঃ হেদায়েতের পথ সকলের জন্যেই উম্মুক্ত, কিন্তু এজন্যে কাউকে বাধ্য করা হয় না; বরং যে স্বেচ্ছায় সত্যের সন্ধান করে সে তা লাভ করে।

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۝

"তিনিই সেই আল্লাহ পাক যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তোমরা তা পান কর, তা দ্বারা গাছপালা উৎপন্ন হয়, তোমরা তাতে জীব জন্তু চরিয়ে থাক"।

এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই তোমাদের পানাহারের যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক তিনিই তোমাদের লালন পালনের সকল আয়োজন করেছেন। আসমান থেকে তিনি তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন যা তোমরা পান করে থাক। এতদ্ব্যতীত এ পানি দ্বারাই বৃক্ষ-তরুলতা উৎপন্ন হয় তোমাদের জন্যে তা দ্বারা সুস্বাদু ফল-ফলারী উৎপাদন করা হয়। আর এ পানি দ্বারাই ঘাস পাতা উৎপন্ন হয়ে থাকে যা তোমাদের জীব জন্তুর আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রনিধানযোগ্য তা হল, একই মাটি, একই বায়ু, একই পানি, একই আলো, কিন্তু আল্লাহ পাক তা দ্বারা রকমারি ফল, ফসল উৎপন্ন করছেন। স্বাদে-গন্ধে, আকার-আকৃতি এমনকি রূপে ও বর্ণে ফল-ফলারীতে রয়েছে পার্থক্য। এসবই মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের দান যা মানুষ অহরহ ভোগ করে থাকে। অতএব, যারা মানবতার উৎকর্ষ সাধনে বিশ্বাসী, যারা কল্যাণকামী তাদের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের এসব দানের প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করা এবং এজন্যে মহান দাতা আল্লাহ পাকের সমীপে শোকর গুজার থাকা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ যত্ন সহকারে পালন করা।

يُنۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ
الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىۡ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۱۱﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمۡسَ
وَالۡقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوۡمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ
يَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۲﴾ وَمَا ذَرَاَ لَكُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مُخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّذَّكَّرُوۡنَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِىۡ سَخَّرَ الۡبَحۡرَ لِتَاۡكُلُوۡا مِنۡهُ لَحۡمًا
طَرِيًّا وَّتَسۡتَخۡرِجُوۡا مِنۡهُ حِلۡيَةً تَلۡبَسُوۡنَهَا ۚ وَتَرَى الۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ
فِيۡهِ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۱۴﴾

তরজমা

(১১) তিনি তার দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করে থাকেন ফসল, জইতুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফলমুল। নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে যথেষ্ট নিদর্শন।

(১২) আর আল্লাহ পাক রাত-দিন, সূর্য, চন্দ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। আর নক্ষত্ররাজিও তাঁর নির্দেশেই কর্মরত রয়েছে। যারা বোধশক্তি সম্পন্ন তাদের জন্যে রয়েছে এতে যথেষ্ট নির্দশন।

(১৩) আর নানা বর্ণের বহু প্রকার বস্তুও, যা তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে ছড়িয়ে রেখেছেন। এতেও রয়েছে নির্দশন সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(১৪) তিনিতো সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছেন যাতে করে তোমরা তা থেকে টাটকা মাছ খেতে পার এবং সমুদ্র থেকে রত্মাবলী আহরণ করতে পার, যা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান কর। আর তোমরা দেখতে পাও যে নৌকাগুলো তন্মধ্যে ঢেউ কেটে চলেছে আর তা এজন্যে যেন তোমরা আল্লাহ পাকের দান সন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ পাক আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং মানুষের জন্যে বহু প্রকার ফল-ফসলাদি যথা জইতুন, খেজুর, আঙ্গুর প্রভৃতি উৎপাদন করে থাকেন।

লক্ষ্যনীয় বিষয় এই, জমিনের উৎপাদন-শক্তি প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাকের বিধান বিভিন্ন মওসুম নিদৃষ্ট করে দিয়েছে, বিশেষ সময় নির্ধারিত রাখা হয়েছে, জমিনকে প্রস্তুত করার পর তাতে একটি বীজ বপন করা হয়। একটি নিদৃষ্ট পরিমাণ পানি তাতে জীবনী শক্তি এনে দেয়। এমনিভাবে বাতাস এবং মৌসুমী উষ্ণতা এর মাঝে একটি সামঞ্জস্য বিধান করে। আর সূর্যের আলোকরশ্মি তাতে তাপ পৌছাতে থাকে। এসব কিছু একটি বিশেষ ওজন এবং পরিমাণ মোতাবেক আল্লাহ পাকের নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী হতে থাকে। কথা শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং বীজ গলে মাটির সাথে মিশে যায়, এরপর আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই তা চারার রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ধীরে ধীরে তা বড় হয়, ডালা মেলে, ফল ধরে, সূর্যের তাপে বাতাসের উষ্ণতায় ঐ ফল পাকে, তাতে স্বাদ আসে, তখন মানুষ সুস্বাদু সুগন্ধি ফল ভোগ করে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে উৎপাদন করে থাকেন ফসল যথা জইতুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্ব প্রকার ফলমুল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

"নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন তাদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে"।

যদি আল্লাহ পাকের রহমতে আসমান থেকে বারি বর্ষণ না হত, যদি আল্লাহ পাক জমিনের ওপর এ বিধান জারি না করতেন তবে কি মানুষ এসব ফল-ফসলাদি লাভ করতে পারতো! লক্ষ্যনীয়, আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক একটি বৃক্ষে পাঁচ বছরে ফল ধরে কিন্তু কেউ চেষ্টা করলে কি তাতে পাঁচ মাসে ফল ধরবে? তা তো নয়, কেননা আসমান জমিন তথা সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। জমিনের জন্যে যে নিয়ম কানুন আল্লাহ পাক নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন জমিন সেই নিয়ম কানুনের সম্পূর্ণ অনুগত, ক্ষণিকের জন্যে তার মাঝে কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। এসব বিষয়ে চিন্তা করে এক আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত এবং কৃতজ্ঞ হওয়া চিন্তাশীল মানুষের একান্ত কর্তব্য।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

"আর আল্লাহ পাকই রাত দিন সূর্য চন্দ্রকে তোমাদের জন্যে নিয়োজিত রেখেছেন, নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁরই হুকুমে কর্মরত রয়েছে"।

বস্তুতঃ দিন ও রাতের পরিবর্তন বা গমনাগমন এবং চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্তের সঙ্গে মানুষের কত প্রয়োজন, কত উপকার, মানুষের সুখ শান্তি এসব কিছুর সাথে রয়েছে জড়িত। যদি দিন রাত্রির পরিবর্তন না হয়, যদি চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্ত না হয় তাহলে মানুষের জীবন যাত্রা যে অচল হয়ে যাবে একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে। যেমন, কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ط اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ۞ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ۞

(সূরা কাসাস, আয়াত ঃ ৭১-৭২)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ পাক যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মা'বুদ আছে কি যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে, তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না"।

অর্থাৎ "(হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছা যে, আল্লাহ পাক যদি দিনকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন তবে আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন মা'বুদ আছে কি যে তোমাদের জন্যে রাত এনে দেবে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার। তবু কি তোমরা ভেবে দেখেবে না"?

এরপর এরশাদ করেছেনঃ

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"আর আল্লাহ পাকই তাঁর দয়ায় করেছেন তোমাদের জন্য রাত ও দিন যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর দান অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۞

নিশ্চয় দিন রাতের পরিবর্তন এবং চন্দ্র সূর্যের উদয় অস্ত যাওয়ার মাঝে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বহু নির্দশন রয়েছে। আসমানে যে অসংখ্য তারকারাজি রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয় কেননা, এসবই এক আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, এক কথায় সৌরজগতের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুদ্ধিমান মাত্রকে একথা বলতে হয় যে, এসব কিছু এক মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা ও পালনকর্তার বিস্ময়কর কুদরতেরই নিদর্শন সমূহ। আর এ আয়াতে سخر لكم বলে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ এক কথায় সৌরজগতের সবকিছু আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন এবং এসব কিছু মানব জাতির কল্যাণেই নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যারা এ সৃষ্টি সমূহকে উপাস্য মনে করে, তারা কত নিবুদ্ধিতার পরিচয় দেয় তা সহজেই অনুমেয়। কেননা, এসব কিছুকে আল্লাহ্ পাক মানুষের খেদমতেই কর্মরত রেখেছেন। অবশ্য যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে, যারা নির্বোধ নয়, শুধু তারাই এ নির্দশন সমূহ দেখে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ط

পূর্ববর্তী আয়াতে সৌরজগতে বিদ্যমান নিদর্শন সমূহের কথা বলা হয়েছে। নভোমণ্ডলে মানুষের উপকারার্থে আল্লাহ্ পাক যা কিছু রেখেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য কর, তোমাদেরই প্রয়োজনের আয়োজনে আল্লাহ্ পাক কত কিছু ছড়িয়ে রেখেছেন তা দেখে তোমরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস কর। নানা বর্ণের, নানা রূপ ও গন্ধের রকমারী ফল-ফলারী তোমাদেরই জন্যে আল্লাহ্ পাক উৎপাদন করেন। এতদ্ব্যতীত, কত জীব-জন্তু, বৃক্ষ-তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, পাথর, নদ-নদী এসব কিছু হে মানব জাতি! তোমাদেরই জন্যে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করে রেখেছেন। এসব কিছুর বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি প্রকৃতির পার্থক্যকে লক্ষ্য করে মহান স্রষ্টার কুদরত এবং দানের উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন নয়।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۞

'নিশ্চয় এসব কিছুর মধ্যে প্রভূত নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা উপদেশ গ্রহন করে'।

নভোমণ্ডল কি ভূমণ্ডল সর্বত্রই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নির্দশন সমূহ বিদ্যমান। যারা বুদ্ধিমান, যারা পরিণামদর্শী, যারা উপদেশ গ্রহণকারী, তাদের শেখার এবং সত্য উপলব্ধি করার বিপুল উপকরণ রয়েছে এসবের মধ্যে। আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

তিনিইতো সমুদ্রকে অনুগত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে টাটকা মাছ খেতে পার এবং যেন তোমরা সমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা আহরন করতে পার যা তোমাদের গহনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই সমুদ্রকে তোমাদের খেদমতে কর্মরত করেছেন। তোমরা তা থেকে টাটকা মাছ খেতে পার, মণি মুক্তা আহরণ কর। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত কিন্তু সমুদ্র থেকে কত সুস্বাদু মাছের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে করেন তা দেখে আল্লাহ পাকের শোকর আদয় করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত, অকুল উত্তাল সমুদ্রের পাশে মানুষ কত দুর্বল, কিন্তু এ দুর্বল মানুষই বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয়। সমুদ্রের বুক চিরে উত্তাল তরঙ্গের মোকাবেলা করে, জাহাজ নিয়ে মানুষ এগিয়ে যায় তার গন্তব্যের দিকে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে যায় মানুষের মাল পত্র। বিশাল তরঙ্গময় সমুদ্রের উপর যেন মানুষের রাজত্ব, অকুল সমুদ্রকে মানুষের সেবায় কে নিয়োজিত করেছেন? তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক।

সমুদ্র থেকে শুধু টাটকা মাছ পাওয়া যায় তাই নয়, বরং অতি মূল্যবান মনি মুক্তা আহরণ করা হয় সমুদ্রের তলদেশ থেকে। এসব মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকেরই দান।

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ

আর যেন তোমরা সমুদ্রের বুক চিরে গমনাগমনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দানের অন্বেষণ কর।

শোকর গুজারী একান্ত কর্তব্য

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

আর যেন তোমরা এ সমস্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলের সব কিছুকে আল্লাহ পাক মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন যেমন- এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

(সূরা লোকমান)

"তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে আসমান ও জমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহ পাক তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ পরিপুর্ণ করে দিয়েছেন"।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের এসব নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হওয়া।

প্রণিধানযোগ্য বিষয়

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা করা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে। অথচ এই আধুনিক কালে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এ স্বর্ণযুগে আল্লাহ পাকের ঘোষণার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে সর্বত্র, প্রতি মুহূর্তে। কেননা, মানুষ আজ একদিকে মহাশূণ্যে পরিভ্রমণ করছে, মঙ্গল গ্রহে, চন্দ্র লোকে যোগাযোগ করছে, আকাশ বাতাস সব কিছুকে মানুষ আজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সে সমুদ্রের অতল তলে নিজের আস্তানা তৈরী করছে। আল্লাহ পাক মানুষকে যে বিবেধ বুদ্ধি দান করেছেন তা অত্যন্ত প্রখর, শক্তিশালী। অতএব, সে কোন্ যুক্তিতে কোন সৃষ্টির সম্মুখে স্বীয় উন্নত শির নত করবে। মানুষের একান্ত কর্তব্য হল মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবারে মাথানত করা, সর্বক্ষণ তাঁর অনুগত থাকা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যিনি শুধু যে সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন তাই নয়, বরং মানুষের উপকারার্থে নিয়োজিত করে রেখেছেন। যদি মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হয় তবে আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি তাঁর নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা শোকর গুজার হও, তবে আমি তোমাদের প্রতি নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব"।

দুনিয়াতে নেয়ামত বৃদ্ধি করা হবে, যদি নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয়, এটি শোকর-গুজারীর শুভ পরিণতি। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়, বরং আখেরাতেও এজন্যে অশেষ সওয়াব দান করা হবে। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শোকর গুজারী হল নেয়ামত বৃদ্ধির এবং নেয়ামতের পরিপূর্ণতার বাস্তব পন্থা।

অতএব, মানুষ মাত্রেরই একান্ত করনীয় কাজ হল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বদা শোকর গুজার থাকা।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ
رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَعَلٰمٰتٍ
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ
اَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৫) এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে করে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং তোমরা যাতে পথ পাও সেজন্যে তিনি নদ-নদী এবং পথ-ঘাট তৈরী করেছেন।

(১৬) আর তিনি পথচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

(১৭) অতএব, যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, উভয়ে কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

(১৮) আর তোমরা যদি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত গণনা কর তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১৯) আর আল্লাহ্ পাক জানেন যা কিছু তোমরা গোপন কর এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর।

(২০) আর আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।

(২১) তারা মৃত, নির্জীব, কবে হবে তাদের পুনরুত্থান, তা তারা জানে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াত সমূহেও মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের কয়েকটি নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষতঃ যে সব নেয়ামত আল্লাহ্ পাক জমীনে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোরই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন জমীনকে সৃষ্টি করলেন তখন তা নচাচড়া করছিল, (কেননা জমীনকে পানির উপর সৃষ্টি করা হয়েছিল)। এমনকি, ফেরেশতারা বলল এ অবস্থায় জমীনের উপর কেউ বাস করতে পারবে না। সকালে ফেরেশতারা দেখে যে, জমীনের উপর বড় বড় পাহাড় পর্বতের বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন জমীন স্থবির হয়ে গেছে। কিন্তু ফেরেশতারা একথা জানতেই পারেনি যে, পাহাড় কি বস্তু দিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

কায়েস এবনে ওবাদা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, জমীন বলেছে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আদম সন্তানদেরকে আমার উপর বসবাস করতে দেবে, অথচ তারা আমার পৃষ্ঠদেশে গুনাহ করবে এবং অশ্লীলতার প্রসার ঘটাবে। একথা বলার পর জমীনের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হল, তখন আল্লাহ পাক পাহাড়কে জমীনের উপর বসিয়ে দিলেন।[১]

তিরমিজী শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ يَمْتَدُّ

আল্লাহ্ পাক যখন জমীন সৃষ্টি করলেন তখন তা দুলতে লাগল।

فخلق الله الجبال

তখন আল্লাহ্ পাক পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে জমীন স্থবির হয়ে গেল।

فَعَجِبَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ وَقَالَتْ يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ

জমীনের স্থবির হওয়া লক্ষ্য করে ফেরেশতাগণ আশ্চর্যন্বিত হলেন এবং বললেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, হ্যাঁ আছে তা লৌহ।

ফেরেশতাগণ আরজ করলেন, হে আমাদের পরওয়াদেগার! তোমার সৃষ্টিতে লৌহের চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৮০

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আছে তা অগ্নি।

ফেরেশতাগণ আরজ করলেনঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে অগ্নির চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আছে পানি।

তখন ফেরেশতাগণ আরজ করলেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পানির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি?

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আছে, বাতাস। তখন ফেরেশতাগণ আরজ করলেন, হে আমাদের পরওয়াদেগার! তোমার সৃষ্টিতে বাতাসের চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি?

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আছে একজন মানুষ যে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য ধন্য হয়, সে যখন আল্লাহর রাহে ডান হাতে দান করে, তা এত গোপনে দান করে যে তার বাম হাতও জানেনা সে কি দান করেছে।

এই হাদীসে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে যে সব বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার সম্যক পরিচয় রয়েছে আর মানুষকে যে আল্লাহ পাক সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সেরা করে তৈরী করেছেন এর প্রমাণও রয়েছে এবং জমীনকে যে আল্লাহ পাক পাহাড় চাপিয়ে স্থবির করে দিয়েছেন তার ঘোষণাও রয়েছে। মূলতঃ আলোচ্য আয়াতে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ

"আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে করে তোমাদেরকে নিয়ে তা আন্দোলিত না হয়"।

وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۝

"আর তোমরা যাতে পথ পাও সেজন্যে তিনি নদ-নদী এবং পথ–ঘাট তৈরী করেছেন"।

যেভাবে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ পাক জমীনকে মানুষের বাসোপযোগী করেছেন, ঠিক তেমনি মানুষের কল্যাণার্থে তিনি নদ-নদী প্রভৃতিও সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়-পর্বত থেকেই পানি বেরিয়ে আসে, নদ-নদী প্রবাহিত হয়, আর শত শত মাইল দূর দূরান্ত পর্যন্ত নদী বয়ে যায়, মানুষ এ নদ-নদীর মাধ্যমে তার জীবিকা উপার্জনে সচেষ্ট হয়, শুধু তাই নয়, বরং পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি পথিক মুসাফিরের পথ-নির্দেশনার কাজেও ব্যবহৃত হয়। অভিযাত্রী কাফেলার দল এর দ্বারা অজানা পথের সন্ধান পায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ হয়তো এর দ্বারা তোমরা পথ নির্দেশনা পাবে।

وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ۝

"আর আল্লাহ্ পাক পথ-চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং নক্ষত্র দ্বারাও লোকেরা পথ পেয়ে থাকে"।

রাত্রিকালে সমুদ্র যাত্রায় আসমানের তারকারাজি দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত উপকারী হয়। আধুনিক সভ্যতার এ স্বর্ণযুগেও জাহাজের কাপ্তানেরা কম্পাস (দিক নির্ণয়ন যন্ত্র) দ্বারা নক্ষত্রের দিক নির্ণয় করে থাকে।

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন যা ঘোষণা করেছে, আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির এ যুগেও মানুষ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের এ অগ্রযাত্রা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে পবিত্র কোরআন সেকেলে নয়, বরং সর্বাধুনিক, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব এবং যুগ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পবিত্র কোরআনেই রয়েছে।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের عَلٰمٰت শব্দ দ্বারা পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। দিনের বেলা পাহাড় দ্বারা পথ-নির্দেশ পাওয়া যায়। আর রাত্রি বেলা নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

আর কালবী (রঃ) বলেছেন, عَلٰمٰت শব্দ দ্বারা তারকারাজী উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ তারকারাজিই হল চিহ্ন। এ তারকারাজি দ্বারা মানুষ পথ নির্দেশনা পেয়ে থাকে। আর তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের النجم। শব্দ দ্বারা সুরাইয়া নামক সেতারাকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা মানুষ পথ নির্দেশনা পায় এবং কেবলার দিক নির্ণয় করে। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হল, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার থাকা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে নক্ষত্র-পুঞ্জ দ্বারা পথ নির্দেশনা লাভের ব্যবস্থা করেছেন, যেহেতু মক্কার কোরায়েশরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে ভ্রমণ করতো এবং তারকারাজির দ্বারা অজানা পথের সন্ধান লাভ করতো এজন্যে কোন কোন তফসীরকারের মতে, يهتدون শব্দের সর্বনামটি দ্বারা বিশেষভাবে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۝

"অতএব, যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আর যে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না উভয়ে কি সমান? তোমরা কি ভেবে দেখনা"?

তৌহিদের বিবরণ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এমনি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ পাকের এবং তাঁর তৌহিদের উপর ঈমান আনে না, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যারা একটি মশা মাছি এমনকি একটি শস্য কণাও সৃষ্টি করতে পারে না, কোন কিছু সৃষ্টি করা যাদের পক্ষে সম্ভবই হয় না, সেই প্রাণহীন, অকেজো মূর্তিগুলোর সামনে মুশরেকরা মাথা নত করে, মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা যিনি সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের কল্যাণার্থে পৃথিবীর অনেক কিছুকে নিয়োজিত করে রেখেছেন, তাঁর সাথে মুশরেকরা এ প্রাণহীন মূর্তিগুলোকে শরীক করে। তাই আলোচ্য আয়াতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে– افمن يخلق। যিনি নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন আর যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা, উভয়ে কি এক সমান? সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সাথের অন্য কিছুর কি কোন তুলনা হয়? অতএব, বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত না হয়ে যারা হাতে বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করে, তারা চরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একাধিক স্থানে তৌহিদের যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা ও মূর্খতার অন্ধকারে যারা আচ্ছন্ন ছিল বা থাকবে, তাদেরকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হেদায়াতের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্যে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে করে বিভ্রান্ত, লক্ষ্য চ্যুত মানুষ এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করতে পারে। কেননা, মানবতার কল্যাণের তথা বিশ্বমানবের জীবন সাধনার সাফল্যের পূর্বশত হল আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান। দুনিয়াতে মানুষ অগণিত সৎ কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে, কোটি কোটি ডলার, পাউণ্ড, টাকা দুর্গত মানবতার সেবায় ব্যয় করতে পারে, কিন্তু আখেরাতে ঈমান ব্যতীত কোন সৎ কাজই গ্রহনযোগ্য হবে না।

আল্লাহ পাকের মা'রেফাত

এ ঈমান লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে পরিচিত হওয়া একান্ত জরুরী। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর গুণাবলী বা পরিচয় এভাবে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ

(সূরা যুমার)

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই সব কিছুর স্রষ্টা।

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা বাকারা)

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।)

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(সূরা বাকারা)

(আসমান ও জমীনের তিনিই স্রষ্টা।)

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(সূরা হাদীদ)

আসমান ও জমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।)

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(সূরা শুরা)

(আসমান ও জমিনের ক্ষমতার চাবিকাঠি তাঁর-ই হাতের মুঠোয়।)

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

(সূরা শুরা)

"আল্লাহ্ পাক নিরাকার, তাঁর কোন আকার নেই, তাঁর কোন স্বরূপ বা দৃষ্টান্তও নেই, তিনি অদ্বিতীয়"।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

(সূরা আনআম)

"কোন চক্ষু তাঁকে দেখতে পারেনা, তিনি দেখেন চক্ষুগুলোকে (তাদের কে)"।

এভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক তাঁর গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। যারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত মহিমা লক্ষ্য করেও তাঁর প্রতি ঈমান আনে না, অহরহ তাঁর অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করেও আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, বরং কুফর শেরক, নাফরমানী, অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামীতে মশগুল থাকে তাদের পরিণাম ভয়াবহ হওয়াই স্বাভাবিক। আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

এত কিছু দেখার এবং বোঝার পরও তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ পাকের তৌহিদের এত দলিল প্রমাণ দেখা সত্ত্বেও সঠিক পথ গ্রহণ করবে না? মানবতার কলংক শেরক ও পৌত্তলিকতা পরিহার করবে না? এ বিষয়টির ওপর আরো গুরুত্বারোপ করে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط

আর যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত শুমার করতে চাও তবে কখনও তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নেয়ামত অসংখ্য, আর তোমাদের গণনা করার সামর্থ্য সীমিত। আল্লাহ পাকের প্রতিটি নেয়ামত বন্দা মাত্রকে তাঁর বন্দেগীতে মশগুল হওয়ার আহবান জানায়, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবীদার হয়। কিন্তু বন্দা আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম, তাই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত হয়ে তোমার অক্ষমতা প্রকাশ কর, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়োনা। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর মাধ্যমেই তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ্ পাক যদি তাঁর নেয়ামতের শোকর গুজারীর জন্যে বা তাঁর হক্ব আদায়ের জন্যে পাকড়াও করেন তবে বন্দার বাঁচার কোন পথ থাকবে না, তাই করুণাময় আল্লাহ্ পাক পরবর্তী বাক্যে ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি তাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার হক্ব আদায়ের তোমরা অক্ষম, বিনীতভাবে এ অক্ষমতা প্রকাশ করলে বা নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করলে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। আর তিনি অতীব দয়াময়। কেননা, তোমাদের কোন যোগ্যতা ব্যতীতই দয়া করে তিনি তোমাদেরকে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তোমাদের নাফরমানীর কারণে তিনি তাঁর নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করেন না।

তৃতীয়তঃ তোমাদের অকৃতজ্ঞতা ও নেমক হারামীর জন্যে তিনি তোমাদের আশু শাস্তির ব্যবস্থা করেন না কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়। আর তোমরা একথা মনে করোনা যে, তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তিনি অবগত নন, বরং তিনি তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۞

তোমরা যা কিছু গোপন রাখ এবং যা কিছু প্রকাশ কর আল্লাহ্ পাক সব কিছুই জানেন। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্যে সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। তোমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনা থাকে তিনি সে সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, গাফলত করার কোন সুযোগ নেই, আখেরাতে তোমাদের প্রত্যেকটি আমলের হিসাব হবে, ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই তোমাদের ভোগ করতে হবে, আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি জুলুম করেন না, করবেন না, প্রত্যেককেই তিনি তার আমলের বিনিময় (পুরস্কার অথবা শাস্তি) প্রদান করবেন। এ আয়াতে রয়েছে আখেরাত সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী।

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۞

আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা নিজেরাই অন্যের সৃষ্টি। অর্থাৎ-কাফের মুশরেকরা যে সব বস্তুর পূজা-অর্চনা করে তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে পূজারীরা নিজ হাতে তৈরী করে। অতএব, যে সব বস্তু নিজেদের অস্তিত্বের জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় তথা যাদেরকে অন্যরা তৈরী করে সেগুলো নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ পাকের শরীক কিভাবে হতে পারে? যাদের মধ্যে সামান্য বিচার বুদ্ধি বা জ্ঞান থাকে, তারা এমনতর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহ মানুষের সম্মুখেই বর্তমান রয়েছে। জমিন-আসমান, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফলারী, পাহাড়-পর্বত, যাবতীয় খাদ্র দ্রব্য, আলো-বাতাস এক কথায় সবই মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান। এর কোন্‌টি মানুষ অস্বীকার করতে পারে। অথচ মুশরেকরা যাদেরকে আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করে, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অবদান রাখা তো তাদের পক্ষে সম্ভবই নয়, বরং তাদের অস্তিত্বই তাদের পূজারীদের অবদান।

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত মুশরেকরা যাদের পূজা করে তাঁদের সেই উপাস্যরা সকলেই মৃত, প্রাণহীণ, জড় পদার্থ, যাদের মধ্যে জীবনের কোন স্পদন নেই এমন কিছুর পূজা করা বা তাদের সম্মুখে মাথা নত করা শুধু যে নির্বুদ্ধিতা তাই নয়, বরং চরম মূর্খতাও।

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۞

তারা শুধু যে প্রাণহীন তাই নয়, বরং তাদেরকে কখন পুনরুত্থিত করা হবে তা-ও তারা জানে না। তাদের পূজারীদের কখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির করা হবে এ খবরও তাদের নেই। এমন অবস্থায় তাদের পূজারীদেরকে কিভাবে তারা পুরস্কৃত করবে। অতএব, এমনি জড় পদার্থের পূজা-অর্চনায় কি উপকার হতে পারে? আর এমন প্রাণহীন বস্তুগুলো কি করে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের উপাস্য হতে পারে? অতএব, যা অজ্ঞ, যা অক্ষম, যা জড় পদার্থ তাদের সম্মুখে মাথা নত করার মত মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না।

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾
لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ
الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২২) তোমাদের মা'বুদ (উপাস্য) এক, অদ্বিতীয় মা'বুদ। মূলতঃ যারা আখেরাতের জীবনকে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারাই অহংকারী।

(২৩) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারী লোকদের পছন্দ করেন না।

(২৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন? তখন তারা বলে, প্রাচীন কালের লোকদের উপকথা মাত্র।

(২৫) পরিণামে কেয়ামতের দিন তারা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে তাদের পাপের বোঝা এবং সে সব লোকদের বোঝাও যাদেরকে তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা পথভ্রষ্ট করেছে। মনে রেখ, তারা যা বহন করবে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত নিদর্শনগুলো এত সুস্পষ্ট যে, যে কোন বুদ্ধিমান বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের তৌহিদে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ

তোমাদের মা'বুদ (উপাস্য) তিনি একক, অদ্বিতীয় মা'বুদ, তাঁর কোন শরীক নেই।

কিন্তু যারা নির্বোধ, যারা ভবিষ্যত জীবন সম্পর্ক চিন্তা করেনা, যাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় নেই তথা এ জীবনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যাদের কোন ধারণাই নেই, পৃথিবীতে কেন তারা এসেছে? কার নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তারা নিজেদের অস্তিত্ব লাভ করেছে? এ জীবনের অবসানের পর তাদের কি অবস্থা হবে? এসব কথা যারা চিন্তা করে না তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং এজন্যে কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ۝

বস্তুতঃ যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর সত্যকে গ্রহণ করেনা, যদি কেউ দিবালোকে চক্ষু বন্ধ করে রাখে এবং সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তবে তার যে অবস্থা হয়, কাফের মুশরেকদেরও অনুরূপ অবস্থা। তাদের অন্তরে সত্যকে গ্রহণ করার এবং অসত্যকে বর্জন করার শক্তি নেই, তাদের দৃষ্টিতে আলো-আঁধারের পার্থক্য নেই। দুনিয়ার জীবনকে তারা চিরস্থায়ী মনে করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে তারা অস্বীকার করে।

قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যারা আখেরাতকে মানে না তাদের অন্তর আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতকে অস্বীকার করে, অথচ এ নেয়ামত সমূহ তারা অহরহ ভোগ করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে অস্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা। এর কারণ এই, আল্লাহ পাক তাদের নাফরমানী নিমকহারী এবং অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে মা'রেফাতের নূর থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাই চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধ। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

(অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি এক সমান?)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহ পাক মখলুককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাঁর নূরের ছিটা তার মধ্যে ফেলেছেন। যে আল্লাহ পাকের নূরের ছিটা-ফোটা পেয়েছ সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর নূরের ছিটা-ফোটা পায়নি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে"। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ.... وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

(আল্লাহ্ পাক ইসলামের জন্যে যার বক্ষ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন তথা যাকে ইসলামকে বুঝবার তৌফিক দান করেছেন সে তার প্রতিপালকের নূরের মধ্যে আছে।) যে এরূপ নয়, সে কি তার সমান? অতএব, দুর্ভোগ বা কঠোর শাস্তি সেই কঠোর অন্তর বিশিষ্ট লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর স্মরণে বিমুখ, তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে আছে।

আল্লাহ্ পাক নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব (পবিত্র কোরআন) যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যা বার বার আবৃত্তি করা হয়, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এর দ্বারা তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, এরপর তাদের দেহ-মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটিই আল্লাহ্ পাকের হেদায়েত। তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা হেদায়েত করেন আর আল্লাহ্ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

একটি প্রশ্ন

প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক যদি হেদায়েত না করেন, তবে কেউ হেদায়েত পায় না, কাফের মুশরেকদের আল্লাহ্ পাক হেদায়েতের তৌফিক দেননি তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এমন অবস্থায় তাদের অপরাধ কোথায়?

জবাব

আল্লাহ্ পাক সকলের জন্যেই নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন। হেদায়েতের পথ সকলের জন্যে উম্মুক্ত, কারো জন্যেই তা বন্ধ নয়, কিন্তু কেউ এ পথ গ্রহণ করেছে আর কেউ করেনি, যারা এ হেদায়েতের পথ গ্রহণ করেনি তারা পথভ্রষ্ট এবং অবশেষে বিপদগ্রস্ত হয়েছে।

হেদায়েত লাভের পন্থা

হেদায়েত লাভের পন্থা হল আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলা এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। যেমন সূরা যুমারে এরশাদ হয়েছেঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ط أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

(সূরা যুমার)

"(হে রসূল!) সুসংবাদ দিন, সেই বন্দাদেরকে যারা মনযোগ সহকারে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে এবং তাঁর উত্তম বাণী সমূহ মেনে চলে। তারাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েত করেন। আর তারাই বুদ্ধিমান"।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যটিতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন কি কারণে মানুষ হেদায়েত গ্রহণ করে না। আর তা হল

وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ

(তারা অহংকারী)

অর্থাৎ- যারা অহংকারী, যাদের চরিত্রে রয়েছে দম্ভ এবং অহংকার তারা হেদায়েত গ্রহণ করেনা, তাদের চারিত্রিক দোষ অহংকারই হেদায়েতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদ, আবু জেহেল, উমাইয়া এবনে খালফ, আকাবা এবনে মুয়ীত গংরা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। মূলতঃ যাদের মধ্যে অহংকারের ন্যায় চারিত্রিক দোষ থাকে তারা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহকে অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ্ পাকের প্রতি তারা ঈমান আনে না এবং আল্লাহর নবীর অনুসরণও করেনা, এভাবে তারা আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। আল্লাহ্ পাক তাদের গোপন ও প্রকাশ্যে অবস্থা এবং যাবতীয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবগত। তাদের মনের গোপনতম কথা এবং বাইরের কর্মকাণ্ড সবই আল্লাহ্ পাকের নিকট সুস্পষ্ট। আর আল্লাহ্ পাক তাদের যাবতীয় অনাচারের শাস্তি বিধান করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফের মুশরেকরা বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ পাককে যে অস্বীকার করে এবং এ সম্পর্কে তাদের বেঈমানীর যে মনোভাব পোষণ করে এবং আল্লাহ্ পাকের এবাদত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে তারা যে দম্ভ প্রকাশ করে- এসব বিষয়ে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত। তাদের কোন কীর্তিকলাপ এমনকি, তাদের মনে কোন ভাবনা-আল্লাহ্ পাকের নিকট আদৌ গোপন নেই।

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ۝

"আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক দাম্ভিক লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, লাল বর্ণের ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমান অহংকারও যার মধ্যে থাকবে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। আর লাল বর্ণের ছোট পিপীলিকার সমান ঈমান যার মধ্যে থাকবে সেও দোযখে যাবে না। এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)!

আমাদের মধ্যে কেউ চায় যে তার পোষাক সুন্দর হোক, আর এটি অহংকারের চিহ্ন, এমন অবস্থায় তার পরিণাম কি হবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন, কোন পোষাককে পছন্দ করার নাম অহংকার নয়, অতএব সুন্দর পোষাক পরিধানের আকাঙ্ক্ষা করার নাম অহংকার নয়, সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি এবং মানুষকে হেয় মনে করার মাধ্যমেই অহংকারের বহিঃপ্রকাশ হয়।

এজন্যে হাদীস শরীফের এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের তৌহিদ এবং এবাদতকে অস্বীকার করার নামই অহংকার। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সত্যের মোকাবেলায় দাম্ভিক হওয়া তথা সত্যকে গ্রহণ না করাই হল অহংকার।

এসব কথার সারমর্ম এই, আল্লাহর এবাদতকে জরুরী মনে না করা এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর দান বলে বিশ্বাস না করাই হল অহংকার।

প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য

মূলতঃ মর্দে মোমেন তার অস্তিত্ব এবং যাবতীয় গুণাবলীকে আল্লাহ পাকের দান বলে বিশ্বাস করে, শুধু তাই নয়, বরং এ জীবন ও জীবনের যথা-সর্বস্বকে আল্লাহ পাকের আমানত মনে করে।

পক্ষান্তরে, কাফেররা তাদের অস্তিত্ব এবং তাদের যাবতীয় গুণাবলীকে নিজস্ব মনে করে। সুফিবাদের ভাষায় যাকে فنا (ফানা) বলা হয় তা হলঃ মানুষ নিজেকে বিলীন করে দেয়। অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব এবং গুণাবলীকে শুধু আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং আল্লাহর দান মনে করবে, আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী মনে করবে।[১]

এজন্যে মরমী কবি বলেছেনঃ

مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاك مین ملکرگل وگلزار ہوتا ہے

যদি উচ্চ মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা কর তবে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দাও। কেননা, বীজ যখন মাটির সঙ্গে মিশে যায় তখনই তা মহীরুহে পরিণত হয়।

যেমন বিষয়টিকে মাওলানা রুমী (রঃ) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৫

تو دراو گم شو وصال اینست وبس
گم شدن گم کن کمال اینست وبس

(তুমি নিজেকে তাঁর মাঝে (আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণে) হারিয়ে ফেল, এটিই প্রকৃত মিলন। আর তুমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ একথাও ভুলে যাও। এভাবেই হবে সাধনার পরিপূর্ণতা আর অর্জিত হবে সাফল্যের মনি মানিক্য।)

যারা আল্লাহর পথের সাধক, তাঁরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। আল্লাহ পাকের স্মরণে সর্বক্ষণ সম্পূর্ণ মগ্ন এবং তন্ময় থাকেন, সর্বদা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, তাঁর জিকর-ফিকরে মুগ্ধ মত্ত এবং মাতোয়ারা থাকেন। এ অবস্থার উন্নতি হতে থাকে ক্রমান্বয়ে। এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁদের কোন আকর্ষণ থাকে না, এখাসকার কোন কিছুই তাঁদের কাম্য হয় না, সর্বক্ষণ তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে থাকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, অন্য কিছু তাদের কাম্য হয় না যেমন হযরত গওসুল আযম (রঃ) বলেছেনঃ

نخواہم خوئیے دنیا نخواہم راحت عقبی
اگرخواہم ترا خواہم نه خواہم باغ رضواںرا

"হে আল্লাহ! দুনিয়ার কোন কিছু আমি চাইনা, আখেরাতের কোন আরাম-আয়েশও আমার কাম্য নয় যদি কিছু আমি চাই তবে শুধু তোমাকে চাই এমনকি বেহেশতের বাগানও নয়"। তিনি আরও বলেছেনঃ

تو جنت را بنیکان ده منو بدرا بدوزخ بر
مرا انجا بس که تمنائے وصال توست

"হে আল্লাহ! তুমি জান্নাত তোমার নেককার বন্দাদেরকে দিও, আমাকে এবং অন্যান্য গুনাহগার লোকদেরকে দোযখেই ফেলে দিও, আমার জন্যে সে স্থানই যথেষ্ট যেখান থেকে তোমার মিলনের আকাঙ্ক্ষা করা সম্ভব হবে"।

বস্তুত, এটিই হল মর্দে মোমেনের বৈশিষ্ট্য কেননা, সে তার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সব কিছুকে এক আল্লাহর পাকের দানই মনে করে। অতএব, জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্বকে মহান দাতা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণে বিলীন করে দেয়াই তার একমাত্র কাম্য। মর্দে মোমেনের এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(সূরা তওবা)

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের জান এবং মাল ক্রয় করেছেন, বিনিময়ে তিনি দান করবেন তাদেরকে জান্নাত।) অতএব, মোমেনের জান ও মাল, জীবন ও সম্পদ যেমন আল্লাহ পাকের দান তেমনি তাঁর ক্রয় করা বস্তুও আর এজন্যে মর্দে মোমেন তার জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাহে বিলীন করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। যাদের এ অবস্থা তারাই প্রকৃত মোমেন। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ .... أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

(সূরা হুজুরাত)

"যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং পরে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেনি এবং যারা তাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহ পাকের রাহে জেহাদ করে, তারাই সত্যিকার মোমেন"।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি হয়েও এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাঁর অনুগত হয়না এবং তাদের হেদায়েতের জন্যে তাঁর প্ররিত নবী রসূলগণকে যারা মানে না, তাঁদের অনুসারী হয় না। তারাই অহংকারী। আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা, তারা অহংকার করে সত্যকে গ্রহণ করেনি আর অহংকার আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট চারিত্রিক দোষ। দাম্ভিক লোকদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পিপীলিকার ন্যায় করা হবে যেন মানুষ তাদেরকে পদদলিত করে এবং তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। আর দোযখে যখন তাদেরকে ফেলা হবে তখন তাদের দেহ হবে অত্যন্ত বড় আকারের যেন তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। সত্যকে গ্রহণ না করার কারণ ছিল তাদের অহংকার। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক দাম্ভিক লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না"।[১]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে এবং বিভিন্ন

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯৮

প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেছে এ আয়াত থেকে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে এবং সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের এ সন্দেহ নতুন কিছু নয়, বরং পূর্বকালের নবীগণের সময়ও এমন সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, আর এ কারণে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের ধ্বংস হওয়াই ছিল সন্দেহের প্রতি-উত্তর। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

"আর তাদের যখন বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন? তারা বলে প্রাচীনকালের লোকদের কিচ্ছা কাহিনী মাত্র"।

শানে নুযুল

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের দলিল হিসেবে ঘোষণা করেন, এই কোরআনে করীম আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহ পাক আমাকে নবী রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আর পবিত্র কোরআন আমার প্রতি নাযিল করেছেন, তখন কাফের মুশরেকরা বলতো এটি আল্লাহর কালাম নয়, বরং এটি প্রাচীন কালের কিচ্ছা কাহিনী (নাউযুবিল্লাহ)। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ আরববাসী যখন একথা জানতে পারে যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তারা হজ্জের মওসুমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিনিধি করে, এদিকে মক্কার মুশরেকরা বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে দুবৃত্তদের মোতায়েন করে রাখে যেন তারা মানুষকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ

লোকেরা যখন মক্কাবাসীকে জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের পরওয়ারদেগার কি নাযিল করেছেন? অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে দাবী করছেন, তাঁর প্রতি আল্লাহ পাক কোরআন নাযিল করেছেন, সে সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি?

قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

তখন তারা বলত, না তেমন কিছু নয়, এটি প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এটি আল্লাহর প্রেরিত কালাম নয়।[১] (নাউযুবিল্লাহ---)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৫

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনকে মোযেজা হিসেবে পেশ করেছেন তখন কাফেররা বলেছে, এটি মোযেজা বলে কিছুই নয়, বরং এতে প্রাচীন কালের লোকদের কিছু কিচ্ছা কাহিনীই রয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)

প্রশ্ন হল পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ আপত্তিকর মন্তব্য কে করেছে? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কাফেররা একে অন্যকে একথা বলেছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হজ্বের উদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে কাফের সর্দাররা যে দুবৃত্তদের মোতায়েন করে রাখত, তারা এসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। ঐ দুবৃত্তরা সর্বদা মানুষকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত।[১]

لِيَحْمِلُوٓا۟ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ

অর্থাৎ- তারা যে পবিত্র কোরআনের অমর্যাদা করেছে এবং এ সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, তার পরিণামে কেয়ামতের দিন তারা নিজেদের গুনাহর বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুনাহর বোঝাও বহন করবে যারা তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং মুসলিম (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাকবে, তাকে নেক আমলকারী সমান সওয়াব দেয়া হবে। (তার আহবানে যে নেক আমল করল) তার সওয়াব কম করা হবেনা। আর যে পাপাচারেরর দিকে মানুষকে আহবান করবে তার এতটুকু গুনাহ হবে, যতখানি পাপাচার হবে। আর এজন্যে যে পাপকার্যে লিপ্ত হবে, তার গুনাহ কম হবে না।

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ

যারা পথভ্রষ্টকারী, তারা তাদের অনুসারীদের কিছু গুনাহর বোঝা বহন করবে।

من অব্যয়টির কারণে এ মর্ম প্রকাশ পায়। কেননা পাপাচারীদের নিজস্ব কিছু গুনাহ থাকবে। আর কিছু গুনাহ পথভ্রষ্টকারীদের কারণে হবে, আর এ গুনাহগুলোর বোঝা কেয়ামতের দিন তাদেরকেই বহন করতে হবে।[২]

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

অর্থাৎ যারা মানুষকে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে পথভ্রষ্ট করে, তাদের নিকট এর কোন জ্ঞান বা দলিল নেই অথবা এর অর্থ হলো যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা অজানা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৭-১৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬; পৃষ্ঠা-৩৮৬

অবস্থায় পথভ্রষ্ট হয়, তারা একথা জানে না যে, পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাদেরকে পথহারা করেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে সতর্কবাণী রয়েছে যে, না জানার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তাদের না জানা ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা আল্লাহ্ পাক প্রত্যেককে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন যা দ্বারা হক্ব ও বাতিল বা ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

সতর্ক হও, তারা যে গুনাহর বোঝা নিজেদের উপর তুলে নিচ্ছে তা অত্যন্ত মন্দ বোঝা। কেননা, যে গুনাহর কাজের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীর ন্যায়ই গুনাহর অংশীদার হয়। কিন্তু এজন্যে অনুসারীর গুনাহর বোঝা এতটুকুও কম হয় না।

আলোচ্য আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা করতো। কেয়ামতের দিন তাদের নিজেদের পাপাচারের শাস্তির পাশাপাশি অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার শাস্তিও তারা ভোগ করবে।[১]

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ
مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ
فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِن سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫২

তরজমা

(২৬) তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন, ফলে তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব আসে যা তারা ভাবতেও পারেনি।

(২৭) এরপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকরা যাদের ব্যাপারে তোমরা বিতণ্ডা করতে। যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, নিশ্চয় আজ অপমান এবং অমঙ্গল কাফেরদের জন্যে।

(২৮) ফেরেশতারা যে কাফেরদের প্রাণ সংহার করে থাকেন এবং যারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করে, তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরাতো কোন অসৎ কাজ করতাম না, বরং নিশ্চয় তোমরা অসৎ কাজ করেছ, তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ভালভাবেই জানেন।

(২৯) অতএব, দোযখের দুয়ারে প্রবেশ কর, চিরদিন তাতে থাক, কত মন্দ দাম্ভিকদের ঠিকানা!

তফসীরুল কোরআন

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছিল এবং পবিত্র কোরআনকে অমান্য করেছিল, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ পূর্ববর্তীকালে যারা এমন অন্যায় করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা। এতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জন্যে এক প্রকার সান্ত্বনা। মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্যে এবং সত্যের আহবানকে চাপা দেয়ার অপচেষ্টায় আজ যারা লিপ্ত রয়েছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে, নবুওয়্যত ও রেসালাতের ইতিহাসে এটি নতুন কোন ঘটনা নয়; বরং ইতোপূর্বেও যুগে যুগে যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখনই সে যুগের দুবৃত্তরা সত্যের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে চক্রান্তের সৌধ নির্মাণ করেছে, কিন্তু অবশেষে ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে। আর এভাবেই ষড়যন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের চির সমাধি ঘটেছে, তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও ষড়যন্ত্র করে গেছে, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসে এবং তাদের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আয়াত করে, পরিণামে তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে।)

নমরূদের ঘটনা

আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হল নমরুদের ঘটনা। সে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল এবং পৃথিবীতে সে-ই সর্ব প্রথম অবাধ্য হয়েছিল, আল্লাহ পাক নমরুদকে ধ্বংস করার জন্যে একটি মশা প্রেরণ করেছিলেন যা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছিল, সুদীর্ঘ ৪০০শ' বছর যাবত ঐ মশাটি তার মগজ চুষে খেয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে সে শুধু ঐ সময়েই একটু স্বস্তি লাভ করত যখন তার মাথায় শক্ত কোন কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করা হত। সে ৪০০শ' বছর রাজত্ব করেছিল এবং চরম অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ ব্যক্তি হল বখতে নসর। এ লোকটিও ছিল অত্যন্ত বড় ষড়যন্ত্রকারী এবং জঘন্য জালেম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যারা ইতিপূর্বে নবী রসূলগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, ষড়যন্ত্রের ইমারত নির্মাণ করেছে যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশ এসেছে তথা যখন তাদের প্রতি আযাবের হুকুম হয়েছে তখন তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা সত্যের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিরুদ্ধে তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সে ব্যবস্থাগুলোই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যেমন কোন সম্প্রদায় যদি তাদের দুশমন থেকে আত্মরক্ষার্থে প্রাসাদ নির্মাণ করে আর ভূমিকম্প এসে সেই প্রাসাদকেই ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের উপর প্রাসাদের ছাদ নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ধ্বংসের উপকরণে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের পরিণামের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে কেউ কোন প্রাসাদ তৈরী করেছিল যা ভেঙ্গে পড়ার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবশ্য এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা নমরুদ এবনে কেনানকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে আল্লাহ পাকের সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সে ইরাকের বাবুল শহরে আসমানের দিকে আরোহনের উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল ৭,৫০০ গজ। কা'ব এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল ৬ মাইল। কিন্তু প্রবল ঝড়ের কারণে ঐ প্রাসাদটি ভেঙ্গে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তার কিছু অংশ কাফেরদের মাথার উপর পড়ার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-২৯
তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৭
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৫

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন যে, নমরুদ নির্মিত এ প্রাসাদটি পাঁচ হাজার গজ উচুঁ ছিল। আর কারো কারো মতে এটি ছয় মাইল উঁচু ছিল। যখন আল্লাহ্ পাক তাদের ধ্বংসের হুকুম জারী করলেন তখন ভূমিকম্পের কারণে ঐ প্রাসাদটির ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যায় আর কাফের মুশরেকরা তার নীচে পড়ে চিরতরে শেষ হয়ে যায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

এরপর তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের উপর এমন স্থান থেকে আযাব আসে যা তারা ভাবতেও পারেনি। ফলে, তারা তাদেরই প্রাসাদের তলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তফসীরকার যাহ্যাক (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তিনি একথাও লিখেছেন, নমরুদ –নির্মিত এ উঁচু এমারতটিকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর ডানার আঘাতে ধ্বংস করে দেন কিন্তু নমরুদ তখন ধ্বংস হয়নি। সে ধ্বংস হয়েছে মশার দংশনে যা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছিল।[২]

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۤءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْؕ

"এরপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং বলবেন, আমার সেই শরীকরা কোথায়? যাদের ব্যাপারে তোমাদের জেদের অন্ত ছিল না"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেক তথা ইসলামের দুশমনদের দুনিয়াতে যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তার উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াতে কাফের মুশরেদের আখেরাতের বিপদ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফের মুশরেকদেরকে কেয়ামতের দিন সম্বোধন করে বলা হবে, দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে মনে করতে এবং মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে, আজ তোমাদের চরম সংকটময় মুহূর্তে তারা কোথায়? এ দুঃখের দিনে তোমাদের

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৯৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০১
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১২৫-২৬

সাহায্যার্থে কেন এগিয়ে আসে না? এভাবে আল্লাহ পাক কাফের মুশরেকদেরকে অপমানিত করবেন আর তাদের সেই কঠিন এবং অসহায় মুহূর্তে তাদের অপমান এবং দুঃখ আরও বাড়িয়ে দেবেন কেননা, এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত কিছুই তাদের নিকট থাকবেনা।

قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۞

তখন পয়গম্বরগণ এবং অন্যান্য মোমেনগণ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত হেদায়েতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কাফের মুশরেকদের দুঃখ ব্যথা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বলবেন, আল্লাহ পাক কেয়ামত সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেলেন তা-ই সত্য প্রমাণিত হল আর কাফেরদের চরম লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হল।

বস্তুতঃ দুনিয়াতে কাফেররা ক্ষেত্রবিশেষে মোমেনদেরকে দরিদ্র ও অপমানিত মনে করে, কেয়ামতের দিন তারা উপলব্ধি করবে যে, প্রকৃত অবস্থায় তারাই অপমানিত এবং লাঞ্ছিত। কাফেরদের অপমান এবং লাঞ্ছনা মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে কাফের মুশরেকদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ অপমান এবং লাঞ্ছনা সেই কাফেরদের জন্যে ফেরেশতারা যাদের প্রাণ সংহার করে থাকেন এবং যারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে। তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা তো কোন অসৎ কাজ করতাম না। যারা কুফর ও নাফরমানীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করে কেননা, তারা নিজেদেরকে চিরকাল আযাবে রাখার ব্যবস্থা করে, আর এটি তাদের প্রতি নিজেদেরই জুলুম। মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা, মরণ মুহূর্তের ভয়াবহ দৃশ্য, ফেরেশতাদের ধমক-সব মিলিয়ে যখন তারা চরম অসহায় হয়ে পড়বে তখন তাদের সকল অহংকার চির বিদায় গ্রহণ করবে, তাদের দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতা কর্পূরের মত উড়ে যাবে, তখন তারা বিনীত হয় বলবে-

فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط

আমরা তো কখনও মন্দ কাজ করিনি। অথবা এর অর্থ হল-কাফেররা তখন আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি, আমরা সব সময়ই ভাল কাজ করে এসেছি।

بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۞

তখন ফেরেশতাগণ বলবেনঃ না, তোমরা সব সময়ই মন্দ কাজ করতে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কাফেররা তখনও মিথ্যা

কথা বলে ফাঁকি দেয়ার অপচেষ্টা করবে, অথচ তাদের জানা উচিত যে আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদের কোন অবস্থাই গোপন নেই। তাই এ মিথ্যাবাদীতার কারণে তাদের কোন উপকার হবে না।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে কাফেরদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হল সেই কাফের যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।

فَادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অতএব, তোমরা দোযখে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। তোমাদের কোন ফন্দি-ফিকির, কোন প্রকার ষড়যন্ত্র, কলাকৌশল আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۝

অতএব, অহংকারীদের ঠিকানা কত মন্দ, কাফের মুশরেকরা তাদের অহংকারের কারণেই নবীর দাওয়াতকে অস্বীকার করতো। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, ঈমানের মোকাবেলায় কুফরী এবং সত্যের মোকাবেলায় অহংকারের পরিণতি অপমান এবং লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, মক্কার কাফেরদেরকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করতো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কি নাযিল হয়েছে? তখন তারা অহংকার করে বলতো, এসবতো প্রাচীনকালের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র। তাদের এ আপত্তিকর মন্তব্যে ছিল অহংকার। ঈমানের মোকাবেলায় নাফরমানী শোকরের মোকাবেলায় না-শোকরী এবং বিনয়ের মোকাবেলায় অহংকার। এ অহংকারে শাস্তিই তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ভোগ করবে।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০২

وَقِيلَ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ
عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ
كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ
يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ
يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٤﴾

তরজমা

(৩০) আর মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন? তারা বলবে, মহা কল্যাণ। যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্যে আছে এই পৃথিবীতে মঙ্গল। আর আখেরাতের আবাস নিঃসন্দেহে আরও উৎকৃষ্ট এবং মোত্তাকী পরহেযগারদের আবাসস্থল কত উত্তম!

(৩১) চিরকাল অবস্থানের বাগান-যাতে তারা প্রবেশ করবে, তার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত রয়েছে, তারা সেখানে যা কিছু কামনা করবে তাই পাবে। এভাবেই আল্লাহ পাক পরহেযগারদেরকে পুরষ্কার দান করবেন।

(৩২) ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায়। তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের কর্মফল হিসেবেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

(৩৩) তারা কি শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের নিকট ফেরেশতা আগমনের? অথবা আল্লাহর হুকুমের? তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এমনি কাজ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

(৩৪) ফলে তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই অন্যায় অপকর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল তাই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা পবিত্র কোরআনকে প্রাচীন কালের কিস্সা কাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে নেককার পরহেযগার লোকদের কথা আলোচিত হয়েছে যাদের অন্তরে অহংকার নেই, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হয়, তাদেরকে যখন পবিত্র কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তারা বলে, তা হল অত্যন্ত উত্তম বাণী, তা মহা কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ

আর যখন পরহেযগার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি নাযিল করেছেন? তখন তারা বলবে, অতি উত্তম বাণী। এতে রয়েছে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণ।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ

যারা দুনিয়াতে নেক আমল করে তাদের জন্যে এ দুনিয়াতেই রয়েছে কল্যাণ।

আলোচ্য আয়াতের حسنة শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল নেক আমলের সওয়াবকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা অর্থাৎ যারা নেক আমল করবে, আল্লাহ পাক তাদের সওয়াবকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল বিজয় এবং সাহায্য। অর্থাৎ যে নেক আমল করবে, সে লাভ করবে আল্লাহ পাকের সাহায্য। তিনি তাকে দান করবেন বিজয় এবং সাফল্য।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) حسنة শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হল উত্তম রিয্ক। অর্থাৎ যে নেক আমল করবে আল্লাহ পাক তাকে উত্তম রিয্ক দান করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে حسنة শব্দটির অর্থ পবিত্র জীবন তথা আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন-অর্থাৎ যারা এ দুনিয়ায় নেক আমল করবে, যারা কোন সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করবে না, যারা শুধু এবং শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করবে এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার জন্যে সাধনায় রত থাকবে এবং আল্লাহর তরফ থেকে হালাল ঘোষিত জিনিসকে হালাল মনে করবে এবং হারাম

ঘোষিত জিনিসকে হারাম মনে করবে, কোন মানুষকে তারা কষ্ট দেয় না, আর তারা এমন নেক আমল করে যার শুভ পরিণতি তারা আখেরাতে লাভ করবে। যারা নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমনি সুন্দর এবং আদর্শ জীবন দান করবেন। এ-তো হল দুনিয়ার জীবনের কথা, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের কথা ঘোষণার করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط

"আর তাদের জন্যে আখেরাতের জিন্দেগী হবে অতি উত্তম"।

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনের নেক আমল করবে, পাপাচার পরিহার করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট থাকবে, সত্য-সাধনায় রত থাকবে, আখেরাতে এর সুফল তারা ভোগ করবে, চিরদিন তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে লাভ করবে সম্মান, মর্যাদা এবং সাফল্য।

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

"আর পরহেযগার লোকদের জন্যে আখেরাত অতি উত্তম স্থান"।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ শব্দ দ্বারা দুনিয়া উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কেননা, যারা পরহেযগার, তারা দুনিয়ার এ জীবনেই আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করে। অবশ্য অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ দ্বারা আখেরাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মূলতঃ আখেরাতের নেয়ামত আখেরাতের সুখ ও সমৃদ্ধি অতুলনীয় এবং কল্পনাতীত। মোমেনগণ বেহেস্তে চিরদিন থাকবে, আনন্দ উল্লাসের যাবতীয় উপকরণ সেখানে বর্তমান থাকবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করে, আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলে, তাদের জন্যে রয়েছে চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতের সুসংবাদ।

পরবর্তী আয়াতে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ

"জান্নাত হলো চির অবস্থানের বাগান-তাতেই তারা প্রবেশ করবে, তার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে। তারা সেখানে যা কিছু কামনা করবে তাই পাবে। এভাবে আল্লাহ পাক পরহেযগার লোকদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন"।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, পূর্ববতী আয়াতের শেষাংশ ছিল–

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ "মোত্তাকী পরহেযগারদের ঘর কতই না ভাল"! এরপর কেউ যেন এ প্রশ্ন করল এ প্রশংসনীয় ঘরটি কোথায়? তারই জবাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا

মোত্তাকীদের সে ঘর হল চির অবস্থানের বাগান, তাতেই তাঁরা প্রবেশ করবে।

ইমাম রাজী (রহঃ) একথাও লিখেছেনঃ جنّٰت শব্দ দ্বারা প্রাসাদ এবং বাগানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর عدن শব্দ দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, বেহেস্তের এ বাগান সমূহ নেককারদের জন্যে চিরস্থায়ী হবে। অগণিত নেয়ামতে পূর্ণ সুখ-সমৃদ্ধির কেন্দ্র বেহেস্তের জীবন কিছু দিন পর শেষ হয়ে যাবে না, বরং এটি হবে চিরস্থায়ী, দুনিয়ার জীবনের মত ক্ষণস্থায়ী নয়।

দ্বিতীয়তঃ বেহেশতে সর্ব প্রকার নেয়ামত মওজুদ থাকবে, যে যখন যা কামনা করবে সঙ্গে সঙ্গে তা পাবে।

তৃতীয়তঃ দুনিয়ার জীবনে সবকিছু পাওয়া যায় না, একটি পেলে আরেকটি দুঃষ্প্রাপ্য হয়। সব কিছু পাওয়া যাবে শুধু জান্নাতে। চাওয়া মাত্রই পাওয়া যাবে, এটি বেহেস্তেরই বৈশিষ্ট্য আর বেহেস্তবাসীদের জন্যে এটিই হল আল্লাহ্ পাকের মহান দান।[১]

كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ۝

এভাবে আল্লাহ্ পাক পরহেযগার লোকদের পুরষ্কৃত করবেন অর্থাৎ-যারা শেরক, নাফরমানী, পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এভাবে পুরষ্কার দান করবেন।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক সকল পরহেযগারকে এমনিভাবে আখেরাতে পুরষ্কার দান করবেন। সবচেয়ে নিম্নস্তরের পরহেযগার হল সে ব্যক্তি যে কুফরী, নাফরমানী ও শেরক থেকে আত্মরক্ষা করে। আর সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরহেযগার হল সে ব্যক্তি যে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৫

সুতরাং যার তাকওয়া পরহেযগারী যে স্তরের হবে, তার পুরস্কারও সে স্তরেরই হবে।[১]

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

অর্থাৎ- মোত্তাকী পরহেযগার হল সে সব লোক, ফেরেশতাগণ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় যাদের রূহ্ কবজ করেন। ফেরেশতাগণ তাদেরকে তখন বলবেন, তোমাদেরকে সালাম, তোমাদের কৃতকর্মের শুভ পরিণতি স্বরূপ তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করো। তোমরা মনের আনন্দে, নিঃশঙ্ক চিত্তে বেহেস্তে গমন কর। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে, তবে স্বাভাবিক নিয়মে তোমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ শুভ পরিণতি লাভের উপকরণ হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতের طيبين শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর ভাষা সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, যারা আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলে, সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, যারা নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হয় এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণে মশগুল থাকে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ সংহার করবেন এমন অবস্থায় যে তারা থাকবে তখন অত্যন্ত পাক এবং পরিচ্ছন্ন।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ যারা শেরক ও পৌত্তলিকতা থেকে পবিত্র থাকে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ পাক তোমাদের হেফাজত করুন। তোমরা তোমাদের নেক আমলের শুভ পরিণতি স্বরূপ বেহেস্তে প্রবেশ করো।[২]

আলোচ্য আয়াতের طيبين শব্দ দ্বারা একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরহেযগারগণের মৃত্যু এমন অবস্থায় হয় যে, তখন তারা কুফর, নাফরমানী এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন থাকে।

পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

অর্থাৎ- তারা কুফর ও নাফরমানীর কারণে নিজেদের প্রতি জলুম করে থাকে, আর এমন অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাদের প্রাণ-সংহার করেন। আর তাদেরই মোকাবেলায় এ আয়াতে পরহেযগারগণের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৩
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৯-৯০

পাক–পবিত্র পরিচ্ছন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করেন। বস্তুতঃ কুফরী, নাফরমানী পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা, পথভ্রষ্টতা, স্বেচ্ছাচারিতা, খোদাদ্রোহীতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাবাদিতা তথা যাবতীয় অন্যায় তৎপরতা মানব জীবনকে কলূষিত করে। মানবতার অবমাননা করে। আর ঈমান, তাকওয়া পরহেযগারী মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুশৃংখল এবং সফল করে তোলে। এ অবস্থাতেই মোমেনদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, তারা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হয় এবং তিনি তাদের প্রতি থাকেন সন্তুষ্ট। এ আয়াতে মোমেনদের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির সু-সংবাদ রয়েছে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের طيبين শব্দটির অর্থ হল সে সব লোক যাদের কথা ও কাজ পবিত্র।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হল সে সব লোক যারা ফেরেশতাদের মাধ্যমে জান্নাতের সু-সংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত হয়েছেন। অথবা এর অর্থ হল এই, যেহেতু নেককার পরহেযগারদের মন সর্বদা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধ থাকে, আর তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর বন্দেগীতে থাকেন নিয়োজিত, তাই দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণের সময় তারা থাকেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট।[১] মহা কবি ইকবাল বলেছেনঃ

نشان مرد مومن باتوگويم = چومرگ آيد تبسم برلب اوست

"আমি বলবো তোমায় মর্দে মোমেনের নিশানী, যখন মৃত্যু আসে তখন তার মুখে থাকে হাসি"।

মোমেনদের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সালাম ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ

এটি ফেরেশতাদের কথা, অর্থাৎ মোমেনদের জীবন-সায়াহ্নে ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম দিয়ে থাকেন। কোন কোন তফসীরকার বাক্যটির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ মোমেনগণকে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন।

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

অর্থাৎ তোমাদের নেক আমলের শুভ পরিণতি স্বরূপ তোমাদের জন্যে জান্নাত তৈরী আছে। যখন মোমেনদের রুহ্ কবজ করা হয় তখন ফেরেশতারা বলেন,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯০

তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। অথবা এর অর্থ হল মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ মোমেনদের বলেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর যখন কেয়ামতের দিন তাদের পুনরুত্থান হবে তখন এ আদেশ হবে-

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

অর্থাৎ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ط

তবে কি কাফেররা ফেরেশতাদের আগমনের অথবা আল্লাহ পাকের আদেশ জারীর অপেক্ষা করছে?

শানে নুযুল

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে মেনে নেয়নি, তারা দাবী করেছে যে, আসমান থেকে ফেরেশতা অবতরণ করে যদি আপনার নবুওয়্যতের উপর সাক্ষ্য প্রদান করে তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কাফেরদের এসব কথার জবাবেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ কুফরী, নাফরমানীর কঠিন শাস্তির কথা ইতোপূর্বে বারে বারে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারীর শুভ পরিণতির কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু কাফেররা কোন যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করছে না, তবে কি তারা তাদের প্রাণ সংহারের জন্যে নিয়োজিত ফেরেশতাদের অপেক্ষা করছে? অথবা আল্লাহ পাকের আদেশ মোতাবেক কেয়ামতের অপেক্ষায় বসে আছে? অথবা আল্লাহ তরফ থেকে কোন আযাবের অপেক্ষা করছে? যখন তাদের উপর কঠিন আযাব আপতিত হবে তখন তারা ঈমান আনবে? এবং আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হবে? তাদের জানা দরকার যে, তখনকার কান্নাকাটি তাদের কোন কাজে আসবেনা।[১]

কর্ম ও ফল

এ জীবনের কর্ম ফল, পরজীবনে ভোগ করতেই হবে, এর ব্যতিক্রম হবার নয়।

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط

তাদের পূর্ববর্তীরাও এমন অন্যায়ই করেছিল, অর্থাৎ এ যুগের কাফের মুশরেকরা যেভাবে আল্লাহ পাকের প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অস্বীকার করেছে, মানবতার মুক্তির মহা সনদ পবিত্র কোরআনকে অমান্য করেছে, মানবতার কলংক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করছে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, মহান দাতা আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামত অহরহ ভোগ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৪

করেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, এটি নতুন কিছু নয়, বরং ইতোপূর্বেও কাফের মুশরেকরা এমন অন্যায় আরচণই করেছে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথে তারা সর্বদাই বাধা সৃষ্টি করেছে, আল্লাহর নবী রসূলগণকে তারা অমান্য করেছে। অবশেষে তার শোচনীয় পরিণামও তারা ভোগ করেছে। আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি, হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় সহ বহু জাতিকে তাদের অন্যায় অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ পৃথিবী থেকে বিদায় করেও দেয়া হয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۝

সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি। আর তাদের পরিবেষ্টন করেছিল তাই, যা নিয়ে তারা বিদ্রুপ করত। আল্লাহর নবী রসূলগণের শত্রুতায় ইতোপূর্বে যারা তৎপর হয়েছিল, দ্বীন ইসলামের মহান শিক্ষাকে যারা উপহাস করেছিল, অবশেষে তাদের উপর আপতিত হয় আল্লাহ পাকের আযাব। তাদের অন্যায় অনাচারের জুলুম অত্যাচারের বীভৎস পরিণাম তারা স্বচক্ষে দেখতে পায়। খোদাদ্রোহীতা তথা সত্যদ্রোহীতা যাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে, যারা সত্যকে শুধু বর্জনই করেনা, বরং সত্যের প্রতি বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করে তাদের আযাব হয় অত্যন্ত কঠিন, তাদের আত্মরক্ষার কোন পথ থাকে না, তাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয় অবধারিত, তাদের দুর্ভাগ্যের জন্যে তারা নিজেরাই হয় দায়ী।

সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে সত্যদ্রোহীদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্ক বাণী। যদিও মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। পবিত্র কোরআন বিশ্বগ্রন্থ। এতে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে রয়েছে হেদায়েত। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি সুসংবাদ যেমন সর্বকালের সকল মানুষের উদ্দেশ্যে ঠিক তেমনি এর প্রতিটি সতর্কবাণীও সকল দেশের সর্বকালীন মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। এ যুগে যারা দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করে এমনকি, দ্বীন ইসলামের বিশেষ নিদর্শন টুপি-দাঁড়িকে উপহাস করে আলোচ্য আয়াতের কঠোর সতর্কবাণী তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, তাদের শাস্তি অবধারিত। এ শাস্তির ভয়াবহতা তারা তখনই উপলব্ধি করবে, যখন তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবে। বিশেষতঃ যখন তারা এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায় নেবে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত ১৯১৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দ্বীন ইসলামকে উপহাস করা হয়েছিল, বোখারা, সমরকন্দ, আজারবাইজান, বাকু, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান সহ বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মসজিদ মাদ্রাসাগুলোকে যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ তাদের শক্তি কেন্দ্রগুলো বন্ধ, তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত। কিন্তু শাস্তি শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং আখেরাতে হবে কঠিনতম শাস্তি।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ

"আর আখেরাতের আযাব অত্যন্ত কঠিন," সে আযাব অবধারিত, চিরনির্ধারিত। যারা আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকবে তাদের শুভ পরিণতি তথা জান্নাত সুনিশ্চিত।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, তাঁর বিধানকে অমান্য করবে, এমনকি দ্বীন ইসলামের কোন বিধানকে উপহাস করবে তাদের শাস্তি অবধারিত। আর এ শাস্তি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই হয়ে থাকে। এটি আল্লাহ্‌ পাকের অমোঘ বিধান, এর ব্যতিক্রম নেই।

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن
دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن
شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ
عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

তরজমা

(৩৫) মুশরেকরা বলে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমরা তাঁর ব্যতীত আর কোন কিছুরই উপাসনা করতাম না। আমরাও না আমাদের পূর্ব পুরুষরাও না। তাঁর আদেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছুকে হারাম বলেও স্থির করতাম না। তাদের পূর্ব পুরুষরাও এমনই করেছে। যাহোক, রসূলগণের কর্তব্য তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেয়া।

(৩৬) আমি প্রত্যেক জাতির নিকটই রসূল প্রেরণ করেছি। এ নির্দেশ প্রদান করে যে, তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং শয়তানী পথ বর্জন কর। এরপর তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন আর কিছু লোকের ব্যাপারে পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছিল। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখ।

তফসীরুল কোরআন

মুশরেকরা তাদের কুফর ও নাফরমানী এবং যাবতীয় অন্যায়-অনাচারের সমর্থনে একথাও বলত, যদি আমাদের শেরক ও কুফর এবং নাফরমানী আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় হত, তবে তিনি আমাদেরকে এসব কাজ কেন করতে দেন? আমরা দেবতার পূজা করি, বহিরা, সাবিয়া প্রভৃতি জীব-জন্তুকে হারাম মনে করি, এসব যদি আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় ও অপ্রিয় হতো তবে আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সবকিছু বন্ধ করে দিতে পারতেন। আমাদের বা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে তিনি ইচ্ছা করলে এসব কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। যদি আমাদেরকে শেরক ও কুফরীর কাজ থেকে বাধা দেয়া হতো আর আমরা সে বাধা না মানতাম তবে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, তাঁর সে শক্তি আছে, কিন্তু তিনি আমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখেননি এবং এসব কাজের জন্যে আমাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক আমাদের এসব কাজে সন্তুষ্ট আছেন এবং আমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের উপাসনা বন্দনা বলতে যা কিছু করেছি এগুলো অপরাধ নয়। যদি অপরাধ হতো তবে এসব করার জন্যে আমাদেরকে অবকাশ দেয়া হতো না। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ

"আর মুশরেকরা বলে, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে আমরা তাঁর ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করতাম না, আমরাও না আমাদের পূর্ব পুরুষরাও না। আল্লাহ্ পাকের আদেশ ব্যতীত আমরা কোন কিছু হারাম বলেও সিদ্ধান্ত করতাম না"। মূলত মুশরেকদের এসব কথা শুধু যে মিথ্যা, অন্যায় তাই নয়, বরং আত্ম-প্রবঞ্চনাও বটে। আল্লাহ্ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাঁরা মানুষকে শেরক ও কুফরীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করেছেন, তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকটি মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন যা মানুষকে হক্ব ও বাতিল তথা সত্য-অসত্যের মাঝে পার্থক্য করতে সাহায্য করে। আল্লাহ্ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে আসমানী গ্রন্থ সমূহ প্রেরণ করেছেন, আল্লাহর নবী রসূলগণ যুগে যুগে কুফর শেরক ও নাফরমানী থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

এ পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করেছেন, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, মানবতার উন্নত আদর্শ গ্রহণের জন্যে তাঁরা সর্বদা আহবান জানিয়েছেন। নবী রসূলগণ কুফর শেরক নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন এবং এসব অন্যায়ের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও সকলকে সতর্ক করেছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক কুফর শেরক থেকে বারণ করেননি বলা মিথ্যা এবং প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাক বলপূর্বক তাদেরকে এহেন অন্যায় থেকে বিরত রাখেননি এবং এর কারণ এই যে, মানুষকে কোন কাজে বাধ্য করা বা মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আল্লাহ পাকের বিধান নয়। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

(যার ইচ্ছা ঈমান আন যার ইচ্ছা অবাধ্য হও।)

মানুষের কর্মের স্বাধীনতা

মূলতঃ আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মানুষকে ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন, কর্মের স্বাধীনতা দান করেছেন, ভাল বা মন্দ কাজ করার সুযোগ মানুষকে প্রদান করেছেন। ভাল কাজ করলে পুরষ্কার এবং মন্দ কাজ করলে শাস্তি-একথাও জানিয়ে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا

"যার ইচ্ছা, সে আল্লাহর দিকে পথ অবলম্বন করতে পারে"।

মূলতঃ মানুষ ইচ্ছা করলে ভাল কাজ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে মন্দ কাজও করতে পারে, তার ইচ্ছা–শক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগেও কতখানি স্বাধীনতা রয়েছে? এ প্রশ্ন যখন এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট পেশ করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমার পা তোল। সে এক পা তুলল। তিনি বললেন, দ্বিতীয় পা তোল। সে প্রথম পা রেখে দ্বিতীয় পা তুলল। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, না উভয় পা একসঙ্গে তোল। সে বললো, আমি এতে অক্ষম। তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, মানুষের ক্ষমতা এতোখানি যতখানি তুমি দেখিয়েছ আর মানুষ এমন অক্ষম যেমন তুমি অক্ষম রয়েছ।

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ- তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করেছে, তাদের শেরক ও কুফরী এবং নাফরমানীর সমর্থনে এমন অযৌক্তিক কথাই তারা বলেছে। অথচ যুগে যুগে আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণ বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষকে শেরক ও কুফরীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আল্লাহর নবী রসূলগণ মানুষকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে বাধ্য করেননি, কেননা, এটি তাঁদের কাজ নয়।

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

"রসূলগণের কাজতো শুধু মানুষের নিকট আল্লাহ বানী সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া", আর তাঁরা এ কাজ অত্যন্ত যত্ন সহকারে করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি। (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর, মিথ্যা উপাস্যদের থেকে দূরে থাক।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ও পরিবেশে নবী রসূলগণ এভাবে মানুষকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আহবান জানিয়েছেন এবং কুফর, শেরক ও নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে শেরক ও কুফরের পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়ত্ব অর্পণ করে প্রেরণ করেন। কেননা, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগেই জমিনে সর্ব প্রথম শেরক ও কুফর শুরু হয়। এ পর্যায়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হলেন আমাদের নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর হেদায়েত এবং আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের হেফাজত করা হবে। আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এবং তাঁর অনুসরণই হল আখেরাতে নাজাত লাভের একমাত্র পন্থা। কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

(হে রসূল!) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি সকলের নিকট এ মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা শুধু আমার বন্দেগী কর।) যেমন, সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর, এটি সরল সঠিক পথ। অতএব, মুশরেকদের একথা আদৌ সঠিক নয় যে, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে আমরা শেরক করতাম না। তাদেরকে বারে বারে যুগে যুগে সতর্ক করা হয়েছে কিন্তু তারা সতর্ক হয়নি।

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط

মানুষের মধ্যে একদল হেদায়েত লাভ করলো, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হেদায়েত নসীব করলেন, তারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাঁর

নবীগণের হেদায়েত মেনে চললো। আর একদল লোক পথভ্রষ্টই রয়ে গেল, তারা শুধু যে পথহারা এবং দিশেহারা হল তাই নয়, বরং সর্বহারায় পরিণত হল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান রয়েছে যে, বিভিন্ন যুগে বহু জাতি তাদের পাপাচারের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ সর্বস্বান্ত হয়েছে। তারা ইতিহাসের শিক্ষনীয় বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী ও অবাধ্যতার পরিণামে যখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে এসেছে তখন কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে আসেনি। কাফের অবস্থায়ই তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের বাড়ী-ঘর. বাগ-বাগিচা, অর্থ সম্পদ সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এ অবস্থাকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, এরশাদ হয়েছেঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ۝ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ۝

"তারা কত বাগ-বাগিচা, কত ঝরণা, কত শস্য-শ্যামলিমায় পূর্ণ মনোরম স্থান ছেড়ে চলে গেছে। আর যে সব আনন্দ-উল্লাস ও আরাম-আয়েশের সামগ্রী তারা ভোগ করতো সবই তারা ফেলে গেছে। এভাবেই আমি অন্যদেরকে তাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছি, কিন্তু আসমান জমিন তাদের জন্যে ক্রন্দন করেনি"। অতএব, যারা তাদের অন্যায় আচরণের শাস্তি স্বরূপ ধ্বংস হয়েছে তাদের পরিণতি দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ۝

অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, যারা আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা তোমরা দেখ। আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি সহ অন্যান্য কোপগ্রস্ত জাতিগুলোর ভাগ্যে বিপর্যয় ঘটেছে এবং আল্লাহর নাফরমানী ও তাঁর নবীগণের বিরোধিতা করার পরিণতি কত শোচনীয় হয়েছে তা দেখ এবং শিক্ষা গ্রহণ কর। এখনও সময় আছে সাবধান হও, আল্লাহর নবীর আদর্শের অনুসারী হয়ে আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা কর।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "(তাগুত)" শব্দটির অর্থ দেব-দেবীসহ সকল মিথ্যা উপাস্য হতে পারে। অথবা শয়তান ও শয়তানী শক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে। অতএব, কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হল, শয়তানী চক্রের

প্রতারণা ও প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা। শেরক ও কুফর এবং নাফরমানী থেকে দূরে থাকা, তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী হয়ে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, এটিই হল নাজাতের পথ, চির শান্তি চির মুক্তির পথ।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ

এ আয়াতে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ রয়েছে যে, বিশ্বের ইতিহাস তোমাদের সম্মুখে রয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস কর এবং শিক্ষনীয় ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যারা আল্লাহর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল, আল্লাহর নবীগণকে যারা অস্বীকার করেছিল, দ্বীন ইসলামের বিধি-নিষেধকে যারা উপহাস করেছিল তারা আল্লাহ্ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে। অতএব, তোমরা তাদের ধ্বংসের সে স্থানগুলো ভ্রমণ কর এবং তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর, যদি তা না কর তবে পূর্বকালের অবাধ্য জাতিগুলোর মত তোমাদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে, তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে।

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝٣٧ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٨ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۝٣٩ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ
نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٤٠

তরজমা

(৩৭) (হে রসূল!) যদি আপনি তাদের হেদায়েত করতে আগ্রহীও হন কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে তিনি হেদায়েত করবেন না, এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

(৩৮) আর তারা আল্লাহ পাকের নামে কঠোরভাবে শপথ করে বলে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ পাক তাকে পুনঃজীবন দান করবেন না, বরং নিশ্চয় করবেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।

(৩৯) তিনি পুনরুত্থিত করবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য, আর যেন কাফেররা জানতে পারে যে, নিশ্চয় তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

(৪০) আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি তখন তাকে শুধু বলি হও। তখন তা হয়ে যায়।

তফসীরুল কোরআন

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে মানুষের জন্যে অসাধারণ দয়া মায়া ছিল, মানুষের পথভ্রষ্টতায় তিনি হতেন অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যথিত, বিশেষতঃ মক্কার কাফের মুশরেকদেরকে হেদায়েত করার জন্যে তিনি থাকতেন অত্যন্ত উদগ্রীব। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যদিও আপনি কাফের মুশরেকদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আছেন এবং আপনার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই যে, কাফেররা ভ্রান্ত মত ও পথ বর্জন করে সরল সঠিক পথে চলে আসুক এবং দোযখ থেকে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করুক। কিন্তু (হে রসূল!) যারা চরম নাফরমানীর কারণে হেদায়েত লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়। তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, তারা হেদায়েত গ্রহণ করবে না। তাই আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, আর তাদের হেদায়েতের জন্যে আপনার ইচ্ছা এবং সংকল্প যত প্রবল হোক না কেন, তা তাদের পক্ষে ফলপ্রসূ হবে না। তাই এরশাদ হয়েছে-

فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ

সৃষ্টির প্রথম দিন যাদের পথভ্রষ্ঠ হওয়ার কথা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না, আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত করবেন না।

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ۝

আর আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাদের কেউ সাহায্যকারী হবে না। তারা কোন অবস্থাতেই সঠিক পথে আসবে না। অতএব, (হে রসূল!) তাদের কথা চিন্তা করে আপনি ব্যথিত ও চিন্তিত হবেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতে ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা তাদের অন্যায় অনাচারের পরিণতি স্বরূপ হেদায়েত লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে এবং পথভ্রষ্ঠতা তাদের জন্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশকে কার্যকর হতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে হেদায়েত করার জন্যে যতই ব্যাকুল হন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে আনার জন্যে যত চেষ্টাই করুন না কেন তারা কোন অবস্থাতেই হেদায়াত গ্রহণ করবে না। মূলতঃ হেদায়েত আল্লাহ পাকেরই হাতে, তিনি যাকে হেদায়েত করেন সে-ই তা লাভ করে, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত না করেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারে না, কেউ তাকে সাহায্যও করতে পারে না।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ

শানে নুযুল

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম আবুল আলীয়ার সূত্রে লিখেছেন, একজন মুসলমান থেকে জনৈক মুশরেক কিছু পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ করেছিল। মুসলমান ব্যক্তি ঐ মুশরেকের নিকট ঋণ পরিশোধে তাগাদা দেয়ার জন্য গিয়েছিলেন। এই সময় তিনি একথাও বলেছেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের নিকট আমার অনেক আশা রয়েছে। তখন মুশরেক লোকটি বললো, মনে হয় মৃত্যুর পর পুনঃজীবন লাভের ব্যাপারে আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনঃজীবন দান করবেন না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

পরকালীন জীবন ধ্রুব সত্য

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ কাফের মুশরেক আল্লাহ পাকের নামে কঠিন শপথ করে বলতো, মৃত্যুর পর পুনঃজীবন হবে না, আখেরাতের কথা সত্য নয়, পরকাল বলতে কিছুই নেই, এ জীবনই সব কিছু মৃত্যুর পর কখনও মানুষ জীবিত হবে না, অর্থাৎ যেভাবে কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের তৌহিদে বিশ্বাস করত না, ঠিক এমনিভাবে তারা মৃত্যুর পর পুনঃজীবন তথা পুনরুত্থান এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথাও বিশ্বাস করত না। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন-কল্পে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, পরকালীন জীবন ধ্রুব সত্য।

بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

"বরং নিশ্চয় তিনি তা করবেন, তাঁর কথা পাকা হয়ে আছে কিন্তু অধিকাংশ লোকই সে সম্পর্কে অবগত নয়"।

বস্তুতঃ কাফেরদের পরকালকে অস্বীকার করায় আল্লাহ পাকের বিধানের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন হবে না। কেয়ামত অবশ্যই আসবে, প্রত্যেকটি মানুষকে

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অবশ্যই হাযির করা হবে এবং তার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সূরা জুমআয় আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِیْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰی عٰلِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন পর রয়েছ তা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবে। এরপর তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছূ সম্পর্কে অবগত। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের এ জীবনের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করাবেন"।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষের পুনরুত্থান অনিবার্য। যারা এ অমোঘ সত্যকে অস্বীকার করে, তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে। কেয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং ভাল-মন্দের বিচার হওয়া ও নেককারদের পুরস্কার এবং বদকারের শাস্তি-সবই চির নির্ধারিত। এটি আল্লাহ পাকের ঘোষিত অঙ্গীকার। এর বরখেলাফ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সম্পর্কে অবগত নয়। অথবা এর অর্থ হল অধিকাংশ লোক একথার প্রতি বিশ্বাস করেনা যে, কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের প্রতি বিশ্বাস করে, যারা তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানও রাখে, তারা পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করেনা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের একটি মূর্খতার বিবরণ রয়েছে। আর তা হল কাফেররা মনে করত মানুষের মৃত্যু হলে সে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং চিরতরে শেষ হয়ে যায়। কাজেই পুনরুজ্জীবনের প্রশ্ন উত্থিত হয় না। আর যখন মানুষ পরকালীন জিন্দেগীর প্রতি বিশ্বাস করে না তখন সে হক্ব ও বাতিল বা ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করেনা, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সাফল্যকেই প্রকৃত সাফল্য বলে মনে করে। আখেরাতের জীবনের জন্যে কোন সম্বল সংগ্রহ করেনা।

বর্তমান যুগে এ অবস্থাটি প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে কাফের-মুশরেকদের ভুল ধারণা নিরসন-কল্পে ঘোষণা করেছেনঃ কেয়ামত অবশ্যই আসবে, ভাল-মন্দের বিচার নিশ্চয়ই হবে। বিচারের পরই ঈমানদার ও নেককারদেরকে জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত দেয়া হবে আর বেঈমান ও পাপাচারীদেরকে দোযখের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। যিনি তোমাদেরকে ইতোপূর্বে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে তোমাদের পুনরুত্থান আদৌ কঠিন কিছু নয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন, তাঁর সকল ইচ্ছা সর্বত্র সর্বাবস্থায় কার্যকর হয়।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰذِبِينَ ۝

কেয়ামত সংঘটিত হবে এজন্যে যে, কাফেররা যে বিষয়ে মত বিরোধ করত, সে বিষয় যেন তাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয় আর কেয়ামতের দিন যেন কাফেররা জানতে পারে যে, তারা ছিল মিথ্যাবাদী, এজন্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে কেয়ামতের দিন হাযির করবেন। যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এবং আখেরাতের জন্যে কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত এবং মুগ্ধ থাকে, যারা পরকালের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তারা কেয়ামতের দিন এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ঠ, ভাগ্যাহত এবং সর্বস্বান্ত।

পুনরুত্থান আদৌ কঠিন নয়

আর মানব জাতির পুনরুত্থান আল্লাহ পাকের জন্যে কোন কঠিন কাজই নয় কেননা, আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হল এই,

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

(আমি যখন কোন কিছু করতে চাই তখন শুধু বলি হও, তখনই তা হয়ে যায়।)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোন কিছুর ইচ্ছা করা মাত্রই তা বাস্তবায়িত হয়। এতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। অতএব, তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখনই কেয়ামত কায়েম হবে এবং সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থান হবে। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

إِذَا أَرَدْنَٰهُ

(আমি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করি)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত হেকমত এবং শক্তিতে। কোন কিছুর সৃষ্টি অন্য কিছুর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রত্যেকটি সৃষ্টিই আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এজন্যেই যখন কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং কোন কিছুর দৃষ্টান্তও ছিল না তখন তিনি সমগ্র বিশ্ব জগত এবং তার মাঝে যা কিছু আছে, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাই দ্বিতীয়বার এসব কিছু সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়। কেননা, কোন কিছুর সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হওয়াই যথেষ্ট।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, আমার বন্দা আমাকে মিথ্যা

জ্ঞান করেছে, অথচ তার জন্যে তা শোভনীয় ছিল না। আর আমার বন্দা আমাকে গালি দিয়েছে, আর এ কাজটিও তার জন্যে উচিত হয়নি। আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হল এই যে বন্দা বলেছে, যেভাবে আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এভাবে দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না। অথচ প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের চেয়ে সহজ ছিল না। আর বন্দার গালি দেয়া হল এই যে, সে বলেছে, আল্লাহ্ পাক সন্তান-সন্ততি গ্রহণ করেছেন অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নই, আমি কারো পিতাও নই পুত্রও নই, আমার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, বন্দার গালি দেয়া হল এই যে; সে বলেছে আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে অথচ আমি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।[১] (বোখারী শরীফ)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا
ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمَآ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪১) আর যারা নির্যাতীত হওয়ার পর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে, আমি তাহাদেরকে দুনিয়াতেও উত্তম আশ্রয় দান করবো, আর আখেরাতের পুরস্কার অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। হায়! যদি তারা জানতো।

(৪২) তারা সবর অবলম্বন করে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৪

(৪৩) (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও আমি মানুষই প্রেরণ করেছিলাম। তাদের নিকট আমার নির্দেশ প্রেরণ করতাম যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

(৪৪) আমি তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম উজ্জ্বল নিদর্শন ও গ্রন্থ সমূহ সহ। আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছিল আর যেন তারা তাতে চিন্তা করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের আলোচনা ছিল, যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করেছিল এবং শপথ করে বলেছিল যে, মৃত্যুর পর কখনও মানুষের পুনঃজীবন ও পুনরুত্থান হবেনা, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে মোমেনদের উচ্চ মর্তবা লাভের সুসংবাদ রয়েছে যারা আখেরাত এবং কেয়ামতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি খাঁটি ঈমান এবং বিশ্বাসের কারণে মোমেনগণ কাফেরদের দ্বারা নির্যাতীত-উৎপীড়িত হয়েছিলেন, আর সেই ঈমানের কারণে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে তারা সবর করেছিলেন, চরম বিপদের মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখেছেন, অবশেষে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সত্য ও ন্যায়ের জন্য তারা প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে হিজরত করেছেন, কাফেরদের দ্বারা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং নিজের ভিটা-মাটি ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে তাঁদের জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানেই তারা লাভ করবে অসংখ্য নেয়ামত।[১]

শানে নুযুল

আবদুর রাজ্জাক, এবনে জরীর এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) ও দাউদ এবনে হিনদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনে যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবু জনদল এবনে সহল সম্পর্কে। মুশরেকরা তাঁকে মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং তাঁর প্রতি চরম নির্যাতন করেছিল।

এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং আবদ এবনে হোমায়েদ তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁদের প্রতি মক্কার কাফেররা জুলুম করেছিল এবং

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১১

তাঁদেরকে তাঁদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছিল। এ মজলুম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একদল আবিসিনিয়া চলে গিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে মদীনা শরীফে অবস্থান করার তৌফিক দিয়েছিলেন। প্রাণের মদীনাকে দারুল হিজরত বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর মদীনাবাসীকে তাঁদের জন্যে সাহায্যকারী করেছিলেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ছয়জন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে। তাঁরা হলেন হযরত সোহায়েল (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত খাব্বাব (রাঃ), হযরত আবেস (রাঃ) এবং হযরত যোবায়ের (রঃ)। তাঁদেরকে মক্কার কাফেররা চরম নির্যাতন-উৎপীড়ন করেছিল। কিন্তু তাঁরা অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।[২]

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, আমি দুনিয়াতে তাদেরকে উত্তম আশ্রয় দান করবো। আর আখেরাতের সওয়াব তো অনেক বড়। উত্তম আশ্রয়ের তাৎপর্য হলো মদীনা মোনাওয়্যারা। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) যখন কোন মোহাজেরকে কোন কিছু দিতেন তখন বলতেন, এটি নিয়ে নাও, তোমার জন্যে মোবারক হোক, এ হল সেই বস্তু যা দুনিয়াতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আখেরাতে তোমাদের জন্যে যা রয়েছে তা অতি উত্তম। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতেন।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। যারা আল্লাহর রাহে হিযরত করেছে আমি দুনিয়াতে তাদেরকে কল্যাণ দান করবো। কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, দুনিয়াতে কল্যাণ দানের তাৎপর্য হল ঈমানের তৌফিক এবং নেক আমলের সুযোগ।

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

"হায়! যদি তারা জানতো"?

অর্থাৎ যদি কাফেররা একথা জানতো যে আল্লাহ্ পাক মোহাজেরদের জন্যে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে কত নেয়ামত রেখেছেন এবং কত অফুরন্ত দান তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে তবে তারা মুসলমানদের উপর জুলুম করতো না। অথবা এর অর্থ হল যদি মোহাজেরগণ জানতো যে ইসলামের জন্যে নির্যাতন সহ্য করার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে কত পুরস্কার রেখেছেন তবে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৪
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩৭

তারা এ পর্যায়ে আরও সাধনা করতো এবং আরও অধিক পরিমাণে সবর অবলম্বন করতো। অথবা এর অর্থ হলো নির্যাতিত-উৎপীড়িত মোহাজেরদের জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে সে সম্পর্কে মানুষ যদি অবগত হতো তবে যারা এখনও হিযরত করেনি তারা হিযরত করতো, দ্বীন ইসলামের জন্যে বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়তো।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۝

আর তারা সে সব লোক যারা শত অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছে, কিন্তু আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বর্ণনাতীত জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও অবিচলিত রয়েছে আর চরম বিপদ মুহূর্তেও এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রেখেছে। অতএব ধৈর্য ধারণ করা, সবর অবলম্বন করা হলো মোমেনদের বৈশিষ্ট্য। সত্য ও ন্যায়ের পথে আসবে বিপদ, আসবে ঝড়-ঝঞ্জা, মুমিন মাত্রকেই নির্ভিক চিত্তে অবিচলিত অবস্থার সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রদি অটুট ভরসা রাখতে হবে। শুধু এ অবস্থায়ই সে লাভ করবে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে মহান দান, সার্বিক কল্যাণ, সৌভাগ্য এবং সম্মান।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ

শানে নুযুল

কাফেররা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো এবং বললো যে, কোন মানুষ আল্লাহর পয়গম্বর হতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়েত করার জন্যে ফেরেশতা কেন প্রেরণ করলেন না? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের মূর্খতা-প্রসূত একটি ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে। তারা মনে করতো মৃত্যুর পর পুনঃজীবন এবং পুনরুত্থান হবে না। তাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যই হবে এবং এটি আল্লাহ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজই নয়।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরও একটি সন্দেহ এবং ভুল ধারণা দূরীভূত করা হয়েছে। কাফেররা মনে করতো আল্লাহর নবী মানুষ হবে না, হতে হবে ফেরেশতা। তারা বলতো, আল্লাহ পাকের মান অনেক উর্ধ্বে, কাজেই কোন মানুষকে কিভাবে তিনি রসূল হিসাবে প্রেরণ করবেন। যদি তিনি আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন তবে কোন ফেরেশতাকে প্রেরণ করবেন। আল্লাহ পাক

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৭

তাদের এ ভিত্তিহীন সন্দেহ দূর করার নিমিত্তে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি তাদের সবাই পুরুষ মানুষ ছিল। সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত একই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। কোন জাতির হেদায়েতের জন্যে রসূল প্রেরণ করা নতুন কিছু নয়, ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক পুরুষ মানুষকেই নবী ও রসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাঁদের কাজ ছিল মানুষকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবগত করা। আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ প্রদান করা, ভাল কাজের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দেয়া এবং মন্দ কাজের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা।

মূলতঃ আরবের মুশরেকরা দেব-দেবীর পূজা করত, পাথর দিয়ে মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করত। কিন্তু তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, আল্লাহ পাক কেন মানুষকে তাঁর নবী মনোনীত করে প্রেরণ করবেন। তারা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে মেনে নিতে রাজী হতো না, তারা মনে করতো তিনি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, পানাহার করেন, হাটে-বাজারে গমন করেন, তিনি নবী কি করে হন? পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে কাফের মুশরেকদের এসব কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ

(মানুষের জন্যে এটি কি আশ্চর্যজনক বিষয়? যে, আমি তাদেরই এক ব্যক্তির নিকট ওহী প্রেরণ করেছি।) আরো এরশাদ হয়েছেঃ

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ

(তারা বলেছে, ইনি তো তোমাদেরই ন্যায় মানুষ, তোমাদেরই ন্যায় পানাহার করেন) এমনকি কাফেররা একথাও বলেছে ঃ

لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ

(যদি আমাদের প্রতি কোন ফেরেশতা অবতরণ করতো) যাহোক, কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথা জবাবেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ

রসূল সর্বদা মানুষই হন

অর্থাৎ মানুষের হেদায়েতের জন্যে সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষকেই রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই মানুষ ছিলেন, কোন সময়ই এ উদ্দেশ্যে ফেরেশতা প্রেরিত হয়নি, বরং আল্লাহ পাক সর্বদা একজন মানুষকেই নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অতএব সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উত্থিত হতে পারে না।

রসূল শুধূ পুরুষ হন, নারী নয়

পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়্যত শুধু পুরুষের জন্যেই সুনির্দিষ্ট, নারীদের জন্যে এ পদের দ্বার চিররুদ্ধ। এজন্যেই দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ পাক কোন নারীকে নবী মনোনীত করেননি। এমনিভাবে নবুওয়্যত ও রেসালত পদ শুধু মানুষের জন্যেই, ফেরেশতাগণকে কখনো এ পদের জন্য মনোনীত করা হয়নি।

ইমাম রাজী (রঃ)-এর ভাষায়[১]ঃ

دلت الاية على انه تعالى ما ارسل احدا من النساء ودلت أيضا على انه ما ارسل ملكا

রেসালত সম্পর্কে মক্কার কাফের মুশরেকদের সন্দেহ খণ্ডনের পর আল্লাহ পাক তাদেরকে একথাও বলেছেনঃ তোমরা ইতিপূর্বে কে নবী হয়েছেন তা যদি না জান তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। এরশাদ হয়েছেঃ

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۝

"নবুওয়্যত ও রেসালতের ইতিহাস সম্পর্কে যদি তোমরা কিছু না জান, তবে যাদের জ্ঞান আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর"।

অর্থাৎ মানুষই যে আল্লাহর তরফ থেকে নবী রসূল হিসেবে প্রেরিত হন এ ব্যাপারে তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে, তবে পূর্বকালে যাদের নিকট আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। যেমন, বনী ইসরাঈলের নিকট হযরত মূসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতি তৌরাত নাযিল হয়েছে, ইহুদীরা তাঁর অনুসারী বলে দাবী করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। এমনিভাবে ঈসায়ীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী, তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করতে পরে। তারা সকলেই একই জবাব দেবে যে, দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রসূল প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই ছিলেন পুরুষ মানুষ, ফেরেশতা নয়, নারীও নয়।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৩৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৫

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের اهل الذكر শব্দ দ্বারা আহলে তওরাত তথা ইহুদীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর তফসীরকার জুযাজ (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হল যারা আসমানী কিতাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তারা জানে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম মানুষই ছিলেন আর কেউ নয়।

اهل الذكر শব্দ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা পূর্বকালের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

তাকলীদের গুরুত্ব

যেহেতু এ আয়াতে "যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার" আদেশ রয়েছে তাই কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াত দ্বারা ইমামের তাকলীদের গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। যে আলেম নয় তাকে আলেমের অনুসারী হতে হবে, শরীয়তের বিধান আলেমদের নিকট থেকে জানতে হবে এবং তার উপর আমল করতে হবে। কোন হাদীস সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় ইমাম বোখারী (রহ)-এর মতের উপর অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমরা ইমাম বোখারী (রহঃ)-এর মতের উপর আস্থাবান। তিনি কোন হাদীসকে সঠিক বললে পৃথিবীর সকল মানুষ তাকে বিনা দ্বিধায় সঠিক বলে। এমনিভাবে চার ইমামের কোন ইমাম যদি কোন মাছআলা বর্ণনা করেন তবে তাঁদের মতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও কর্তব্য। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অগাধ এলম, অসাধারণ ধী-শক্তি এবং তাকওয়া পরহেযগারীর কারণে তাঁর তাকলীদ করা যুক্তিযুক্ত। এমনিভাবে অন্যান্য ইমামগণের ব্যাপারেও একথা সত্য।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে اهل الذكر অর্থ শুধু আহলে কেতাব নয়; বরং অতীত কালের অবস্থা সম্পর্কে যারা অবগত সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ط

"আমি তাদেরকে উজ্জ্বল নির্দশন এবং কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছি"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাদেরকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে দু'টি জিনিস দান করেছেন ১। উজ্জ্বল নিদর্শন অর্থাৎ মোজেযা সমূহ যা নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে পেশ করা হয়। ২। বিধি- নিষেধ সম্বলিত গ্রন্থ। الزبر শব্দটি গ্রন্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ

"আর তারা যা কিছু করেছে সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন যে, এ দু'টি শব্দের মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভাবে রেসালতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যাকে আল্লাহ্ পাক নবী বা রসূল হিসেবে প্রেরণে করেন, যার প্রতি মানুষের হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তিনি যখন মানুষকে সত্যের প্রতি আহবান করেন, তখন মানুষ যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এমন উজ্জ্বল নির্দশন ও সুস্পষ্ট প্রমাণও আল্লাহ্ পাক তাঁকে দিয়েছেন। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠিটি এক বিরাট অজগর সর্পে পরিণত হয়েছিল। আর ঐ লাঠি দ্বারা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে লোহিত সাগরের মাঝখানে পথ রচিত হয়েছিল। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ) যখন কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হুকুমে দাড়াও বলতেন তখন মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বেরিয়ে আসতেন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু নবীগণের দলপতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাই তাঁকে সর্বাধিক এবং শ্রেষ্ঠ মোজেযা সমূহ দেয়া হয়েছে যেমন তাঁর অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তাঁর কথায় সপ্তম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খায়বরের যুদ্ধের দিন অস্তগামী সূর্য ফিরে এসেছে, আর পবিত্র কোরআনও তাঁর মোজেযা। বিগত চৌদ্দশ' বছরের মধ্যে কেউ পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করতে পারেনি, কেউ -এর অনুরূপ তিনটি আয়াত রচনা করতে সক্ষম হয়নি, পরবর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে–

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۞

"(হে রসূল!) আমি আপনার নিকট স্মারক গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন) নাযিল করেছি। যেন আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যেন তারা চিন্তা করে"।

আলোচ্য আয়াতে الذكر। শব্দটি দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

হযরত আবদুর রহমান (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতে الذكر। শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ইতোপূর্বে যেমন পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আগমন করেছেন, তাঁদের নিকট আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল হয়েছে। ঠিক তেমনি বিশ্বনবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, যাতে সমগ্র মানব জাতির এ জীবন ও পরজীবনের সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, ইতোপূর্বে যে সব আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার মর্মকথা পবিত্র কোরআনে রয়েছে, এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের এক বিরাট ভাণ্ডার পবিত্র কোরআনে সংরক্ষিত রয়েছে। হে নবী! আপনার কাজ হল মানুষকে পবিত্র কোরআনের মর্মকথা সম্পর্কে অবগত করা। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু ওহীর বাহকই নন, বরং তার ব্যাখ্যাকারও।

তিনিই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিধি-নিষেধ পেশ করবেন।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক لِتُبَيِّنَ শব্দ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, হে নবী! আমি আপনার নিকট কোরআন নাযিল করেছি, আপনি কোরআনের মর্মকথা সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। অতএব, মানুষকে পবিত্র কোরআন বুঝিয়ে দেয়া আপনারই কাজ। মানব জাতির নিকট পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বর্ণনা দেয়া আপনার দায়িত্ব।

হে নবী! আপনি সর্বোত্তম সৃষ্টি এবং সমগ্র মানব জাতির সর্দার, পবিত্র কোরআনে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে তা মানুষের নিকট বিস্তারিতভাবে আপনি বর্ণনা করবেন, যা কঠিন, তা সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন যেন তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং গ্রহণ করতে পারে এবং তারা যেন পবিত্র কোরআনে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য এবং সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষায়।[২]

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের এ ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য এবং অনুকরণীয় যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে এসেছে তথা তাঁর হাদীস মোতাবেক হয়েছে।

অতএব, কারো নিজের তরফ থেকে কোন ব্যাখ্যা পেশ করার কোন অবকাশ নেই। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৩৭

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا
السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾
اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا
اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ
سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُوْنَ
رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا
اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾ وَلَهٗ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾
وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾
ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

তরজমা

(৪৫) যারা অপকর্মের ষড়যন্ত্র করছে, তবে কি তারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না? অথবা তাদের উপর তাদের অকল্পনীয় স্থান থেকে আযাব আপতিত হবে না?

(৪৬) অথবা চলাফেরা করার সময়ই তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? যা তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

(৪৭) অথবা তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই পরম করুণাময়, অতীব দয়ালু।

(৪৮) তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ পাক এমন বস্তুও সৃষ্টি করেছেন যা আল্লাহ পাককে বিনীত ভাবে সেজদা করতে করতে ডানে বামে ঢলে পড়ে।

(৪৯) আর আসমান জমীনের সকল জীব-জন্তু এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালাকে সেজদা করে, তারা অহংকার করেনা।

(৫০) তারা ভয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী প্রতিপালককে, আর যে নির্দেশই আসে তারা তা পালন করতে থাকে।

(৫১) আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেন, তোমরা দুই মা'বুদ গ্রহণ করোনা, তিনি তো একমাত্র মা'বুদ, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর।

(৫২) আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর, আর নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য শুধু তাঁরই প্রাপ্য, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপরকেও ভয় করবে?

(৫৩) আর তোমাদের নিকট যা কিছু নেয়ামত রয়েছে সবইতো আল্লাহ পাকের দান আর যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখনতো তাঁরই নিকট তোমরা ফরিয়াদ করতে থাক।

(৫৪) এরপর যখন আল্লাহ পাক তা দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদের এক দল তাদের প্রতিপালকের শরীক আছে বলে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রাচীন কালের বিভিন্ন জাতির নিকট প্রেরিত নবী রসূলগণের ঘটনাবলী এবং পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। আর এ আয়াত সমূহে সত্যদ্রোহী লোকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যারা ইসলাম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। কাফের মুশরেক এবং মুনাফেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার অথবা তাঁকে বন্দী করার অথবা তাঁকে দেশত্যাগে বাধ্য করার চক্রান্ত করেছিল এবং মানুষকে ঈমানের পথ থেকে দূরে রাখার অপকৌশল করেছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যেই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

এরশাদ হয়েছেঃ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ

যারা ষড়যন্ত্রের অপকৌশলে লিপ্ত হয়েছে তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেবেন না যেভাবে কারূনকে ভূমি-বিধ্বস্ত করে ধ্বংস করা হয়েছিল।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে ষড়যন্ত্রকারী বলা হয়েছে, তারা হল মক্কার সে সব কাফের যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। এমনিভাবে, মদীনা শরীফে যখন তিনি হিযরত করলেন তখন মদীনার অধিবাসী দুশমনরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত। আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে উদেশ্যে করা হয়েছে। তারা সর্বদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত।

আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে চার প্রকার হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ

(এক) জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করা হতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, বহু জাতি ভূমিকম্পের কারণে ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে কারূনের মত তাদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করার শাস্তিও দেয়া যেতে পারে।

اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

(দুই) হঠাৎ তাদের উপর আযাব আপতিত হতে পারে। আর তা তাদের অকল্পনীয় পন্থায় এবং কল্পনাতীত স্থান থেকে আসতে পারে। যেমন শোয়ায়েব (আঃ) ও লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি হঠাৎ আযাব এসেছিল। আসমান থেকে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল। এমনিভাবে আকস্মিক কোন আযাব তাদের উপর আসতে পারে।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ۝

(তিন) অথবা চলাফেরার সময় বা ভ্রমণকালে তাদেরকে পাকড়াও করা হতে পারে। হঠাৎ কোন বালা-মুছিবতে তারা গ্রেপ্তার হতে পারে। কাফেরদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে পূর্ব প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন নেই, তাদের চলাফেরার সময় যে কোন মুহূর্তে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ পাকের রয়েছে। তাঁর কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করার সাধ্য কারোই নেই।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ط

(চার) অথবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে তিনি পাকড়াও করবেন। তাদেরকে হঠাৎ কোন বিপদে ফেলা না হলেও পর্যায়ক্রমে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতে পারে যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দ্বারা ধীরে ধীরে তাদেরকে ধ্বংস করা যেতে পারে।

تَخَوُّفٍ

আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, এর অর্থ হল ক্রমে ধ্বংস করা। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ পাক একই সঙ্গে

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করে কোন অপরাধী সম্প্রদায়কে তিনি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করে থাকেন।

মূলতঃ তিনি সবই করতে পারেন, তিনি সর্বশক্তিমান তবে–

فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۝

নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত মেহেরবান, অতীব দয়ালু, এজন্যে তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দান করতে চান।

এভাবে সে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করতে পারে। কেননা, তিনি অত্যন্ত করুণাময়। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন আয়াতের-

تَخَوُّفٍ

শব্দটির অর্থ হল ধীরে ধীরে নিপাত সাধন করা। কোন লোককে আজ, আর কোন লোককে কাল আর কোন লোককে তার পরদিন আল্লাহ পাক ধ্বংস করে থাকেন।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ "ভয়"। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয় তখন তাদের ধ্বংস দেখে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় যদি তাদের ধ্বংস এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অথবা এর অর্থ হল, পূর্বে যে সব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে তাদের ধ্বংসের সেই নিদর্শনগুলো প্রকাশ করা হতে পারে যা দেখে অন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। এরপর তাদের ধ্বংস করা হয় যেমন সামুদ জাতির এ অবস্থাই হয়েছিল। প্রথম দিন তাদের চেহারার বর্ণ হলুদ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন লাল হয়ে যায়, আর তৃতীয় দিন কালো হয়ে যায়। এরপর তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত মেহেরবান, অতিশয় দয়াময়। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক কোন জাতিকে তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি দেননা, বরং অবকাশ দিতে থাকেন যেন তারা আত্মসংশোধনের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করার সুযোগ পায়। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না হওয়ার কারণে কোন কোন সম্প্রদায় নিঃশঙ্ক হয়ে পড়ে এবং তাদের নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে, এমন অবস্থায় তাদের উপর আযাব আপতিত হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, فَاِنَّ رَبَّكُمْ বাক্যটির তাৎপর্য হলো তোমরা এ বিষয়ে অবগত হলে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক

মানুষকেই নবী রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এমন অবস্থায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া তোমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। অন্য রসূলগণের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল তারা অবশেষে ধ্বংস হয়েছে।[১]

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ

তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ পাক এমন বস্তু তৈরী করেছেন যা আল্লাহ তায়ালাকে বিনীত ভাবে সেজদা করতে করতে ডানে বামে ঢলে পড়ে। সমগ্র বিশ্ব জগৎ আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, এর প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অবনত এবং অনুগত।

يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ۝

এমনকি, তাদের ছায়া পর্যন্ত আল্লাহ পাকের সম্মুখে বিনীত হয়ে সেজদারত থাকে, আর আল্লাহ পাকের আদেশ মোতাবেকই তাদের ছায়া ছোট বড় হয়, ডানে বামে চলে।

লক্ষ্যনীয়, দ্বিপ্রহরে যেন প্রত্যেকটি বস্তুই দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়াও দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখনই সূর্য পশ্চিম দিকে চলে যায় তথা দিন যখন ঢলে তখন এর পাশাপাশি ছায়াও ঢলতে থাকে। অবশেষে মাটিতে মিশে যায়। আমরা বিষয়টিকে নামাজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও উপলব্ধি করতে পারি। যেমন, একজন মানুষ প্রথমে নামাজে দণ্ডায়মান হয়, এরপর মাথা নত করে রুকু করে, আর রুকু থেকে উঠে সরাসরি সেজদা রত হয়। ঠিক এমনিভাবে বস্তু মাত্রেরই ছায়াও প্রথমে দণ্ডায়মান থাকে। দ্বিপ্রহরের পর সূর্যের গতির সাথে সাথে চলতে থাকে। অবশেষে মাটির সাথে মিশে যায়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই যেন তাদের ছায়ার মাধ্যমে নামাজ আদায় করতে থাকে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আনুগত্য প্রকাশ করেছে। অতএব, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অবনত মস্তকে হাযির হওয়া, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তথা তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ যত্ন সহকারে পালন করা। কাফেররা যদিও আল্লাহ পাককে সেজদা করেনা, কিন্তু তাদের ছায়া আল্লাহ পাককে অবশ্যই সেজদা করতে থাকে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং তাঁর অতুলনীয় কুদরত হেকমতের প্রতি লক্ষ্য করার এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নভোমণ্ডল ও

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৭

ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের অনুগত, সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জীব জন্তু, কীট-পতঙ্গ, মানব-দানব, ফেরেশতাকুল এক কথায় সবই আল্লাহ পাকের অনুগত, তাঁর হুকুম বরদার। সকাল-সন্ধ্যায় সবই দরবারে এলাহীতে বিনীত ও অবনত অবস্থায় নিজ নিজ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সেজদারত হয়।[১]

এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(আর আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের অনুগত।)

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ যখনই সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যায় তখন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়। পাহাড়-পর্বতের সেজদা হল তার ছায়া। নামাজের অবস্থায় মানুষ যেমন দণ্ডায়মান থাকে তেমনি বৃক্ষগুলো সর্বক্ষণ দণ্ডায়মান থাকে। চতুঃষ্পদ জন্তুগুলো রুকুর অবস্থায় থাকে। আর যেসব প্রাণী মাটির ওপর মাথা রেখে চলাফেরা করে, তারা সেজদারত থাকে। মানুষ যেহেতু আশরাফুল মাখলুকাত এজন্যে মানুষের নামাজে বিনয় প্রকাশের সকল পন্থা কার্যকর হয়। প্রথমে তাকে করজোড়ে দাঁড়াতে হয়, এরপর মাথানত করে রুকু অবস্থায় থাকতে হয়। কিন্তু তবু যেন পরিপূর্ণ আনুগত্য হয় না, তাই তাকে এরপর সেজদায় যেতে হয়। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ যখন আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয়, তখনই সে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে।

মূলতঃ এভাবেই মানবতার বিকাশ হয়, মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে سُجَّدًا অর্থাৎ সেজদারত হওয়ার তাৎপর্য হল আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ যেভাবে সেজদার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের দরবারে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, ঠিক তেমনি সৃষ্টি মাত্রই তা যত বিরাট এবং বিশালই হোক না কেন, সবই আল্লাহ পাকের দরবারে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে, সবই আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদার, অনুগত ভৃত্য। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰۤئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۞

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৩৮

(আর আসমান জমিনের সমস্ত জীব-জন্তু, এমনকি ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ পাককে সেজদা করে, তারা অহংকার করেনা।)

অর্থাৎ আসমান জমিনে যত কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদা রত হয় তথা অনুগত থাকে, যা কিছু আসমানে আছে যেমন, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, আর যা কিছু জমিনে আছে যেমন জীব-জন্তু এক কথায় আসমান জমিনের সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের অনুগত এবং তাঁর মহান দরবারে অবনত থাকে।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ

অর্থাৎ ফেরেশতাগণই! সকলেই বিনীত হয়ে আল্লাহ্ পাককে সেজদা করে থাকে, ক্ষণিকের জন্যে বিন্দুমাত্রও তারা অহংকার করেনা। বিশ্ব সৃষ্টির কি ছোট কি বড় সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মাথা নত করে রাখে। বিনীত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদারত হয়। অতএব, আল্লাহ্ পাকের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানো অথবা গাফলত করা অমার্জনীয় অপরাধ। যারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানায় বা অহংকার করে তাদের শাস্তি হবে কঠোর এবং কঠিন।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ আসমান জমিনের সব কিছুই আল্লাহকে সেজদা করে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হয়েও আল্লাহ্ পাকের দরবারে আনুগত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকে এবং অন্য সৃষ্টির সম্মুখে মাথানত করে এমনকি, তারা আল্লাহর আযাবকে ভয় করেনা, অথচ নিখিল বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এবং ফেরেশতাগণও মহিমাময় আল্লাহ্ পাকের তাবেদারীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকে।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ

আর তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে যিনি পরাক্রমশালী। অথবা এর অর্থ হল, ফেরেশতাগণ এজন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে তাদের উপর কোন প্রকার আযাব না আসে।

وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ۝

আর তাদের যা আদেশ দেয়া হয় তা তারা পালন করে থাকে। অতএব, আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা তাঁর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা ফেরেশতাগণের বৈশিষ্ট্য। হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি যা দেখি

তোমরা তা দেখনা। আর আমি যা শ্রবণ করি তোমরা তা শ্রবণ কর না। শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আসমানে আঙ্গুল পরিমাণ স্থান নেই, যেখানে তাঁর ফেরেশতা সেজদায় মশগুল নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি যদি তোমরা জানতে তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী। আর আনন্দ উল্লাসে মশগুল হতে না। এবং বাড়ী-ঘর ছেড়ে ময়দানে এসে আল্লাহ পাকের দরবারে চিৎকার দিতে এবং ফরিয়াদ করতে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবু জর (রাঃ) বললেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমি বৃক্ষ হতাম তবে আমাকে কেটে ফেলা হতো।[১]

–(আহমদ তিরমিজী, এবনে মাজা)

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ

(আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা দুই মা'বুদে বিশ্বাস করোনা, তিনি একক মা'বুদই, অতএব, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।)

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, করতলগত। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক খাঁটি তৌহিদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন এবং শেরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলতঃ সমগ্র বিশ্বের সব কিছু যখন আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত এবং অবনত ও সেজদারত তখন খবরদার! তোমরা কখনও আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা, তিনি এক, অদ্বিতীয়।

فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۞

অতএব, তোমরা শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে ভয় কর।[২] তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর।

وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আর আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সব কিছুর মালিক এবং তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۭ

(এবাদত তাঁরই, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় কর?)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৯৯
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৮

অর্থাৎ আনুগত্য আল্লাহ্ পাকের প্রতিই থাকতে হয় এবং ভয় শুধু তাঁকেই করতে হবে। ফেরেশতাদের ন্যায় মানুষেরও কর্তব্য হল সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের অনুগত থাকা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কারো কোন কথা মেনে চলার অনুমতি নেই। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, নেসায়ী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানীর কাজে কারো কাছে আনুগত্য প্রকাশ করা বৈধ নয়। আনুগত্য শুধু নেক কাজে, মন্দ কাজে নয়। কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মালিক নেই। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা। অতএব, শুধু তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই মানুষের কর্তব্য। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الدين। শব্দটির অর্থ হলো সৎ কাজের পুরষ্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি। মানুষের আমলের বদলা আল্লাহ্ পাকই দান করবেন। মোমেনদেরকে তাদের নেক আমলের সওয়াব তিনিই দান করবেন। আর তিনিই কাফেরদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন।

আর কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الدين। শব্দটির অর্থ আযাব অর্থাৎ তিনিই কাফেরদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেবেন।

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ۝

এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যদেরকে ভয় কর? অর্থাৎ শুধু আল্লাহ্ তায়ালাকেই ভয় করা উচিত, আর কাউকে নয় কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপকার করতে পারেনা। অপকারও করতে পারেনা। অতএব, শুধু আল্লাহর পাককেই ভয় করতে হবে, অন্য কাউকে নয়।

তোমাদের নিকট যা কিছু নেয়ামত রয়েছে সবইতো আল্লাহ্ পাকের দান। বস্তুতঃ মানুষের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব তথা সম্পদ-শক্তি, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, সম্মান ও পদমর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, জনপ্রিয়তা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এক কথায় সব কিছুইতো আল্লাহ্ পাকের দান, তাঁরই দান এবং তাঁরই করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ۝

এরপর যখন তোমাদের প্রতি বিপদ আসন্ন হয় তখন তোমরা তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতে থাক কেননা, তোমরা জান কঠিন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আল্লাহ্ পাকের দয়া ব্যতীত সম্ভব নয়, তাই বিপন্ন বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মুশরেক এবং নাস্তিকদেরকেও দেখা যায় বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্ পাককে ডাকতে তারা যাঁকে অবিশ্বাস করে, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে অথচ বিপদ মুহূর্তে তাকেই ডাকতে তারা বাধ্য হয়।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

এরপর যখন আল্লাহ পাক তোমাকের বিপদ দূর করে দেন তখন তোমাদেরই একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শেরক করে। কিন্তু কি আশ্চর্য আর কি লজ্জাকর ব্যাপার যে, যাঁর হাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, বিপদ মুক্তির জন্যে যার নিকট মানুষ আকুল আবেদন জানায় সেই করুণাময় আল্লাহ পাক যখন দয়া করে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখন অকৃতজ্ঞ মানুষ মহান আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যদি আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে মনে করা হয় অর্থাৎ মোমেন ও কাফের উভয়কে সম্বোধন করা হয় তবে منكم-এর তাৎপর্য হবে কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে। আর যদি মনে করা হয় যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই, কাফেরদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে, আর কিছু লোক বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।[১]

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ
لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ
أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫৫) আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্যেই তাদের এ শেরক। অতএব, ভোগ করে লও, অচিরেই জানতে পারবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০১

(৫৬) আর যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, তাদের জন্যে আমার দেয়া রিয্ক থেকে অংশ নির্দিষ্ট করে থাকে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের এ মিথ্যা রচনার জন্যে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদেহী করতে হবে।

(৫৭) তারা আল্লাহ্ পাকের জন্যে কন্যা সন্তান স্থির করে অথচ আল্লাহ্ পাক পবিত্র, মহিমান্বিত, আর তারা নিজেদের জন্যে তাই স্থির করে যা তাদের মন চায়।

(৫৮) তাদের কোন লোককে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন সারা দিন তার মুখ খানি কালো হয়ে থাকে এবং সে অসহনীয় মনঃ কষ্টে ক্লিষ্ট হয়।

(৫৯) তাকে যে সংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানির কারণে সে সকল লোক থেকে আত্মগোপন করে চলে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে প্রোথিত করে ফেলবে? সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট!

(৬০) যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের দৃষ্টান্ত খুবই মন্দ, আর আল্লাহ্ পাকের মহিমা সবার উপরে। তিনি সর্ব শক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

আলোচ্য আয়াতে মানুষের অকৃতজ্ঞতা, নেমকহারী এবং না-শোকরীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন বিনীত হয়ে আল্লাহ্ পাককে ডাকে, বিপদ দূরীভূত করার জন্যে কাতর অবস্থায় কাঁদতে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক তার বিপদ দূর করে দেন তখনই সে আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক আরম্ভ করে। অসুস্থ মানুষ চরম ব্যথা-বেদনায় কাতর হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে রোগ মুক্তির জন্য ফরিয়াদ করতে থাকে, যখন আল্লাহ্ পাক দয়া করে তাকে আরোগ্য দান করেন তখন সে বলে, চিকিৎসক ছিল বড়, ঔষধ ছিল ভাল, এজন্যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, মক্কার মুশরেকদের এ অবস্থাই ছিল, সামুদ্রিক সফরে যখন তারা ঝড়ের সম্মুখীন হতো এবং তাদের তরী নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিত তখন তারা তাদের দেব-দেবী, মূর্তি, ধর্মযাজক এক কথায় সকলকেই ভুলে যেত। যখন আল্লাহ্ পাক দয়া করে তাদেরকে রক্ষা করতেন তখন তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত, দেব-দেবীর পূজা আরম্ভ করত। একটু পূর্বে অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত অবস্থায় যারা সকাতরে, অন্তর থেকে আল্লাহ্ পাককে ডেকেছিল এবং তাঁর দয়ায় তাদের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল, তারাই তখন নির্লজ্জ এবং অকৃতজ্ঞ হয়ে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে ভুলে যায়, তাঁর দয়াকে অস্বীকার করে বসে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত বা অসুস্থ হয় তখন বিপদ বা রোগ দূরীভূত করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৩৮

ফরিয়াদ করতে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক তাকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তার চেহারা পাল্টে যায়। এ অবস্থা অধিকাংশ লোকেরই, তিনি লিখেছেন, যখন আমি এ আয়াতের তফসীরে লিখছিলাম তখন ছিল ৬০২ হিজরীর মহররমের ১লা তারিখ। ঐ দিন অতি প্রত্যুষে আমাদের শহরে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়, আমি লোকদেরকে দেখেছি– অত্যন্ত অসহায় হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিপদ-মুক্তির জন্যে অত্যন্ত কাতর হয়ে দোয়া করছিল। কিন্তু যখন ভূমিকম্প থেমে গেল, সুসময় ফিরে এল তখন মানুষ ভুমিকম্পের কথা ভুলে গেল, আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে তাঁর নাফরমানী শুরু করে দিল। আলোচ্য আয়াতের আল্লাহ্ পাক মানব-চরিত্রের এ অবস্থাই বর্ণনা করেছেন।[১]

পরবর্তী বাক্যে এ নাফরমানীর শোচনীয় পরিণাম ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۝

যত ইচ্ছা ভোগ করে লও, মনের স্বাদ মিটিয়ে লও, অদূর ভবিষ্যতে এর পরিণাম দেখতে পাবে এবং এর মজা টের পাবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির তফসীরে লিখেছেনঃ فتمتعوا শব্দটির তাৎপর্য হল, নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করে লও। فسوف

অচিরেই অর্থাৎ মৃত্যুর পরই এর পরিণাম দেখতে পাবে কত কঠোর এবং কঠিন শাস্তি এ নাফরমানীর পরিণামে তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে, তা তখনই তোমরা টের পাবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ط

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রথমতঃ তৌহিদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাফের মুশরেকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কাফেররা মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের জীব-জন্তু, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাষাবাদ প্রভৃতিতে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর নামে মানত করে, কেননা তারা যে সব দেব-দেবীর পূজা করত এবং আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করত, তাদের নামেই মানত করত। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হল যে দেব-দেবীর নামে তারা মানত মানে তারা কিছুই জানে না কেননা, এগুলো হল প্রস্তর নির্মিত জড় পদার্থ। আল্লাহ্ প্রদত্ত

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৫২

রিয্কের মধ্যে কাফের মুশরেকরা ঐ জড় পদার্থগুলোরই অংশ নির্দিষ্ট করত। মুশরেকরা বলতঃ

هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا

এ অংশ আল্লাহর জন্যে তাদের ধারণা মোতাবেক, আর এটি আমাদের শরীকদের জন্যে।[১]

تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ۝

আল্লাহর শপথ! তোমাদের এ মিথ্যা রচনার জন্যে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদেহী করতে হবে, অর্থাৎ দেব-দেবীকে তোমরা যে নিজেদের উপাস্য বলে গ্রহণ করছো– এ বিষয়ে কাল কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত উপজীবিকায় তাঁর দেয়া ধন-সম্পদে কেন অন্যকে শরীক করেছিল তথা কেন তাদের নামে মানত মেনেছিল তা কেয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ۝

"আর তারা আল্লাহ্ পাকের জন্য কন্যা সন্তান স্থির করে, অথচ তিনি পবিত্র, আর নিজের জন্যে তারা তাই স্থির করে যা তাদের মন চায়"।

কাফের মুশরেকরা একটি জঘন্য মিথ্যা কথা বলত যে, ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান। বিশেষতঃ বনু খাজাআ গোত্রের লোকেরা এ মিথ্যা কথাটি রচনা করত। অথচ আল্লাহ্ পাকের শান, তাঁর মহিমা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গ্রহণের অনেক উর্দ্ধে। পিতা-পুত্র সকলের স্রষ্টাই তিনি। এমন কথা আল্লাহ্ পাকের শানের বরখেলাফ। এসব কথা নিতান্ত মূর্খতা প্রসূত। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এ মূর্খতাপূর্ণ কথার কোন জবাব দান করেননি; বরং سُبْحٰنَهٗ শব্দ দ্বারা নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক পিতা-পুত্র কন্যার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এমন সম্পর্ক থেকে অনেক উর্দ্ধে। অথবা سُبْحٰنَهٗ শব্দটি বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, খাজাআ গোত্রের মত কেনানা গোত্রও ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাত। যেহেতু ফেরেশতাদেরকে দেখা যায় না আর নারীরাও থাকে পর্দার অন্তরালে, তাই তাদেরকেও মূর্খ লোকেরা আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করেছে।[২] (নাউযুবিল্লাহ--)

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ۝

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৪৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০২

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখখানি সারা দিন কালো হয়ে থাকে, সে মনে মনে দগ্ধ হতে থাকে, অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্যে কন্যা সন্তান পছন্দ করত না। কন্যা সন্তানের খবরে তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত। লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে তাদের অবস্থা হত অত্যন্ত অসহায়, মন তাদের হতো আহত, আর ঐ কন্যা সন্তানকেই তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের জন্যে স্থির করতো অথচ তাদের অবস্থা এই-

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط

কন্যা সন্তানের জন্মের খবর অপ্রিয় হওয়ার কারণে সে সকলের নিকট থেকে আত্মগোপন করে থাকে, কাউকে তার কালো মুখ খানি দেখাতে চায় না। তখন সে দারুণভাবে চিন্তিত হয়, কন্যা সন্তানের জন্মকে সে নিজের জন্যে একটা আপদ বলে মনে করে।

اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط

কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করার কু-প্রথা

সে চিন্তা করে যে, লজ্জা স্বীকার করেও নবজাতক শিশুকে জীবিত থাকতে দেবে, অথবা মাটিকে প্রোথিত করে ফেলবে তথা জীবন্ত কবর দেবে? একথা সর্বজন বিদিত যে, প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের অনেক পাষণ্ড হৃদয়ের মানুষ তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত, অথবা জীবন্ত কবর দিত। কন্যা সন্তানের পিতা তার কন্যাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত এবং অপমানিত অবস্থায় বেঁচে থাকার সুযোগ দিত। সাধারণতঃ বর্বরতার যুগে আরবরা কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জাকর ব্যাপার বলে মনে করত, কন্যা সন্তান লুটতরাজ করে এক পয়সাও এনে দিতে পারবে না অথচ সে শুধু খাবে, তাই তারা কন্যাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। ইসলাম এ অমানবিক প্রথার অবসান ঘটায়, পৌত্তলিকদের এ অন্যায় আচরণ বন্ধ করা হয়, ফলে ইসলামের আবির্ভাবের পর আর কোন কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়নি।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আল্লামা বগভী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, বিশেষতঃ মোজের, বনী খাজাআ এবং বনী তামীম গোত্রের লোকেরা কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করত। তারা কন্যার পিতা হওয়াকে নিতান্ত অপমান জনক মনে করত। তাদের মধ্যে এ পাশবিক প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যাকে ছয় বছর পর্যন্ত লালন পালন করত। যখন ছয় বছর পূর্ণ হত তখন কন্যার মাকে বলা হত তাকে সাজিয়ে দাও। এরপর পাষণ্ড পিতা কন্যাটিকে জঙ্গলে নিয়ে যেত যেখানে পূর্ব থেকেই একটি গভীর গর্ত খুঁড়ে রেখে দিত এবং কন্যাকে ঐ গর্তের নিকট দাঁড় করিয়ে বলত, দেখতো এর ভেতর কি রয়েছে? যখন সে নিচের দিকে দেখত তখন ঐ দুবৃত্ত পিতা তাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিত

এবং এর উপর মাটি চাপা দিয়ে তাকে শেষ করে দিত। এজন্যে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ۞ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যাদের জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে তাদেরকে কাল কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে"। অথচ তাদের কোন অপরাধ ছিল না, তাই অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।[১] যারা অভাবের ভয়ে কন্যাদেরকে হত্যা করত, তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

(সূরা আনআম)

"তোমরা অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরকে রিয্ক দেই এবং তাদেরকেও"।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে তার রিয্কের ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধান করেছেন এবং অভাবের আশঙ্কায় সন্তানদেরকে হত্যা না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, বর্বরতার যুগে আরবরা কন্যা সন্তানকে দু' কারণে হত্যা করতো ১. লজ্জার কারণে, অর্থাৎ কন্যার পিতার হওয়াকে সে যুগে লজ্জাকর বিষয় মনে করা হত। ২. অভাবের আশঙ্কায়ও তারা এ অন্যায় কাজ করতো। এজন্যে তারা কখনও গর্ত খুঁড়ে তাতে কন্যাকে ফেলে দিত তথা জীবন্ত সমাধিস্থ করতো। কখনও পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে তাকে নিক্ষেপ করতো, কখনও সমুদ্রে নিমজ্জিত করে তাকে শেষ করে দিত আর কখনও তাকে জবেহ্ করতো।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, বর্বরতার যুগে অভাবের আশঙ্কায় যেভাবে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো বর্তমান যুগে এই একই কারণে এবং একই উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন চলছে। কেননা এ আন্দোলনের পেছনেও অভাবের আশঙ্কাই কার্যকর রয়েছে।[২]

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ۞

(সতর্ক হও, তারা অত্যন্ত মন্দ সিদ্ধান্ত করে।)

আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে পুত্র কন্যার সম্পর্কের কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ, এর শাস্তি অবধারিত।

১। তফসীরে মাজহারী-খন্ড-৬; পৃষ্ঠা-৪০৩
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫৯

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

যে দূরাত্মা কাফেররা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত মন্দ, তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। লজ্জা এবং দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা তাদেরই জঘন্য কাজ। সুখে দুঃখে এবং বার্ধক্যে তারাই সন্তান-সন্ততির সাহায্যের মোহতাজ হয়। তারা যে অন্যায় অবিচার করে তার কঠিন শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ط

আর আল্লাহ্ পাকের শান সর্বোচ্চ। কারো নিকট তাঁর কোন ঠেকা নেই, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই। সকল গুণ তাঁরই। সব কিছুর জ্ঞান, সর্বময় ক্ষমতা শুধু তাঁরই, তিনি যাবতীয় গুণে গুণান্বিত, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ مَثَلُ السَّوْءِ বা মন্দ দৃষ্টান্ত হল দোযখ আর مَثَلُ الْأَعْلَىٰ উচ্চ দৃষ্টান্ত হল কালেমায়ে তায়্যেবার সাক্ষ্য প্রদান।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

তিনি পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়, তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের কোন সীমা নেই, তিনি অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, তিনি ইচ্ছা করলেই কাফেরদের কঠোর শাস্তি দিতে পারেন, তাঁর ইচ্ছাকে বাধা দেয়ার মত কেউ নেই। তিনি তৎক্ষণাত কোন অপরাধীকে শাস্তি দেন না, বরং অপরাধীকে অবকাশ দিয়ে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দান করেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৩

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ
دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا
يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ
وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ
النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلٰٓى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

তরজমা

(৬১) আল্লাহ্ পাক যদি মানুষকে তাদের জুলুমের জন্যে শাস্তি দিতেন তবে পৃথিবীতে কোন জীব-জন্তুকে রেহাই দিতেন না, কিন্তু এক নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাদের সে নিদৃষ্ট সময় আসে তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব অথবা ত্বরান্বিত করতে পারেনা।

(৬২) তারা নিজের জন্যে যা পছন্দ করেনা আল্লাহ্ পাকের জন্যে তাই স্থির করে এবং তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে বলে তাদের রসনা মিথ্যা বলে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিশ্চয় তাদের জন্যে রয়েছে অগ্নি এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।

(৬৩) আল্লাহর শপথ! (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও আমি বিভিন্ন জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি। কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপকে তাদের চোখে সুন্দর করে দেখিয়েছে এবং আজ সে তাদের বন্ধু, আর তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৬৪) (হে রসূল!) আমি তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে, আর মোমেনগণ যেন হেদায়েত এবং রহমত লাভ করে।

(৬৫) আর আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, ধরাকে মরণের পর ঐ পানি দ্বারা তিনি জীবন দান করেন, নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা কথা শ্রবণ করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের অন্যায় অনাচারের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে তাদের নাফরমানী ও অন্যায় অনাচারের জন্যে তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাঁর দয়া মায়া এবং করুণার কারণেই তিনি অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদেরকে পাকড়াও করেন না।

পাকড়াও করার অর্থ শাস্তি দেয়া আর আলোচ্য আয়াতের الناس শব্দটির দ্বারা কাফের মুশরেক এবং পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, ظلم শব্দটি এ ব্যাখ্যারই ইঙ্গিত বহ। ظلم শব্দ দ্বারা কুফর, শেরক, নাস্তিকতা, মুনাফেকী এক কথায় যাবতীয় পাপাচারকে বোঝানো হয়েছে।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ

আয়াতের মর্মকথা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর অনন্ত অসীম দয়ামায়া এবং করুণার উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বন্দাদের কুফর শেরক ও যাবতীয় নাফরমানী দেখেন, কিন্তু তবু তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন যেন তারা আত্ম সংশোধনের সুযোগ পায়। এটি বন্দাদের প্রতি আল্লাহর পাকের নিতান্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ

(যদি আল্লাহ্ পাক মানুষের অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তি বিধান করেন, তবে পৃথিবীকে কোন প্রাণীও থাকবে না।) পৃথিবী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাণ হয়ে যাবে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা, মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেই সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ব্যবহৃত হচ্ছে, যদি মানুষের পাপাচারের কারণে তাদের শাস্তি বিধান করা হয় তবে মানুষ তো ধ্বংস হবেই, তার পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টিও শেষ হয়ে যাবে, জীব-জন্তু হোক বা বৃক্ষ-তরুলতা হোক। তাছাড়া যদি মানুষই না থাকে তবে অন্য কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না। কেননা, মানুষ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে আল্লাহ পাক মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। যদি মানুষের পাপাচারের পরিণামে প্রলয়ংকারী ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আযাব আপতিত হয়, তখন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জীব-জন্তুও ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত আবু হোরায়রা

(রাঃ) শুনেছিলেন যে এক ব্যক্তি বলছিল, যদি কোন ব্যক্তি কারো প্রতি জুলুম করে, তবে সে জালেম তার নিজেরই ক্ষতি করে, তখন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, না তা নয়, বরং ঐ ব্যক্তির জুলুমের কারণে পাখীরাও তাদের নীড়ে ধ্বংস হয়।[১]

মানুষের অন্যায় অনাচারের কারণে যখন আল্লাহ পাকের আযাব স্বরূপ বন্যা বা অনাবৃষ্টি আসে, তখন জীব-জন্তুরাও সে আযাবের কবল থেকে রক্ষা পায় না। যখন কোন ব্যক্তি বা সমাজ অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ পাকের শান, উচ্চতম মর্যাদা এবং সর্বময় ক্ষমতা একথার দাবীদার হয় যে, অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করা হোক। কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া, তাঁর করুণা ও তাঁর উদারতার কারণে অপরাধীদেরকে তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন, অপরাধীকে তৎক্ষণাত দণ্ড প্রদান করেন না, বরং তাকে একটা নিদিষ্ট কাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে তখন আর তার শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয় না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব নাযিল করার ইচ্ছা করেন তখন সকলেই ঐ আযাবের কবলে পড়ে, কিন্তু কেয়ামতের দিন পাপীষ্ঠ এবং নিঃষ্পাপকে তাদের নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে।

আযাবকে ভয় কর

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"আর তোমরা সে বিপদকে ভয় কর যা শুধু তাদের উপরই নিপতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে, বরং অপরাধীদের পাশাপাশি অন্যরাও সে বিপদের কবলে পড়বে"।

যখন কোন সমাজে পাপাচার প্রসার লাভ করে তখন তাদের উপর সামগ্রিকভাবে আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হয়, জালেম তার জুলুমের কারণে ধ্বংস হয়, আর যে জালেম নয় সে তার পাশে থাকার কারণে শাস্তির কবলে পড়ে। অবশ্য কেয়ামতের দিন ভাল এবং মন্দের মাঝে পার্থক্য করা হবে। এজন্যেই কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে–

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

(সূরা ইয়াসীন)

(হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও) অর্থাৎ দুনিয়াতে যেভাবে ভাল-মন্দ নেককার, বদকার একসঙ্গে থাকে এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে আযাব আপতিত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৪০
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৪

হলে নেককার বদকার সবই ধ্বংস হয়, কিন্তু কেয়ামতের দিন এ অবস্থা থাকবে না, সেদিন পাপীষ্ঠ লোকদেরকে নেককার লোকদের থেকে পৃথক করে রাখা হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের دَآبَّةٍ শব্দটি দ্বারা পাপীষ্ঠদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এরূপ- "যদি আল্লাহ পাক মানুষকে তার জুলুম অত্যাচারের কারণে ধর-পাকড় করতেন, তবে ধরা-পৃষ্ঠে কোন পাপীষ্ঠকে রাখতেন না। তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, دَآبَّةٍ শব্দের ব্যাখ্যা হল প্রাণী। অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাক মানুষকে তাদের অপরাধের কারণে তৎক্ষণাত পাকড়াও করতেন, তবে পৃথিবীতে কোন প্রাণী রাখতেন না।

وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

কিন্তু তিনি তাদের ধর-পাকড়ের ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিলম্ব করেন।

فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ۝

এরপর যখন ঐ নির্দিষ্ট কাল এসে যায়, তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে পারে না এবং এক মুহূর্তে পূর্বেও আসতে পারে না। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষ যেভাবে অন্যায় অনাচার এবং পাপ-পংকিলতায় লিপ্ত রয়েছে, যদি আল্লাহ পাক তাদের অন্যায় অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতেন তবে এ পৃথিবীতে একটি প্রাণীও থাকত না। কিন্তু করুণাময় আল্লা হ পাক কাউকে অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না, তাই খোদাদ্রোহী কাফের-মুশরেক নাস্তিক এবং জুলুম অত্যাচারে লিপ্ত জালেমরা একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে বরং তাদের জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সে সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পাকড়াও করা হয়ে থাকে। মক্কার কাফেরদের অন্যায় অনাচার অব্যাহত ছিল সুদীর্ঘ চৌদ্দটি বছর যাবত, দ্বিতীয় হিজরীর মাহে রমজানের ১৭ তারিখ বদরের ঐতিহাসিক রণাঙ্গণে তাদের শাস্তি বিধান করা হয়। আবু জেহেল গয়রহদের এখানেই নিপাত করা হয়। পঞ্চম হিজরীতে আরবের সমস্ত কাফের শক্তি যুক্তফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করে তাদের ফিরে যেতে হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে তারা মুসলমানদের সঙ্গে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করতে বাধ্য হয়। আর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সকল অন্যায়-অনাচারের অবসান ঘটে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। এরপর সারা আরববাসী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিল। দূরে কেন যাবো, এ যুগেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবকাশ প্রদানের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৭ সালে

বলশেভিকরা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম করে। অনেক মুসলিম দেশ তারা দখল করে নেয়। মানুষের স্বাধীনতা তারা হরণ করে, মসজিদ মাদ্রাসাগুলো বিরাণ করে দেয়। কোটি কোটি মানুষকে সমাজতন্ত্রের জোয়ালে বেঁধে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত করে। এ জুলুম অত্যাচার চলতে থাকে সুদীর্ঘ ৭০ বছর যাবত। ১৯৯১ সালে জালেমদের জুলুমের অবসান ঘটে। তাদের ধ্বংস করার জন্যে পৃথিবীতে কোন দাবীদার নেই। তাই এ সত্য বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ পাকই জালেমদেরকে শেষ করে দিয়েছেন।

পারমানবিক মারণাস্ত্রগুলো তাদের কোন কাজে আসেনি। এমনিভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের এ নাস্তিকরা আফগানিস্তানের উপর চড়াও হয়েছিল, সুদীর্ঘ তের বছর জেহাদের পর ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে আল্লাহ্ পাক মুজাহেদ্বীনদেরকে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছেন। কেননা, তাদের জন্যে নিদৃষ্ট সময় তখনই শেষ হয়েছিল আর এভাবে আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে যুগে যুগে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যখন কোন সমাজের প্রতি আযাব আপতিত হয় তখন নেককার মোমেনগণ কিভাবে আত্মরক্ষা করবেন?

আত্মরক্ষা করার পন্থা

এর পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে তা হল মোমেনের কর্তব্য শুধু অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা নয়, বরং অন্যদেরকেও আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করা। ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করা। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত, যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে ডাকবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, অবশেষে তারাই হবে সফলকাম"।

এ পর্যায়ে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন অন্যায় দেখবে, তখন সেই অন্যায়কে শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া কর্তব্য হবে, যদি এতে সে ব্যক্তি সক্ষম না হয়, তবে রসনা দ্বারা বাধা দেবে, যদি তারও শক্তি না থাকে তবে অন্তরে মন্দ জানবে"।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও একখানি হাদীসে অত্যন্ত তাগিদ সহকারে এরশাদ করেছেনঃ সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিতে থাক এবং (মানুষকে) মন্দ কাজ থেকে

বিরত রাখতে সচেষ্ট থাক) এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তোমরা হবে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত, তাঁর শাস্তি হবে তোমাদের জন্যে অবধারিত আর এমন সময় তোমরা দোয়া করলে তা কবুল হবে না।

অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ এমন সময় উপস্থিত হবার পূর্বে যখন দোয়া করলে তা কবুল হবে না, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিতে থাক, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হও।

আরও একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কতিপয় দুষ্কৃতকারীর অন্যায় অসৎ কাজের জন্যে আল্লাহ পাক সামগ্রিকভাবে আযাব নাযিল করেন না।

কিন্তু মানুষের সম্মুখে অন্যায় কাজ হয়ে থাকলে মানুষ তা রুখে দাড়াবার শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি রুখে না দাড়ায় তবে সকলের প্রতিই আল্লাহর আযাব আপতিত হয়।

মূলতঃ এ কারণেই এ যুগে প্রলংকারী ঝড়, তুফান, বন্যা, ভূমিকম্প, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, দুঘটনা সহ বহু প্রাকৃতির দুর্যোগ অহরহ এসে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বহু নতুন নতুন রোগও দেয়া দেয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যদি নেককার লোকেরা ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ পরিত্যাগ করে তবে পাপাচারের প্রতি রাজি হওয়ার কারণে অথবা অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার দরুণ তারাও আযাবের কবলে পড়তে পারে।

এবনে মাজা শরীফ এবং তিরমিজী শরীফে হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ লোকেরা যখন কোন মন্দ কাজ দেখে তখন তাকে পরিবর্তন না করে (পরিবর্তন করার চেষ্টা না করে) এমন অবস্থায় হতে পারে যে, আল্লাহ পাকের আযাব সকলের উপর আপতিত হয়।

হযরত জরীর এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের হাদীস আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতের মর্ম হযরত নূহ (আঃ)-এর জমানায় বাস্তবায়িত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীতে যে সব প্রাণী আরোহন করেছিল তারা আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আর এতদ্ব্যতীত সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এবনে আবি শায়বা, আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, মানুষের গুনাহর কারণে জা'আল নামক একটি কীট পর্যন্ত তার গর্তে আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হয়।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, যদি কাফেরদের পূর্ব পুরুষদের নাফরমানীর পরিণাম স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি

প্রদান করতেন তবে ধরা-পৃষ্ঠে তাদের কোন বংশ অবশিষ্ট থাকতো না। এজন্যেই হযরত নূহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সে পর্যন্ত বদদোয়া করেননি, যে পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে অবগত না হয়েছেন যে, এ কাফেরদের বংশধররাও কাফেরই হবে।[১]

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ

"তারা নিজেদের জন্যে যা পছন্দ করেনা, আল্লাহ্ পাকের জন্যে তাই স্থির করে।"

মুশরেকরা কন্যা সন্তানকে নিজেদের জন্যে পছন্দ করেনা। কন্যা সন্তানের জন্মের খবরে তারা লজ্জিত ও দুঃখিত হয়, অথচ আল্লাহ্ পাকের জন্যে তাই স্থির করে এবং বলে যে আল্লাহর কন্যা সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ--)।

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰىط

"আর তাদের রসনা মিথ্যা বলে থাকে যে তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ"।

আল্লাহ্ পাকের শানে বেয়াদবীপূর্ণ মন্তব্য করা সত্ত্বেও তারা এ মিথ্যা কথা বলে থাকে যে আখেরাত যদি হয় তবে তাতেও রয়েছে তাদের জন্যে কল্যাণ। তাদের কুফরী, নাফরমানী, দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতা সত্ত্বেও এহেন মিথ্যা কথার কারণে তাদের পাপের বোঝা-ই ভারী হয়। পরবর্তী বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ۝

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্যে রয়েছে অগ্নি আর তারা তা বৃদ্ধি করেই চলেছে"।

যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত রসূলের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ্ পাকের শানে ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে এরপরও আখেরাতে জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখে, তারা নিশ্চয় বোকার স্বর্গে বাস করে। নিঃসন্দেহে তাদের পরিণাম ভয়াবহ হবে, দোযখের কঠিন শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত।

আলোচ্য আয়াতের مَا يَكْرَهُوْنَ (তারা যা অপছন্দ করে) শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তারা যা পছন্দ করে না। যেমন তারা নিজেদের জন্যে কন্যা সন্তান পছন্দ করে না, অথচ এ দুবৃত্তরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের জন্যে তা স্থির করে। এমনিভাবে, তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে কেউ শরীক হোক এটা তারা পছন্দ করেনা, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের সাথে হীন তুচ্ছ বস্তুকে তারা শরীক করে। তদুপরি কাফেররা একথাও বলত যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মোতাবেক যদি কেয়ামত হয় তবে আমরাও পাব জান্নাত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৪-০৫

তাদের এ মিথ্যা কথার প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতে لا جرم শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থাৎ- নিশ্চয় এবং অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি।

وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ

আরবী ভাষায় বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'কামুসে' এর অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'দোযখে ছেড়ে দেয়া হয়েছে',-অর্থাৎ তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করার পর তাদের কথা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অথবা এর অর্থ হল সর্ব প্রথম তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর তরজমা করেছেনঃ তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করে তাদের কথা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এর তরজমা করেছেনঃ তাদেরকে দোযখে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর কাতাদা (রঃ) এর তরজমা করেছেন, তাদেরকে অনতিবিলম্বে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আর ফররা (রঃ) বলেছেনঃ তাদেরকে সবার আগে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সায়ীদ এবনে যোবায়ের বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেনঃ এর অর্থ হল তাদেরকে রহমত এবং নাজাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا فرطكم

আমি তোমাদের মধ্যে অগ্রগামী হবো অর্থাৎ হাউজে কাউসারে সকলের আগে আমি পৌঁছবো। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য বাক্যে যে কাফেরদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা দোযখে অগ্রগামী দল হবে, অন্যরা তাদের পরে যাবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে দ্রুত অগ্রসর হয়ে লোকদেরকে পানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতএব, مفرطون অর্থ হল তারাই যেন অন্যদেরকে দোযখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।[২]

মক্কার কাফের নেতাদের সম্পর্কে বাক্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তারাই মানুষকে দোযখের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কেননা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। যেভাবে দুনিয়াতে কুফরী ও নাফরমানীর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৬
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-২২৬
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২০; পৃষ্ঠা-৬১
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬০

কাজে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে ঠিক তেমনি কেয়ামতের দিন তারাই হবে দোযখের অগ্রগামী দল। আর যেভাবে সাধারণ কাফেররা তাদের অনুসরণ করে কুফরী ও নাফরমানীতে শরীক হয়েছে, এমনিভাবে কেয়ামতের দিন তারা দোযখে যাওয়ার ব্যাপারেও এ নেতাদের অনুসরণ করবে।

মুজাহেদ (রঃ), এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং এবনে আবি হিনদ (রঃ) مفرطون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

متركون فى النار منسيون فيها

অর্থাৎ তাদেরকে দোযখে ফেলে দেয়া হবে এবং চিরদিন তাদের কথা ভুলে যাওয়া হবে।[১]

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ

আল্লাহর শপথ! (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও আমি বিভিন্ন জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি। শয়তান তখন তাদের কার্যকলাপকে তাদের চোখে সুন্দর করে দেখিয়েছে, আর আজ সে-ই তাদের বন্ধু। যারা পাপাচারের আবর্তে নিপতিত হয়, তারা আল্লাহ পাকের আযাবে নিষ্পেষিত হবে– এটিই স্বাভাবিক। অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না, তাদের অপকর্মের শোচনীয় পরিণতি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। ইতোপূর্বে যারা ছিল জালেম, সীমালঙ্ঘনকারী, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতাকারী, আল্লাহর নবীগণের সঙ্গে শত্রুতাকারী, তাদের যে পরিণতি হয়েছে এ যুগের কাফের মুশরেকদেরও অনুরূপ পরিণতিই হবে। পূর্বকালের দূরাত্মারা যেভাবে শয়তানের বন্ধু ছিল এবং তার অনুসরণ করেছিল, ঠিক তেমনি এ যুগের দুবৃত্তরাও আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের শত্রু এবং শয়তানের বন্ধু। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের মূর্খতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূর্খতা-প্রসূত এসব কথায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্ট হত এজন্যে আলোচ্য আয়াত সমূহে তাকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

(হে রসূল!) আপনার পূর্বেও আমি বিভিন্ন জাতির নিকট যুগে যুগে বহু রসূল প্রেরণ করেছি, কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান কাফের মুশরেকদের সম্মুখে তাদের অন্যায়-অনাচারকে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুসজ্জিত করে দেখিয়ে দেয়। শয়তান তাদের বন্ধু হয় ফলে তারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকে, পরিণামে তারা আল্লাহর আযাবে গ্রেপ্তার হয়। রসূলের কথা মানে না, তাই এদের জন্যেও রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি।

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৭৩

কেয়ামতের দিন শয়তানই হবে তাদের একমাত্র বন্ধু, আর শয়তান সেদিন কারো সাহায্য করতে সক্ষম হবে না, বরং সে দোযখে যাবে এবং তার দুনিয়ার অনুসারীরাও কেয়ামতের দিন তার অনুসরণ করে দোযখে যাবে। যেহেতু তারা শয়তানের অনুসারী হয়েছে এবং নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করেছে, তাই (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের ব্যাপারে চিন্তিত ও ব্যথিত হবেন না।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায় আচরণ এবং আল্লাহ পাকের সাথে শেরক ও তাঁর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করা নতুন কিছু নয়, ইতোপূর্বে বিভিন্ন যুগে যে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন তাদের সাথেও কাফের মুশরেকরা এমনি দুর্ব্যবহার করেছে। যেভাবে ইতোপূর্বে কাফেররা ছিল শয়তানের বন্ধু এবং অনুসারী, ঠিক এমনিভাবে (হে রসূল!) আপনার যুগের কাফের মুশরেকরাও শয়তানেরই বন্ধু, মক্কার কাফেররা শয়তানেরই অনুসারী। তাদেরকে শয়তানই মন্দ কাজকে সুন্দর করে দেখায়, ফলে মন্দ, ঘৃণ্য ও হীন কাজকে তারা ভাল কাজ মনে করে এবং মুসলমানদের শত্রুতায় সে তাদের সাহায্যকারী হয়। অথবা وليهم শব্দের সর্বনামটি দ্বারা পূর্বকালের জাতিগুলোর প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ শয়তান ইতোপূর্বে মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ঠ করত, ঠিক এমনিভাবে এ যুগের কাফেরদেরকেও সে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকতে প্ররোচনা দেয়।

অথবা اليوم। শব্দ দ্বারা কেয়ামতের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ভবিষ্যতে যা ঘটবে আলোচ্য আয়াতে তারই বিবরণ রয়েছে। এমন অবস্থায় অর্থ হবেঃ কেয়ামতের দিন শয়তানই শুধু তাদের বন্ধু হবে আর একথা সুস্পষ্ট যে, শয়তান কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবেনা। অতএব, তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।[২]

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

"(হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এই কিতাব (কোরআনে করীম) এজন্যে নাযিল করেছি যেন আপনি তাদের জন্যে সে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তারা মতবিরোধ করছে"। অর্থাৎ তৌহিদ, রেসালত, আখেরাত, হালাল হারাম প্রভৃতি বিষয়ে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যেন আপনি মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরসন

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৬

করেন। এ উদ্দেশ্যেই আপনার নিকট কোরআন নাযিল করা হয়েছে। আর বিশেষতঃ মোমেনদের জন্যে রয়েছে এতে হেদায়েত এবং রহমত।

বস্তুতঃ নবী রসূলগণের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান করা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। আর এ আহবানে সাড়া দেয়া হল মানুষের দায়িত্ব। যারা এ দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করে তথা সত্যকে গ্রহণ করে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, দুনিয়া আখেরাত দোজাহানে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

পক্ষান্তরে, যারা এ দায়িত্ব পালন না করে, তাদের পরিণাম হয় শোচনীয়। অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط

কাফের মুশরেকরা তৌহিদে বিশ্বাস করতে রাজী হতো না, তাই এ আয়াত থেকে তৌহিদের কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু তৌহিদের প্রমাণই নয়, বরং একদিকে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের বিবরণও রয়েছে অন্যদিকে এতে রয়েছে হেদায়েতের দলিল এবং আল্লাহর রহমতের কথা। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাকই আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন, ধরার মৃত্যুর পর তাকে পানি দ্বারা জীবন দান করেছেন। নিশ্চয় এতে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে।

যখন খরায় ধরা-পৃষ্ঠ শুকিয়ে যায়, মানুষ পানির জন্যে হাহাকার আর্তনাদ করতে থাকে তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি আছে যে, মানব জাতিকে পানির এ নেয়ামত দান করতে পারে? আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে আসমান থেকে পানি নাযিল করেন এবং মৃত শুষ্ক জমীনকে জীবন দান করেন আর ঐ পানির মাধ্যমে ধরা-পৃষ্ঠকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন। মৃত শুষ্ক মাটি নবজীবন লাভ করে। যাঁর অনন্ত অসীম কুদরতে বিশ্ব সৃষ্টির চেহারা বদলে যায়, তিনি মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পারেন।

অতএব, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে, একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ۝

নিশ্চয় এতে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে। মৃত শুষ্ক জমীন যখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, আল্লাহ পাকের হুকুমে, মৃত মানুষও পুনঃজীবন লাভ করবে। অতএব, আসমান থেকে বারি বর্ষণে রয়েছে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ
مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَمِنْ
ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ
اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِىْ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا
شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

তরজমা

(৬৬) চতুঃষ্পদ জন্তুর মধ্যেও তোমাদের জন্যে শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। তাদের উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে পান করাই পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ যা পানকারীদেরকে পরিতৃপ্তি দান করে।

(৬৭) আর খেজুর এবং আঙ্গুর থেকে তোমরা নেশা এবং উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক। নিশ্চয় এতে রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে নিদর্শন।

(৬৮) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে।

(৬৯) এরপর সর্ব প্রকার ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর। এরপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনসুরণ কর। তার উপর থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্যে রয়েছে আরোগ্য, যারা চিন্তা করে দেখে তাদের জন্যে অবশ্যই রয়েছে এতে নিদর্শন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ পর্যায়ে অন্যান্য নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط

উষ্ট্র, গাভী, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু দ্বারা আল্লাহ পাক মানুষকে দুগ্ধ সরবরাহ করছেন। এটি মানব জাতির প্রতি তাঁর বিশেষ দান। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, এসব জন্তুর আহার্যগুলো তাদের পেটের মধ্যে একই সঙ্গে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয় অর্থাৎ গোবর, রক্ত এবং দুগ্ধ। গোবর যথা নিয়মে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং রক্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপন গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে। আর দুগ্ধ দোহন করে বের করতে হয়।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ পাক জীব-জন্তুর মাধ্যমে তাঁর কুদরতের মহিমা প্রকাশ করেছেন, তাঁর বন্দাদের জন্যে দুগ্ধের ন্যায় নেয়ামত দান করেছেন। জীব-জন্তুগুলো যে খাদ্যই গ্রহণ করে তার ফল তিন ভাগে বিভক্ত হয়।

আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, গোবর এবং রক্তের মধ্য থেকেই বিশুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ বের হয়ে আসে। এটি একদিকে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের নমুনা এবং তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অন্যদিকে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান। আল্লাহ পাকের কুদরতে হেকমত লক্ষ্য করে এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে মানুষ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। মূলতঃ পরবর্তী আয়াতাংশে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ

نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ۝

"তাদের উদরস্থ গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে পান করাই পরিচ্ছন্ন দুগ্ধ যা পানকারীদেরকে পরিতৃপ্তি দান করে"।

আলোচ্য আয়াতের خالصا শব্দটির তাৎপর্য হল- যে দুগ্ধটি দোহন করে বের করা হয় তাতে রক্ত এবং গোবরের কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না অর্থাৎ রক্তের বর্ণ ও গোবরের গন্ধ। অথচ এ দুটি বস্তুর মধ্য থেকেই বের করা হয় দুগ্ধ। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কোন জীব-জন্তু যখন ঘাস খায় তখন ঐ খাদ্য তার অন্ত্রে পৌঁছে যায়, সেখানে ঐ খাদ্যকে পিষানো হয়। অতঃপর তার নিম্নাংশ গোবর হয়ে যায়, উপরের অংশ রক্ত হয়, আর মধ্যেকার অংশ দুগ্ধে পরিণত হয়। এসব কাজই হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে থাকে। এ হৃদযন্ত্রই রক্তকে শিরায় শিরায় প্রবাহিত করে এবং দুগ্ধকে তার নিদৃষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয় আর গোবরকে তার স্থানেই রেখে দেয়।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেনঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্দেশ্য হল জীব-জন্তুর উদরস্থ খাদ্যের তিন ভাগের মধ্যভাগ দ্বারা দুগ্ধ হয়। আর উপরের ভাগ দ্বারা রক্ত হয় যা মানব দেহের শক্তিতে পরিণত হয়। হৃদযন্ত্র রক্তকে শিরায় শিরায় পৌঁছে দেয়। আর উদরস্থ খাদ্য দ্রব্যের নিম্নাংশ মলে পরিণত হয় যা যথারীতি দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। এসব কিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের লালন-পালনের সুনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এসব বিষয়ের উপর চিন্তা করা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য।[১] বিশেষতঃ দুগ্ধ কিভাবে সৃষ্টি হয়, কোথায় কিভাবে কোন্ পথ ধরে তা বের হয়, সর্বক্ষণ কোন্ কোন্ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এর সম্পর্ক এসব কিছু এক আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কেউ জানে না। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয়ের উপর চিন্তা ও গবেষণা করে তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের কথা স্বীকার না করে কোন গত্যন্তর থাকে না এবং তাঁর নেয়ামত ও রহমতের জন্যে চির কৃতজ্ঞ থাকতেই হবে।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط

"খেজুর এবং আঙ্গুর থেকেও তোমরা নেশা ও উত্তম আহার্য প্রস্তুত করে থাক। যাদের বোধ শক্তি আছে তাদের জন্যে এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে"।

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আসমান থেকে পানি বর্ষিত হওয়া এবং মৃত শুষ্ক জমীন প্রাণবন্ত হওয়া মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত। এমনিভাবে জীব-জন্তুর উদর থেকে সুমিষ্ট পরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ দুগ্ধ বের করে দেয়াও তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে রকমারী সুস্বাদু-ফল-ফলারী উৎপন্ন করেন যা তোমাদের জন্যে হয় উত্তম রিয্ক যেমন খেজুর, আঙ্গুর। খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশা এবং উত্তম উপজীবিকা তৈরী কর।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। তাই এতে শুরার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। আর এ মতই পোষণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রাঃ), হাসান এবং মুজাহেদ (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ। উফী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে,

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৮

আবিসিনিয়বাসীর ভাষায় سكر বলা হয় সিরকাকে। তবে আল্লাহ সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে উত্তম কথা হল আয়াতাংশ-

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا

মানসুখ হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) অন্যত্র লিখেছেন, শুরা পান সম্পর্কীয় আলোচ্য আয়াতাংশ মক্কায় নাযিল হয়েছে। সে যুগে শুরা পান হালাল ছিল। এরপর মদীনা শরীফে প্রথম নাযিল হয়ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

এরপর নাযিল হয়ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

এরপর অবশেষে সূরা মায়েদার আয়াত নাযিল হয়, যাতে শুরা পান সর্বকালের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়।[১]

বস্তুতঃ মানব জীবনের যাবতীয় সুখ-সম্পদ মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান। এমনিভাবে মানুষের হেদায়েতের জন্যে, তার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের জন্যে আল্লাহ পাক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন– তথা নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন সবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান। দুধ-পানি-মধু সহ অগণিত ধরণের খাদ্য দ্রব্য-পানীয় আল্লাহ পাক মানুষকে দান করেছেন, নেশাকর দ্রব্য হিজরতের পর মদীনা শরীফে চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তবে তফসীরকারগণ লিখেছেন, যেহেতু سكر (নেশা দ্রব্য)-এরপর رزقاحسنا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হ'ল উত্তম রিযক বা উৎকৃষ্ট খাদ্য, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে শুরা পান উৎকৃষ্ট নয় বা ভাল নয়।[২]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে سكر শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে ১। নেশাকর দ্রব্য, এমন অবস্থায় এ আয়াতাংশ মানসুখ মনে করা হবে। ২। এর অর্থ খেজুরের রস এমন অবস্থায় মানসুখ মনে করার প্রয়োজন নেই।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা শুরা তৈরী করলে তা হবে হারাম কিন্তু শুষ্ক খেজুর, কিসমিস অথবা এর দ্বারা সরবত বা সিরকা তৈরী করা পান করা হালাল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۝

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪০৯
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৫৪
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩৫

"যে সম্প্রদায়ের বুদ্ধি আছে তাদের জন্যে এতে নিঃসন্দেহে নিদর্শন রয়েছে"। নেশাকর বস্তুর ব্যাপারে আলোচনার পাশাপাশি বুদ্ধি বিবেচনার উল্লেখ এ পর্যায়ে বিশেষ তাৎপর্যবহ। কেননা, মদ্যপায়ীর বুদ্ধি লোপ পায়, বিচার ক্ষমতা বিদায় নেয় অথচ আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমত, তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের জীবন্ত নিদর্শন দেখে তার মাহাত্ম উপলব্ধি করার জন্যে বিচার-বুদ্ধির বড় প্রয়োজন। যারা নেশাগ্রস্ত হয় তারা প্রকৃতিস্থ থাকেনা।

আলোচ্য আয়াত এ সূক্ষ্ম-রহস্যেরই ইঙ্গিতবহ।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ۝

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন ঘর তৈরী কর, পাহাড়ের গায়ে, বৃক্ষে এবং যেখানে লোকে মাচা বেঁধে থাকে"।

এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাক তাঁর আরো একটি নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন আর তা হল মধু। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَوْحٰى

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে আদেশ দিলেন, ঘর তৈরী কর। তাই মৌমাছিরা অত্যন্ত নিপূনভাবে অতি সুন্দর কারুকার্য সহকারে তাদের মৌচাক তৈরী করে, তাদের ঘর বাঁধে, এ ঘর পর্বতের গায়ে, বাড়ী-ঘরে এবং ইমারতের মধ্যেও হয়। তবে ঘর যেখানেই হোক না কেন ঐ ঘর ছয় কোন্ বিশিষ্ট হয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, প্রতিটি কোণের মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা মন্তব্য করেছেন, যদি এ পন্থা অবলম্বন না করা হয় তবে মৌচাক মজবুত হয় না।

বস্তুতঃ মৌমাছির মৌচাক তৈরী করা এবং গৃহ নির্মাণে মৌমাছির নৈপূণ্য লক্ষ্য করলে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ করা ব্যতীত এ ক্ষুদ্র মৌমাছির পক্ষে এমন সুন্দর, আকর্ষণীয় কারুকার্য মন্ডিত গৃহনির্মাণ সম্ভব নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ওহী প্রেরণের অর্থ হল এলহাম হওয়া আর এলহাম হল কারো অন্তরে কোন বিষয়ের ভাব সৃষ্টি হওয়া। একথার তাৎপর্য হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মৌমাছির প্রতি এ নির্দেশ হল যে, তুমি ঘর তৈরী কর। তাই আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমেই মৌমাছি তার মৌচাক তৈরী করল। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শিক্ষা লাভ করার কারণেই এত

সুন্দর, এত মজবুত, সুরক্ষিত, বিজ্ঞানসম্মত গৃহ নির্মাণ করা এ ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে। এ মৌচাকগুলোর মধ্যে মানুষের গৃহের ন্যায় বিভিন্ন কক্ষ এবং দরজার ব্যবস্থা রয়েছে। শিল্প-নৈপুণ্যের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় মৌমাছির গৃহ তথা মৌচাকে।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًاؕ

(এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের স্পষ্ট পথ সমূহে পরিক্রমণ কর। তাদের উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পানীয় দ্রব্য নির্গত হয়ে থাকে, বিভিন্ন পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মানব জাতির জন্যে রয়েছে রোগ মুক্তি।)

আল্লাহ পাক মধু মক্ষিককে প্রত্যাদেশ করেছেন যে পর্বতমালায়, বৃক্ষ সমূহে এবং সুউচ্চ শিখরে যেন মধুচক্র নির্মাণ করে। এরপর এ আদেশও দিয়েছেন যে, তোমরা ফল ফুল থেকে রস আহরণ কর এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত পথ সমূহে পরিভ্রমণ কর। মধু মক্ষিকার উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পানীয় নির্গত হয়ে থাকে যা মানুষের জন্যে হয় মধু।

আল্লাহ পাক মধু মক্ষিকাকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন ঃ (১) মধু চক্র নির্মাণ কর, (২) ফল-ফুল ভক্ষণ করে তা থেকে রস আহরণ কর। (৩) আল্লাহ পাক তাদের জন্য যে পথ নির্দেশ করেছেন সে পথে চল। এ তিনটি কাজের পর মধু মক্ষিকার উদর থেকে নির্গত হয় মানব জাতির জন্য মধু যা শুধু সুপেয় পানীয়ই নয়; বরং এতে রয়েছে মানুষের জন্যে রোগমুক্তি। প্রাচীর কালের চিকিৎসা শ্রাস্ত্র ইউনানী হোক, অথবা আধুনিক কালের এ্যালোপেথিক চিকিৎসা শাস্ত্র হোক সব যুগেই এবং সকল চিকিৎসা ব্যবস্থাতেই মধুর অপরিসীম গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

"তোমার প্রতিপালকের স্পষ্ট পথে পরিক্রমণ কর"

অর্থাৎ যে পথ আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে সহজ করে দিছেন সে পথে চল। অথবা এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে চল। আর আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক পথ চলতে থাক।

বর্ণিত আছে যে, মধু মক্ষিকার একজন রাজা থাকে। সকল মৌমাছি তার অনুগত থাকে। ঐ রাজাকে 'ইয়াসুব' বলা হয়। সে যখন কোথাও গমন করে তখন সকল মধু মক্ষিকা তার অনুসরণ করে থাকে, সে যখন কোথাও যাত্রা বিরতি করে তখন সকল মধু মক্ষিকাও তাই করে।[১]

يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১০

তার উদর থেকে বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পানীয় দ্রব্য নির্গত হয়। কখনো ঐ পানীয়ের বর্ণ লাল হয়, কখনো সাদা আর কখনো সবুজ।

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط

এতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে রোগমুক্তি।

মধুর উপকারীতা

আলোচ্য বাক্যাংশে আল্লাহ্ পাক মধুর উপকারিতা ঘোষণা করেছেন যে, এতে মানুষের রোগের নিরাময় হয় এবং এটি মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের এক বিশেষ নেয়ামত। এ কারণেই বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন কালের ন্যায় এ অত্যাধুনিক যুগের সকল চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও মধুর গুরুত্ব এবং উপকারীতা বিশেষভাবে স্বীকৃত আর তা পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার সত্যতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেক রোগের অব্যর্থ মহৌষধ হল মধু। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ "তোমরা রোগ মুক্তির দু'টি পন্থা অবলম্বন কর, মধু এবং পবিত্র কোরআন"। (এবনে মাজা, হাকেম)

মূলতঃ মধুর মাধ্যমে মানব দেহের অনেক রোগ নিরাময় হয়, আর পবিত্র কোরআনে রয়েছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থা।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মধু হল দেহের রোগের ঔষধ আর পবিত্র কোরআনে রয়েছে মনের রোগের ঔষধ।

আল্লামা বয়জাভী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন রোগের নিরাময়ের জন্যে শুধু মধুই যথেষ্ট। আর কোন কোন রোগের ব্যাপারে অন্য ঔষধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে পান করা উপকারী হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হচ্ছে। এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল যে, আমার ভাই উদরাময় রোগে ভুগছেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাকে মধু পান করাও। সে ব্যক্তিকে মধু পান করান হল (কিন্তু কোন ফলোদয় হল না)। সে ব্যক্তি পুনরায় হাযির হয়ে আরজ করল, হুজুর আমি মধু পান করিয়েছিলাম কিন্তু মধুর কারণে উদরাময় রোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ্ পাক সত্যবাদী, তোমার ভাইয়ের উদর মিথ্যুক। এরপর ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় মধু পান করান হল, তখন সে সুস্থ হয়।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পেটের কোন কোন রোগের জন্যে সঠিক নিয়তে এবং আন্তরিকতা নিয়ে শুধু মধু ব্যবহার করলে আল্লাহ্ পাক আরোগ্য দান করেন। যে রোগই হোক না কেন। আল্লামা সয়ুতি (রঃ)-ও একথা লিখেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ সর্ব প্রকার মধুতে সর্বরোগের নিরাময় হবে– একথা পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে নেই। একেক প্রকার মধুর একেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন্ প্রকার ফল এবং ফলের রস থেকে মধু তৈরী হচ্ছে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি কোন্ মৌসুমের ফল ফুলের রস আহরণ করা হয়েছে তা-ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মধু ব্যতীত এমন কোন ঔষধ নেই যার মধ্যে সর্ব প্রকার ফল ফুলের নির্যাস একত্রিত হয়। প্রত্যেক ঔষধেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অতএব, প্রত্যেক রোগের নিরাময়ের জন্যে মধুর উপকারিতা সর্বজন স্বীকৃত কিন্তু রোগের প্রকারভেদ এবং কোন্ ফল এবং ফুলের রস আহরণ করা হয়েছে তাও বিচার্য বিষয়।

এতদ্ব্যতীত কিভাবে মধু ব্যবহৃত হয়েছে এবং কত পরিমাণ ব্যবহৃত হয়েছে তাও বিচার্য বিষয়। যদি সেবন বিধি এবং মধুর পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তবে মধু দ্বারা রোগ নিরাময় হবে একথা বলা যাবেনা।

দ্বিতীয়তঃ সকল মধুর অবস্থা এক নয়, এতেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মধু পক্ষাঘাতে রোগে বিশেষভাবে উপকারী হয়। কোন কোন মধু মানব দেহের দুর্বলতা দূরীভূত করে। মধুর মাধ্যমে শুধু যে রোগমুক্তি হয় তা নয়; বরং এটি উত্তম খাদ্যও।

বস্তুতঃ মধুর মধ্যে যে উপকারীতা রয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুতে তা নেই।[১]

এবনে জরীর হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আরোগ্য লাভ করতে চায় তবে সে যেন পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত লিপিবদ্ধ করে এবং বৃষ্টির পানি দিযে ধুয়ে নেয় এবং তার স্ত্রীর সম্পদ থেকে তার সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা মধু ক্রয় করে এবং তা পান করে। এর মধ্যে কয়েকটি কারণে আল্লাহ্ পাক তাকে আরোগ্য দান করবেন ঃ

১. পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১১-১২

"আর আমি নাযিল করেছি কোরআন, যাতে রয়েছে রোগ নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে রহমত"।

২. এমনিভাবে কোরআন করীমে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

"যদি স্ত্রীগণ তাদের মোহরানার সম্পত্তি থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদেরকে কিছু দেয় তবে তোমরা তা পানহার কর"।

৩. আর মধুর ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

অর্থাৎ– এতে রয়েছে মানুষের জন্যে রোগমুক্তি।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۞

"নিশ্চয় এতে রয়েছে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং তৌহিদের বিশেষ নিদর্শন সে সম্প্রদায়ের জন্যে যারা চিন্তা করে"।

মধু মক্ষিকার উদর থেকে নির্গত পানীয়- মানুষের জন্যে এত বড় উপকারী কিভাবে হল? এ প্রশ্নের একই জবাব আর তা হল আল্লাহ্ পাকের দান বা অনুগ্রহে গোবরে পদ্ম ফুল ফুটতে পারে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে আরবের লোকেরা সারা বিশ্বের শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন, কাফেরদের ঘরে যাদের জন্ম তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের সোনালী স্পর্শে হয়েছেন পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম। এসবই আল্লাহ্ পাকের মহান দান। যারা চিন্তাশীল, তারা এ সত্য উপলব্ধি করে, আর যারা চিন্তা করেনা তারা কোন সত্যেরই সন্ধান পায়না। আলোচ্য আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান রয়েছে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى
اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾
وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا
بِرَاۗدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ
اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ
مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

তরজমা

(৭০) আর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, তোমাদের কেউ কেউ একেবারে এমন অকেজো বয়সে উপনীত হয় যে, বুঝবার পর এখন আর কিছুই বুঝতে পারেনা। আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

(৭১) আর আল্লাহ পাক রিয্কের ক্ষেত্রে তোমাদের একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন। অতএব, যারা এতে প্রাধান্য লাভ করেছে, তারা তাদের করতলগতদের মধ্যে উপজীবিকা পরিবেশন করেনা কেন? যাতে করে সকলেই সমান হয়ে যায়, তারা কি আল্লাহ পাকের নেয়ামত অস্বীকার করতে চায়?

(৭২) আর আল্লাহ পাকই তো তোমাদের জন্যে তোমাদের মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পত্নি থেকে তোমাদের পুত্র পৌত্র সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছন্ন বস্তু রিয্ক হিসেবে দান করেছেন তবুও কি তারা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করবে? আর আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের জীবনোপকরণ এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও তাঁর কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শনগুলোর বিবরণ রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানব জাতির সৃষ্টির কথা এরশাদ হয়েছে। মানুষ যেন তার নিজের

সৃষ্টির বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখে। এমনও সময় ছিল যে, তার কোন অস্তিত্বই ছিলনা, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

"কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন সময় এসেছিলো যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা"।

এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকই মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন।

বস্তুতঃ মানুষের অস্তিত্ব তথা জীবন, যৌবন, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য এক কথায় সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যত কোন কিছুই তার নিজের হাতে নেই, সবই আল্লাহ পাকের হাতে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ

(আর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন।)

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

(তোমাদের কেউ কেউ একবারে এমন অকেজো বয়সে উপনীত হয় যে ইতোপূর্বে বুঝবার পর এখন আর কিছুই বুঝতে পারেনা।)

অকেজো বয়স

اَرْذَلِ الْعُمُرِ

অর্থাৎ অকেজো বয়স– যে বয়সে মানুষ তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, স্মরণশক্তি লোপ পায়, যা জানত তাও ভুলে যায়, যেমন জন্মলগ্নে সে কিছুই জানত না। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا

'আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের উদর থেকে বের করে এনেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না'।

মানুষ যেন অজানাকে জানতে পারে এবং ধীরে ধীরে তার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্যে তাকে তিনটি শক্তি আল্লাহ পাক দান করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং উপলব্ধি করার শক্তি। এসব শক্তির মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে কিন্তু মানব জীবনে এমনও সময় আসে যখন সে তার অর্জিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সে সময়কেই আলোচ্য আয়াতে ارذل العمر। বা অকেজো বয়স বলা হয়েছে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ অকেজো বয়স হল নব্বই বছর। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, অকেজো বয়স হল পঁচাত্তর বছর। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, আশি বছরকে অকেজো বয়স বলা হয়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ! আমি অকেজো বয়স থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি"।

لِكَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا ط

"বুঝবার পর এখন আর কিছুই বুঝতে পারেনা"।

এর অর্থ হলো, সে তার সব জানা কথা ভুলে যায় এবং বার্ধক্যের কারণে শিশুদের মত অবুঝ হয়ে যায়।

একরামা বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বদা পবিত্র কোরআন পাঠ করে তার এ অবস্থা হয় না।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যেভাবে আল্লাহ পাক যার অস্তিত্ব ছিলনা তাকে অস্তিত্ব দান করেন, যার জ্ঞান ছিলনা তাকে আলেম বা জ্ঞানী করেন, ঠিক এমনিভাবে আলেমকেও জাহেল করেন অর্থাৎ– যে অনেক কিছু জানত এখন সে কিছুই জানেনা এ অবস্থায় উপনীত করেন। এসবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, যাঁর হাতে রয়েছে মানুষের জীবন মরণ, জ্ঞান এবং মূর্খতা, উন্নতি এবং অবনতি, তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর, তাঁর প্রতিই পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর। আল্লাহ পাকই মানুষকে সবকিছু দান করেন, অতএব প্রত্যেকেরই কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার হওয়া, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করা।

বিনয় ও কৃতজ্ঞতা একান্ত কর্তব্য

কিন্তু কেউ যদি এ কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন না করে তথা অকৃতজ্ঞ হয় তবে তিনি সব কিছু দিয়ে পুনরায় সবকিছু কেড়েও নিতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অতএব, মানুষ যত সম্পদ, যত শক্তি এবং ক্ষমতাই লাভ করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে নিঃশঙ্ক এবং বেপরোয়া হওয়া উচিত নয়; বরং সুখে দুঃখে সম্পদে শক্তিতে, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে, ক্ষমতার উচ্চ চূড়ায় এক কথায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ

পাকের দরবারে মানুষের বিনীত ও কৃতজ্ঞ থাকা একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য কে পালন করে আর কে করেনা, আল্লাহ পাক তা সবই জানেন। কেননা,

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

আল্লাহ পাক মানুষের বয়সের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত এবং তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবককে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। মানুষের সকল অবস্থা এবং তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, আর সর্বত্র তাঁর ইচ্ছা হয় কার্যকর।

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ج

"আর আল্লাহ পাক রিয্কের ক্ষেত্রে তোমাদের একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন"।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত উপজীবিকার ক্ষেত্রে সকল মানুষ এক সমান নয়। আল্লাহ পাক তাঁর বিচার বিবেচনা মোতাবেক কোন লোককে রিয্ক বাড়িয়ে দেন আর কোন লোককে কমিয়ে দেন। একজন বিরাট সম্পদশালী হয়, আরেক জনের জীবন দুর্বিষহ হয় দারিদ্র্যের কষাঘাতে। এ পার্থক্য বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হয়, এ পাথক্য দূরীভূত করার শক্তি কোন বন্দার নেই, আর এ পার্থক্যের রহস্য উপলব্ধি করার ক্ষমতাও মানুষের নেই। কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনী দরিদ্রের এ পার্থক্য দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে মানুষের প্রতি অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচারও করা হয়েছে, কিন্তু ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। আল্লাহ পাক যেভাবে অর্থ সম্পদ প্রদানের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন ঠিক এমনিভাবে জ্ঞান বুদ্ধি, ধী-শক্তি, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য প্রভৃতির ব্যাপারেও পার্থক্য করেছেন। কাউকে বুদ্ধিমান এবং কাউকে নির্বোধ করেছেন। কাউকে অতি সুন্দর আর কাউকে কুৎসিত করেছেন। এমনিভাবে কেউ দুর্বল কেউ সবল রয়েছে। বিশ্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় রয়েছে এ পার্থক্য। যদি এ পার্থক্য দূর হয়ে যায় তবে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সামগ্রিকভাবে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আর এজন্যেই কেউ শাসক, আর কেউ শাসিত এবং কেউ আমীর কেউ ফকীর, কেউ মুনিব কেউ চাকর। কিন্তু কোন মুনিব বা মালিক ধন-সম্পদে বা মান মর্যাদায় তার চাকরকে সমান অধিকার দিতে কি প্রস্তুত হয়? তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ط

"যারা এতে প্রাধান্য লাভ করেছে তারা তাদের সম্পদ তাদের অধীনস্থদের পরিবেশন করেনা কেন? যাতে করে সকলে সমান সমান হয়ে যায়"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক মুশরেকদেরকে শেরকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করার তাগিদ করেছেন। যখন একজন মুনিব ও চাকর, প্রভু ও ভৃত্য এক সমান হতে পারেনা, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং তারতম্য অনিবার্য অথচ দু'জনই মানুষ, এমন অবস্থায় স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কিভাবে এক হবে? যারা কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে তারা তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতিরই পরিচয় দেয়। মুশরেকরা নিজস্ব বাড়তি অর্থ সম্পদ তাদের গোলামদেরকে দিয়ে তাদের সমান করতে রাজি হয় না, অথচ মহান আল্লাহ পাকের সাথে তাঁর কোন হীন সৃষ্টিকে সমান করার কথা বলে।

অথবা আয়াতের এ অর্থ হতে পারে, আল্লাহ পাক যাদেরকে বাড়তি রিয্‌ক দান করেছেন সে তার অধীনস্থদের ঐ বাড়তি রিয্‌ক কেন দেয় না? কেননা, এ রিয্‌কে তার সাথে অন্যরাও অংশীদার রয়েছে এবং সকলেই আল্লাহ পাক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ করে থাকে।[১]

أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

তারা কি আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? অর্থাৎ এ কাফেররা কি আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতকে অস্বীকার করে? কেননা, শেরক করার কারণে তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকেই অস্বীকার করে। আল্লাহ পাকের নেয়ামতের অনাদার করে। যেভাবে আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে রিয্‌কের ব্যাপারে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ঠিক তেমনি জ্ঞান, বুদ্ধি, মনীষা এবং নবুওয়্যত ও রেসালতের গুণাবলীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যারা নবী রসূলগণের এ প্রাধান্যকে অস্বীকার করে তারা যেন আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করে। অথবা এর অর্থ হল– আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দ্বারা তৌহিদের প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। এ দলিল প্রমাণই আল্লাহ পাকের নেয়ামত। যারা তৌহিদে বিশ্বাস করেনা তারা কি তাহলে আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করে।[২]

বস্তুতঃ যারা শেরক করে, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করে তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করারই ধৃষ্টতা দেখায়।[৩]

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً

"আর আল্লাহ পাকই তোমাদের মাঝ থেকে মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পত্নী থেকে তোমাদের পুত্র পৌত্র দান করেছেন"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১৩
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৩
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩৬

এ আয়াতেও আল্লাহ্‌ পাক মানব জাতির প্রতি তাঁর আরও একটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষকে আল্লাহ্‌ পাক জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভের জন্যে সংগ্রাম ও সাধনা কালে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্যে স্ত্রী দান করেছেন এবং তাদের থেকে পুত্র এবং পৌত্র দান করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ দান। এ মর্মে সূরা রুমে আরও একখানি আয়াত রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

"আর আল্লাহ্‌ পাকের নিদর্শন সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি তোমাদেরই মাঝ থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ কর আর তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন প্রীতি, মায়া এবং মমত্ববোধ"।

আলোচ্য আয়াতের حفدة শব্দটির অর্থ পৌত্র, খাদেম, খেদমতগার। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং নখয়ী (রঃ) বলেছেন, حفدة শব্দটির অর্থ হল জামাতা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে এর অর্থ হল শ্বশুর।

একরামা (রঃ), হাসান (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হল খাদেম-খেদমতগার। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল কর্মচারী। আর আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল সে সব সন্তান-সন্ততি যারা পিতা মাতার জন্যে সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। আর হযরত আবদুল্লাহ্‌ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল সন্তানের সন্তান-সন্ততি। যাহোক, আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের জন্যে স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, খাদেম-খেদমতগার, জামাতা শ্বশুর দিয়ে তোমাদের প্রতি এহ্‌সান করেছেন।

وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ

আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম রিয্‌ক। মানব জাতির প্রতি এটিও তাঁর মহান দান।

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ

এতদসত্ত্বেও কাফের মুশরেকরা ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস করে।

وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۝

আর আল্লাহ্‌ পাকের এত নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তারা অকৃতজ্ঞ হয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই মানুষকে তার জীবন দান করেছেন। তিনিই তাকে উপজীবিকা দান করেছেন এবং মানুষকে তার স্ত্রী পুত্র পরিবার দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও দূরাত্মা কাফেররা বলে অমুক দেবতার কারণে আমরা উপজীবিকা লাভ করি। অমুকের কারণে আরোগ্য লাভ করেছি (নাউজুবিল্লাহ)। নিঃসন্দেহে এসব কথা মিথ্যা, ভিত্তিহীন অমূলক। যিনি স্রষ্টা, যিনি পালনকর্তা তিনিই রিয্‌ক দাতা, মানুষের প্রতি তাঁর নেয়ামত অনন্ত অসীম। অতএব, মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের জন্যে তাঁর দরবারে শোকর গুজার হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার এবং জ্বীন ও মানুষের ব্যাপার বিস্ময়কর। তাদেরকে আমি সৃষ্টি করি আর তারা পূজা করে অন্যের, আমি রিয্‌ক দান করি, কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় অন্যের।[১]

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ
أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ
عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾
وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ
وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ
يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

তরজমা

(৭৩) এবং তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে যারা আসমান জমীনের কোন কিছুতেই তাদের জীবিকা সরবরাহের সামর্থ রাখেনা আর তারা কিছুই করতে সক্ষম হয় না।

(৭৪) অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের কোন শরীক স্থির করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক জানেন আর তোমরা জান না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১৪-১৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৪৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৪

(৭৫) আল্লাহ পাক একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন– একটি গোলাম পরের সম্পত্তি, কোন ব্যাপারেই তার কোন ক্ষমতা নেই, আর একজন যাকে আমি উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে প্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, উভয়ে কি সমান? সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ পাকের এবং অনেক লোকই তা জানেনা।

(৭৬) আল্লাহ পাক আরো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। দু' জন লোক, একজন বোবা, কোন কাজই করতে পারেনা, সে তার মুনিবের উপর দুর্বহ বোঝা স্বরূপ। যেদিকেই তাকে প্রেরণ করা হোক না কেন, কোন প্রকার কল্যাণই সে সাধন করতে পারে না, এমন ব্যক্তি, আর ঐ ব্যক্তি যে ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং যে নিজেও সরল সঠিক পথে রয়েছে, উভয়ে কি সমান?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহিদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক মানুষকে তার জীবন ও জীবনের উপকরণ দান করেছেন। আসমান থেকে বারি বর্ষণের মাধ্যমে জীবনের অপর নাম পানি দান করেছেন। দুগ্ধ, মধু, ফল-ফলারী দান করেছেন। এমনিভাবে মানুষকে আল্লাহ পাক তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ দান করেছেন। এসব কিছু মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এত অসংখ্য নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও মুশরেকরা এমন অসহায় বস্তুর সম্মুখে মাথা নত করে এবং তাদের পূজা পাঠ করে যারা আসমান জমীনে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখেনা, মানুষকে রিয্ক দেয়ার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই, এতদসত্ত্বেও অসহায় জড় পদার্থকে তারা মানে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا

"তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে, যারা আসমান জমীনের কোন কিছুতেই তাদের রিয্কের মালিক নয় এবং তাদের কোন ক্ষমতাই নেই"।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আরবের পৌত্তলিকরা কখনো বলত, বিশ্ব সৃষ্টির প্রকৃত মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। তবে সরাসরি তাঁর মহান দরবারে হাযির হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্যে আমরা ঠাকুর দেবতাদের মাধ্যম গ্রহণ করি। এদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয় এবং এদের মাধ্যমেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। পৌত্তলিকদের একথা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর কেননা, আল্লাহ পাক সর্ব শক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি মহাজ্ঞানী, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, সব

কিছুই তাঁর নখদর্পণে। সুতরাং কোন কিছুর মাধ্যমে তাঁর দরবারে পৌঁছার এবং জড় পদার্থের পূজা করার কোন যুক্তি নেই, কোন প্রয়োজনও নেই।

সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের হাতের মুঠোয়, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, বন্দেগী শুধু তাঁরই করতে হবে, শুধু তাঁরই সমীপে বিনয় প্রকাশ করতে হবে, আর কারো সম্মুখে মাথা নত করার কোন যুক্তি নেই এবং অনুমতি নেই।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ মুশরেকরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এমন কিছুর এবাদত করে যা তাদের জন্যে আসামান থেকে বা জমীন থেকে রিয্ক দেয়ার কোন অধিকার রাখেনা। আসমান থেকে রিয্ক তথা বৃষ্টির একটি ফোটাও তারা অবতরণ করতে পারেনা। এমনিভাবে, জমীন থেকে যা উৎপন্ন হয় যেমন খাদ্য-দ্রব্য, ফল-ফলারী-এর কোন কিছুই তারা সরবরাহ্ করতে পারেনা। বেশী হোক কি কম, কোন কিছু দেয়ার ক্ষমতাই তাদের নেই। এতদসত্ত্বেও মুশরেকরা তাদের উপাসনা করে।

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ

তারা কোন ক্ষমতাই রাখেনা, অর্থাৎ মুশরেকরা যে সব মূর্তির পূজা করে সেগুলোর কোন ক্ষমতাই নেই।

অথবা এর অর্থ হল এ কাফেরদের কোন ক্ষমতাই নেই, আর তারা যে সব বস্তুর উপাসনা করে সেগুলোর কি ক্ষমতা থাকতে পারে? কেননা, এসব কিছু হল জড় পদার্থ।[২]

মুশরেকরা একটি কথা বলত, রাজার দরবারে হাযির হতে হলে, রাজার দান পেতে হলে রাজ দরবারের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের মাধ্যম অবলম্বন করতে হয়, আমরাও আল্লাহর নেয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে দেব-দেবীর মাধ্যম অবলম্বন করি। মুশরেকদের এ ভিত্তিহীন কথার জবাবেই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ

অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করোনা। কেননা, দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হলে যার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়, তার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য অথচ আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অনুচিত।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৫৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১৫

অর্থাৎ– আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত, তিনি সব কিছুই জানেন, আর তোমরা কিছুই জাননা। অথবা এর অর্থ হল তোমরা আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, এ পর্যায়ে তোমাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অবগত, কিন্তু তোমরা অবগত নও, তোমাদের ভুল কোথায় তা তোমরা আদৌ জান না, যদি জানতে তবে আল্লাহ্ পাকের সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্ত স্থাপনের ধৃষ্টতা দেখাতে না।[১]

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াত হল অন্য একখানি আয়াতের ন্যায়।

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا

অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক স্থির করোনা। ঠিক এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করোনা। এবনে জরীর, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এর অর্থ হল–

لا تجعلوا معى إلها غيرى فانه لا اله غيرى

(তোমরা আমার সাথে অন্য কিছুকে উপাস্য স্থির করোনা কেননা, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই)

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা যা কিছু করছো তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হবে তা আল্লাহ্ পাক জানেন কিন্তু তোমরা জান না।[২]

ইমাম রাজী فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ এর সম্পর্কে লিখেছেনঃ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. আল্লাহ্ পাক মহান স্রষ্টা, কোন সৃষ্টি দ্বারা তাঁর দৃষ্টান্ত দিওনা।

২. আল্লাহ্ পাক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। অতএব, তাঁর সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করোনা।

৩. মুশরেকরা বলতো, রাজ দরবারে হাযির হওয়ার যোগ্য আমরা নই, এজন্যে রাজ দরবারের নৈকট্য-ধন্য রাজ কর্মচারী দ্বারাই আমরা কার্য সমাধা করি। ঠিক এমনিভাবে মূর্তিপূজা বা নক্ষত্র পূজার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১৬
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৯৪

করি। তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, তোমরা মূর্তি পূজার পক্ষে যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছ তা করোনা, আল্লাহ্ পাকের এবাদতে কোন কিছুকে শরীক করোনা, তিনি মহাজ্ঞানী, পরাক্রমশালী।

মূর্তিপূজা তথা শেরক ও কুফরের ভয়াবহ পারণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অবগত, তোমরা তার কিছুই জান না। যদি তোমরা শেরক ও কুফরীর পরিণাম জানতে তবে অবশ্যই তা পরিত্যাগ করতে।[১]

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبۡدًا مَّمۡلُوۡكًا لَّا يَقۡدِرُ عَلٰى شَىۡءٍ

"আল্লাহ পাক একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন– একটি গোলাম পরের সম্পত্তি, কোন বিষয়েই তার কোন ক্ষমতা নেই"। সে পরাধীন, কোন কিছুর স্বাধীনতা তার নেই এমনকি কোন অধিকারও নেই, সব ব্যাপারেই সে তার মুনিবের অনুগত, মুনিবের অনুমতি ব্যতীত তার কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। আর এক ব্যক্তি সে স্বাধীন, ক্ষমতাবান, আল্লাহ্ পাক তাকে দান করেছেন উত্তম রিয্ক, সে লাভ করেছে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং যাবতীয় সুখ-সামগ্রী। সে গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে থাকে, তার কাজে কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনা, উভয় ব্যক্তি কি এক সমান? একজন গোলাম এবং অন্যজন স্বাধীন, একজন চরম অসহায়, অন্যজন সহায় সক্ষম। উভয়ে কোন অবস্থাতেই সমান হতে পারেনা। যদি একথা সত্য হয় আর অবশ্যই সত্য তবে যিনি সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি মহান দাতা, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, মাটি অথবা প্রস্তর নির্মিত জড় পদার্থ, মূর্তি কিভাবে তাঁর সমান হতে পারে? দিবালোকের ন্যায় এ মহা সত্য কেন তোমরা উপলব্ধি করনা!

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ দৃষ্টান্তটি হল মোমেন এবং কাফেরের, একজন তৌহীদে বিশ্বাসী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানদার, সর্বদা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের অন্বেষণে ব্যস্ত, আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন জ্ঞান, ঈমান। জাগতিক ও অধ্যাত্মিক সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তিনি, এ মহান ব্যক্তি কি ঐ কাফেরের সমান হতে পারে যে দেব-দেবীর পূজারী, মূর্তির ভক্ত, যে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ থেকে চির বঞ্চিত, তা কখনও হতে পারেনা যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

هَلۡ يَسۡتَوِى الۡاَعۡمٰى وَالۡبَصِيۡرُ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৮২

অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান হতে পারে কি এক সমান? বস্তুতঃ আলো আধার যেমন এক সমান হতে পারেনা, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান যেমন এক সমান হতে পারেনা, ভাল এবং মন্দ যেমন এক সমান হতে পারেনা, ঠিক এমনিভাবে মোমেন ও কাফেরও এক সমান হতে পারেনা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এবনে যোরায়জ (রঃ) তফসীরকার আতা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আলোচ্য আয়াতে যাকে অসহায় গোলাম বলা হয়েছে সে হল আবু জেহেল, আর যে আল্লাহর নেয়ামত লাভে সমৃদ্ধ, তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। ঠিক যেভাবে আবু জেহেল এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সমান হতে পারেনা, ঠিক তেমনি মোমেন ও কাফের এক সমান হতে পারেনা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যেই কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানেনা। মানুষের জীবন, যৌবন, সম্পদ শক্তি সব কিছু আল্লাহ পাকই দান করেছেন, তিনিই মহান দাতা, তাই প্রশংসা মাত্রই এক আল্লাহ পাকের জন্যে।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

আল্লাহ পাক আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একজন বোবা বধির কথা বলতে পারেনা, অন্যের কথা শ্রবণও করতে পারেনা। বুদ্ধি বিবেচনা বলতেও যার কিছুই নেই, যেদিকে বা যে কাজেই তাকে প্রেরণ করা হোক না কেন সে কোন কল্যাণই সাধন করতে পারেনা, সে তার মালিকের জন্যে দূর্বহ বোঝা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ

আর একজন হল বুদ্ধিমান, ধী-শক্তির অধিকারী, সরল সঠিক পথের অনুসারী, সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহবানকারী-উভয়ে কি সমান হতে পারে? না কখনও নয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, শেষোক্ত বিবরণ দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে ابكم। শব্দ দ্বারা কাফের এবং يامر بالعدل শব্দ দ্বারা মোমেনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ এ দৃষ্টান্তটি কাফের ও মোমেনের।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৫

তফসীরকার আতা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, اَبْكَمُ শব্দ দ্বারা উমাইয়া এবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর يامر بالعدل দ্বারা হযরত হামজা (রাঃ), হযরত ওসমান এবনে আফফান (রাঃ) এবং হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, রবীয়া গোত্রের হাশেম এবনে আমর নামক লোকটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জঘন্য শত্রু ছিল। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত কোরায়শের এক ব্যক্তি এবং তার গোলাম সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[১]

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللّٰهُ
اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَلَمْ يَرَوْا
اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾

তরজমা

(৭৭) আসমান জমিনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই। আর কেয়ামতের ব্যাপার তো শুধু চোখের পলকের ন্যায়; বরং তার চেয়েও নিকটতর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(৭৮) আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃ-গর্ভ থেকে, তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং হৃদয় যেন তোমরা শোকর গুজার হও।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪১৮

(৭৯) তারা কি লক্ষ্য করেনা? আকাশের বায়ু মন্ডলে নিয়ন্ত্রণাধীন পক্ষীকূলকে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউই তাদেরকে স্থির রাখেনা; নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্যে যাদের ঈমান আছে।

তফসীরুল কোরআন

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর দু'টি গুণের কথা ঘোষণা করেছেন। একটি হল তিনি মহাজ্ঞানী। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছুর জ্ঞানই তাঁর রয়েছে। গোপন ও প্রকাশ্য কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, আসমান জমিনের যাবতীয় গায়বী খবর একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। নভোমন্ডল, ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সবই তাঁর অনুগত ভৃত্য। চক্ষু বন্ধ করে খুলতে হয়তো তোমাদের একটু বিলম্ব হয়, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে এতটুকু বিলম্বও হয় না। কেয়ামতকে দূরে মনে করা উচিত নয়, আল্লাহ পাকের জন্যে তা কঠিন কিছুই নয়। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেয়ামত ঘটবে, চোখের পলকে এমনকি তার চেয়েও কম সময়ে তা তিনি করতে পারেন। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হয়েছে এবং হবে সকলকে এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তাঁর মহান দরবারে হাযির করবেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط

"আর কেয়ামত তো চোখের পলকের ন্যায় অথবা তার চেয়েও নিকটতর"।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۞

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"।

পৃথিবীতে আল্লাহ পাক একের পর এক মানুষকে জীবন দান করছেন। কিন্তু কেয়ামতের দিন একই সঙ্গে সকলকে জীবিত করবেন। আর এটি আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, আসমান জমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে আর কারো নয়। এতে আর কেউ অংশীদার নেই। আল্লামা আলুসীর ভাষায়ঃ[১]

(ولله) تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالا ولا اشتراكا

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৯৮
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৪

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা অনন্ত অসীম, অতুলনীয়। মানব জাতির প্রতি তাঁর দান অসংখ্য। আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এবং তাঁর অবদানের জীবন্ত নিদর্শন স্বয়ং মানুষই, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ

হে আত্মবিস্মৃত মানুষ! তুমি তোমার নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এমন একদিন ছিল যখন এ পৃথিবীতে তোমার কোন অস্তিত্বই ছিলনা। তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলেনা, আল্লাহ পাকই তোমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তোমাদের মাতৃ-গর্ভ থেকে আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে বের করে এনেছেন। তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন।

لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ

এমন অবস্থায় যে তখন তোমরা কিছুই জানতে না, কিছুই বুঝতে না। মানুষ যেন অজানাকে জানতে পারে এবং পৃথিবীতে জীবন-সাধনায় সার্থক হতে পারে এবং জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক মানুষকে দান করেছেন চক্ষু, কর্ণ, হৃদয়, মন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ

"আর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং হৃদয়"।

বস্তুতঃ যদি মানুষের চক্ষু, কর্ণ এবং হৃদয় না থাকত তবে সে কি জীবন-সাধনা শুরু করতে পারত? এর কোন্ নেয়ামতকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে? অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হল আল্লাহ পাকের সকল নেয়ামতের জন্যে তাঁর মহান দরবারে শোকর গুজার থাকা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

যেন তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার থাক। জ্ঞানার্জনের উপকরণ সমূহ আল্লাহ পাক দান করেছেন যেন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে যে আমার অস্তিত্ব আল্লাহ পাকেরই দান, আমার চক্ষু কর্ণ সহ প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাবতীয় শক্তি এক আল্লাহ পাকেরই দান। অতএব, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত সকল দানের জন্যে তাঁর মহান দরবারে শোকর গুজার থাকা এবং প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহের সদ্ব্যবহার করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

কেননা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামত সমূহের সদ্ব্যবহার শোকর গুজারীর অন্যতম পন্থা। তাই মানুষ যেন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে তাঁর বিধি-নিষেধ মোতাবেক ব্যবহার করে, তাঁর পছন্দনীয় পথে চলে। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত শক্তি সমূহ কোন অবস্থাতেই আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যয় না করে।

বস্তুতঃ যে বা যারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে, তারা আল্লাহর প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয়। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে কুদসীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যে আমার ওলীদের সঙ্গে দুশমনি করে সে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। আমার তরফ থেকে ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) পালনের মাধ্যমে বন্দা আমার যত নৈকট্য লাভ করতে পারে এতটা আর কোন কিছু দিয়ে করতে পারেনা। অধিক পরিমাণে নফল এবাদতের মাধ্যমে বন্দা আমার নিকট প্রিয় হয়। যখন আমি তাকে মহব্বত করি তখন আমি তার কর্ণ হই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হই যা দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে।[১] (আল-হাদীস)

অর্থাৎ নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য লাভ করা যায় যে, বন্দার সকল আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ পাক পূর্ণ করেন।

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ط

আকাশের বায়ুমন্ডলে নিয়ন্ত্রিত পক্ষীকূলকে কি তারা দেখেনা? আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদেরকে ধরে রাখেনা। আল্লাহ পাক যেভাবে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে অশেষ নেয়ামত দান করেছেন, ঠিক এমনিভাবে অন্যান্য জীব-জন্তুকেও তিনি তার জীবন যাত্রার উপকরণ দান করেছেন। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানানো হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন নিখিল বিশ্বে রয়েছে, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হল, সে সব দেখে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হওয়া। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ يَرَوْا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৪৭

লোকেরা কি লক্ষ্য করেনা? আকাশে উড়ন্ত পাখিগুলো কিভাবে উড়ে বেড়ায়, তাদের গুরুভারের কারণে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়েনা, কে তাদেরকে এভাবে আকাশে ধরে রেখেছে? এর একটি মাত্র জবাব, আর তা হল স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ পাকই তাদেরকে মুক্ত আকাশে বিচরণ করার তৌফিক দান করেছেন। মধ্যকর্ষণ শক্তি তাদেরকে টেনে আনতে পারেনা, তাদেরকে আকাশের বুকে অনায়াসে উড়ে চলার উপযুক্ত করে তৈরী করেছেন তিনিই, যিনি হে মানব জাতি! তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্‌ পাকের অনন্ত করুণা

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ কোন কোন সময় মানুষের জীবিকার চিন্তা তাকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করে ফেলে, সে আল্লাহ্‌ পাকের নাফরমানী করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা। অথচ প্রতিটি মানুষের চিন্তা করা উচিত যখন সে মাতৃ-গর্ভে ছিল তখন কে তার খাদ্য সরবরাহ করেছে। এমনিকি, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যখন মানুষ ছিল চরম অসহায় তখন কে তার খাদ্য যোগায়? তার চক্ষু, কর্ণসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার দান? আকাশের বুকে পক্ষীগুলোর বিচরণ এবং অবস্থান কার অবদান? এ সমস্ত প্রশ্নের একই জবাব আর তা হল এসব কিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ পাকেরই অনন্ত করুণা, অশেষ অবদান।

অতএব, তাঁর প্রতি ঈমান এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি ঈমান, আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভরসা করার মাধ্যমেই মানব জীবনের সকল মুশকিল আসান হতে পারে।[১]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ নিশ্চয় মোমেনদের জন্যে এসবের মধ্যে আল্লাহ্‌ পাকের কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন রয়েছে। মানুষের সৃষ্টি ও তার বিভিন্ন শক্তি অর্জনে, জীবনোপকরণ লাভে, এমনিভাবে আকাশের বুকে পাখিগুলোর বিচরণে আল্লাহ্‌ পাকের কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি ঈমান আনে। যারা ঈমানদার, তারাই আল্লাহ্‌ পাকের কুদরত হেকমতের ব্যাপারে চিন্তা এবং গবেষণা করে এবং সরল সঠিক পথের সন্ধান করে অতএব, হেদায়েত লাভের জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৫০

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا
وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا
خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ
سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُتِمُّ
نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾

তরজমা

(৮০) আর আল্লাহ পাকই গৃহকে তোমাদের আবাস-স্থল করেছেন এবং তিনি চতুঃষ্পদ জন্তুর চামড়া থেকেও তোমাদের তাঁবু তৈরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রবাসকালে তা তোমরা সহজে বহন করতে পার এবং গৃহে অবস্থান কালেও তা তোমাদের জন্য লঘুভার এবং তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন চতুঃষ্পদ জন্তুর পশম, লোম এবং কেশ থেকে গৃহ-সামগ্রী এবং ব্যবহার উপরকণ একটি নিদৃষ্ট কালের জন্যে।

(৮১) আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যেই তাঁর সৃষ্টি বস্তুর ছায়া তৈরী করেছেন, আর তিনি তোমাদের জন্যে পাহাড়ে আশ্রয়ের জায়গা রেখেছেন এবং তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, তা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্যে বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ ভাবে দান করে থাকেন যাতে করে তোমরা আল্লাহ পাকের আদেশ মেনে চল।

(৮২) তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে রসূল!) আপনার কর্তব্য হল শুধু সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া।

(৮৩) তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সম্পর্কে জ্ঞাত আছে কিন্তু তবুও তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই কাফের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এ আয়াত সমূহেও মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ পাকই মানুষকে তার শান্তির নীড় ঘর-বাড়ি দান করেছেন। ইঁট পাথরের ঘর দুয়ার মানুষের আরাম এবং বিশ্রামের কেন্দ্র, এটিও মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান। যার কাছে পৃথিবীতে তার নিজস্ব আবাস-স্থল নেই, সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, বাড়ী-ঘর আল্লাহ্ পাকের কত বড় নেয়ামত!

আলোচ্য আয়াতে এ নেয়ামতের উল্লেখ করেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

আর আল্লাহ্ পাকই তোমাদের জন্যে বাসগৃহ্ দান করেছেন। ইঁট-পাথরের তৈরী ঘর-দোর স্থানান্তর করা যায় না, প্রবাস ভ্রমণে তা বহন করা সম্ভব হয় না। তাই চামড়া, পশম ও কাপড়ের তৈরী তাঁবু এবং ডেরার ব্যবস্থা করা হয়। ওজনে হালকা হওয়ার কারণে এগুলো যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। এসবও বন্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ

আর চতুঃষ্পদ জন্তুর চামড়া থেকেও তিনি তোমাদের তাঁবু তৈরী করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রবাসে এবং গৃহে অবস্থানের সময়ও তা তোমাদের জন্যে লঘুভার। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ভোগ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে ভেড়ার লোম, উষ্ট্রের পশম এবং ছাগলের লোম থেকে কত কি দ্রব্য-সম্ভার দান করেছেন যেমন ফরাশ, চাদর, কম্বল, পোশাক প্রভৃতি। এসব মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকেরই দান। এ দান সমূহের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا

আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যেই তাঁর সৃষ্টি বস্তুর ছায়া তৈরী করেছেন আর পাহাড়-পর্বতে তোমাদের লুকাবার স্থান করে দিয়েছেন। গরম থেকে বাঁচার জন্যে তোমাদের জামা এবং রণাঙ্গণে আত্মরক্ষা করার জন্যে বর্ম জামা তৈরী করে দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চল।

এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন। মেঘমালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির ছায়াও আল্লাহ্ পাক

মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন যেন তারা চরম গরমের সময় এসবের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে, বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। মানুষ পাহাড়-পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। ঝড়-বৃষ্টি এবং রৌদ্র থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এমনকি শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও পাহাড়ের গুহাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব নিঃসন্দেহে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান।

وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ط

এমনিভাবে গ্রীষ্মে ব্যবহৃত জামা-কাপড় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যে যে যুদ্ধ-বর্ম ব্যবহৃত হয়, এসবও আল্লাহ পাকের দান। শীত-গ্রীষ্ম উভয়ের ক্ষেত্রেই মানুষ যেন আত্মরক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করেছেন। যেহেতু আরবদেশ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ তাই শুধু গ্রীষ্ম নিবারক জামার উল্লেখ করা হয়েছে। শীতের কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি।

كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝

"এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত সমূহকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর বিধান মেনে চল"।

মানুষের দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, যাবতীয় কর্ম শক্তি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকেরই দান, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আল্লাহ পাকই দান করেছেন। যে জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে মানুষ পৃথিবীতে নব নব বস্তু আবিস্কার করে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করেছে, সে জ্ঞান বুদ্ধি কি মানুষের নিজের? মোটেই নয়; বরং আল্লাহ পাকই তাকে এ জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন। করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা-ধন্য হয়েই মানুষ পৃথিবীতে উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চতম সোপানে আরোহন করছে। আল্লাহ পাকই মানুষকে তার জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন করে দিয়েছেন। এমন অবস্থায় তিনি তার আত্মিক ও আধ্যত্মিক জীবনের ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন, এমন কথা অকল্পনীয়, তাই মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন। নবী রসূলগণকে তাঁদের নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ মোজেযা দান করেছেন, অবশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ পাক ইসলামকে পরিপূর্ণ বিধান রূপে সমগ্র মানব জাতির জন্যে পছন্দ করেছেন। ইসলামের এ পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজকের দিনে তোমাদরে জীবন বিধানকে আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি, আর দ্বীন ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি"।

আতা খোরাসানী (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এমন কথা বলেছেন, যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে। যেমন আলোচ্য আয়াতে পাহাড়-পর্বতের গুহার কথা বলা হয়েছে। চারদিকে পাহাড়-পর্বতে ঘেরা মক্কার অধিবাসীরা সর্বদাই এসব কিছু দেখতো। কখনও তারা তাঁবু বা ডেরায় আশ্রয় নিত। এসব কথার সত্যতা অনুধাবন করে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারতো। বস্তুতঃ মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের দান ও অনুগ্রহ অপরিসীম। কিন্তু আল্লাহ পাকের এত দয়া মায়া সত্ত্বেও যদি মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান না আনে তবে তা হবে তাদের জন্যে চরম দুর্ভাগ্যজনক। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

এত দলিল-প্রমাণ এবং এত নিদর্শন দেখার পরও এবং এত দয়ামায়া ও নেয়ামত লাভের পরও যদি কাফেররা মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ হল তাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া, হেদায়েত গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য করা নয়। (হে রসূল!) তাদের ব্যাপারে আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব আপনি সঠিকভাবে সম্পাদন করেছেন, এখন তাদের ব্যাপার আল্লাহ পাকের হাতেই সোপর্দ করুন।

এবনে আবি হাতেম তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন গ্রাম্য লোক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সম্মুখে আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا

সে বললো জ্বী-হ্যাঁ। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ

পাঠ করলেন, সে বললো জ্বী-হ্যাঁ। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেনঃ

كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ

এ সময় গ্রাম্য লোকটি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আর তখন আলোচ্য আয়াত

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

নাযিল হল।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ۝

"তারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ সম্পর্কে জানার পরও তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ ও কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ সূরায় আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত সমূহের উল্লেখ রয়েছে কাফেররা সেগুলো বুঝতো কিন্তু যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর গুজার হও তখন তারা অস্বীকার করতো এবং বলতো যে, আমরা এ নেয়ামত আমাদের পূর্ব পুরুষদের উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল যখন কাফেরদের সম্মুখে আল্লাহ পাকের এ নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করা হত তখন তারা স্বীকার করতো যে, সবই আল্লাহ পাকের নেয়ামত। কিন্তু পরে তারা বলতো এসব আমাদের দেব-দেবীর সুপারিশ ক্রমে আমরা পেয়েছি। কাফেরদের অনেকেই ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, নাফরমান, তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত এবং অনুগ্রহ উপলব্ধি করতো, কিন্তু এরপর অস্বীকার করতো। আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের স্থলে তাঁর অবাধ্য হতো, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে অকৃতজ্ঞ হতো।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২১-২২

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى
الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ
كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ ۚ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

তরজমা

(৮৪) আর যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একেকজন সাক্ষী হাযির করব, সেদিন কাফেরদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না।

(৮৫) আর পাপীষ্ঠরা যখন আযাব দেখে নেবে তখন তাদের আযাব লঘু করা হবেনা, তখন তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

(৮৬) আর মুশরেকরা যখন তাদের শরীকদেরকে দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের সে সব শরীক, যাদেরকে তোমার পরিবর্তে আমরা ডাকতাম। এর প্রতি-উত্তরে তারা বলবে, নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।

(৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্ পাকের নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা কথা বলত, তা তাদের জন্যে নিষ্ফল হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এরপর একথাও এরশাদ হয়েছে যে, অনেক লোক আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত দেখেও তা অস্বীকার করে। আর এ আয়াতে কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই কাফেরদের সম্পর্কে যারা বুঝে শুনেও আল্লাহর

নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা আলোচ্য আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে সে সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর নেয়ামতের পরিচয় পাওয়ার পরও তা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তাদের অধিকাংশই হল কাফের। আর আলোচ্য আয়াতে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ কেয়ামতের দিন কাফেরদের যে দুর্গতি হবে, আলোচ্য আয়াতে তারই উল্লেখ রয়েছে।

এ আয়াতে شهيد শব্দ দ্বারা পয়গম্বরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি তাঁর উম্মতের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

এরপর কাফেরদেরকে তাদের পক্ষে কোন ওজর-আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। অথবা এর অর্থ হল– তাদেরকে সেদিন কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে না।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ভয়াবহ আযাব প্রত্যক্ষ করার পর তারা দুনিয়াতে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। কিন্তু তাদেরকে সে অনুমতিও দেয়া হবেনা।

বস্তুতঃ কেয়ামতের দিন সমাগত, স্থির-নিশ্চিত। যেদিন প্রত্যেককে তার সারা জীবনের হিসাব-পত্র পেশ করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে। প্রত্যেক উম্মতের পয়গম্বর সেই উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবেন এবং নিজের উম্মতের নেককার, বদকার, অসৎ এবং পাপী লোকদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।[৩]

আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলগণের সঙ্গে তাঁদের উম্মত বা জাতি কি ব্যবহার করেছে তার বিবরণ পেশ করবেন, সে মুহূর্ত এত ভয়াবহ হবে যে মুশরেক তথা পৌত্তলিক এবং নাস্তিকরা তাদের প্রকৃত রূপ এবং ভয়াবহ পরিণাম দেখে এমন অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোন কথা বলার অবস্থায় তারা থাকবেনা, তারা এত অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে যে, কোন প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করার কোন সুযোগই তারা পাবেনা। এমনকি, ঈমান আনার এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-৯৫
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২২-২৩

করারও কোন সুযোগ থাকবেনা। তারা সেদিন এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবী ছিল কর্মস্থল আর আখেরাত হল কর্মফল লাভের স্থান। অতএব, কথা বলার চেষ্টা হবে বৃথা। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের উম্মত সম্পর্কে যে স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন, সে অনুযায়ীই ফয়সালা হবে। যারা শেরক, কুফর এবং নাফরমানীর মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. কাফেরদেরকে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা।

২. তাদেরকে অধিক কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে না।

৩. তাদেরকে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয় হবে না।

৪. সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের সময় কাউকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে না, সকলে তখন থাকবে নীরব।

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۝

অর্থাৎ– তাদেরকে একথাও বলা হবে না যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে রাজী করে নাও তথা তওবার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ কর। এক কথায় কাফেররা সেদিন কোনভাবেই আল্লাহ পাককে রাজী করাতে পারবেনা।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ۝

জালেমরা যখন আল্লাহর আযাব দেখতে পাবে তখন তাদের প্রতি আযাব লঘু হবেনা এবং তারা অবকাশও পাবেনা। তারা আযাব থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই পাবেনা এমনকি, তাদের প্রতি আযাব কিছুমাত্র লঘুও করা হবেনা এবং মুহূর্তের জন্যেও তাদের প্রতি আযাবে বিরতি হবেনা।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের জালেম বলা হয়েছে। কেননা, কাফেররা কুফরী ও নাফরমানীর মাধ্যমে নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। আর যখন তারা আযাবের সম্মুখীন হবে তখন যত কান্নাকাটিই তারা করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই আযাব থেকে তারা রেহাই পাবেনা এবং তাদের প্রতি আযাবকে লঘু করা হবেনা এবং আযাব প্রদানে বিরতি দিয়ে ক্ষণিকের জন্যেও তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ প্রসঙ্গে আযাবের কিছু বিবরণ পেশ করেছেন। কাফেরদেরকে সেদিন হঠাৎ পাকড়াও করা হবে। দোযখ তাদের সম্মুখে বর্তমান থাকবে যার ৭০ হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর জাহার ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। তখন দোযখ থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যার বীভৎস আকৃতি দেখে কেয়ামতের ময়দানে লোকেরা নতজানু হয়ে পড়বে। তখন দোযখ তাদের নিজের ভাষায় উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে যে, আমি সেই জেদী, বিদ্রোহী ব্যক্তির জন্যে নিযুক্ত আছি যে আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করেছে এবং এ অন্যায় কাজ করেছে।

এরপর কয়েক প্রকার পাপীষ্ঠ লোকের নাম উল্লেখ করবে। যেভাবে পাখী একটি খাদ্য-দানাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, ঠিক এমনিভাবে কাফের মুশরেক এবং পাপীষ্ঠ লোকদেরকে দোযখ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তারা মহা বিপদ ও চরম শাস্তির কারণে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, কিন্তু মৃত্যু আর হবেনা। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মরক্ষার কোন পথ হবেনা। তখন তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা এবং আযাব থেকে রেহাই পাবার কোন ব্যবস্থাও হবেনা।[১]

وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ شُرَكَآءَهُمْ

আর মুশরেকরা যখন তাদের শরীকদেরকে (উপাস্য) দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের সে সব শরীক, আমরা তোমার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকতাম, আজীবন আমরা তাদেরই পূজা অর্চনা করেছি, তাদের নামেই নজর-নিয়াজ মেনেছি। কাফেররা তাদের উপাস্যদেরকে দেখিয়ে বলবে যে, এরাই হল আমাদের ধ্বংসের মূল কারণ। অতএব, এদের শাস্তি হওয়া উচিত দ্বিগুণ।

فَأَلْقَوْا۟ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ ۝

উপাস্যরা তখন তাদের পূজারীদের উপর কথা ফেলে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরাই মিথ্যাবাদী'।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তখন মূর্তিগুলোকে বাকশক্তি দান করবেন, মূর্তিগুলো তাদের পূজারীদের সম্বোধন করে বলবে, তোমরা তোমাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী। তোমরা মূলতঃ আমাদের পূজা করতে না; বরং নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নার পূজা করতে, আমরা কখন তেমাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আমাদের পূজা কর, আল্লাহর সাথে শরীক কর, তখন তোমাদের যা ইচ্ছা করেছ আর এখন তোমাদের পাপের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাও!

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৫০

অথবা এর অর্থ হল– তোমরা তোমাদের এ দাবীতে মিথ্যাবাদী যে আমরা তোমাদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছি এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে শেরক করতে বাধ্য করেছি। তফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেররা হয়তো এ আশায় তাদের দেব-দেবীর উল্লেখ করবে যে এ সুযোগে তাদের আযাব কিছুটা লঘু হবে, অথবা আযাব পূজারী এবং পূজনীয়ের মাঝে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু এ পন্থা তাদের জন্য কার্যকর হবেনা। তাদের কথার প্রতিবাদ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে। তখন কাফেররা আরও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। এরপর আর কোন উপায় না দেখে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আত্মসমর্পণ করবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

সেদিন তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত হয়ে হাযির হবে এবং নিজেদের যাবতীয় মিথ্যা রচনা ভুলে যাবে। দূরাত্মা কাফের মুশরেকরা সেদিন সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। যারা দুনিয়াতে অহংকার করতো, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করতো তারা মনে করতো তাদের দেব-দেবীরা আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করবে। কিন্তু যখন দেখবে এসবই ছিল মিথ্যা ধোঁকা, প্রতারণা তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের অপরাধ জঘন্য, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ
عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۝٨٨ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي
كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا
عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝٨٩ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ
الْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٩٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝٩١

তরজমা

(৮৮) যারা কুফরী করেছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করে দেব। কেননা, তারা অশান্তি সৃষ্টি করতো।

(৮৯) আর যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝ থেকেই একজন সাক্ষী দাড় করাবো এবং (হে রসূল!) আমি আপনাকে তাদের উপর সাক্ষী হিসেবে আনবো, আর আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত। আর যারা হুকুম মেনে চলে তাদের জন্যে রয়েছে খোশ খবরী।

(৯০) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নির্দেশ প্রদান করেন সুবিচারের সদাচরণের এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার জন্যে, আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ এবং সীমা লঙ্ঘন এবং তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

(৯১) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের জামিন সাব্যস্ত করে শপথকে দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করোনা। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় তিনি সবই জানেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে সেই কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, যারা নিজেরা কুফরী ও নাফরমানী করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং অন্যদেরকে কুফরী ও নাফরমানীর কাজে প্ররোচিত করেছে এবং ইসলামের প্রচারে প্রসারে বাধা দিয়েছে, মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে, মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন উৎপীড়ন করেছে, সমাজ ও জাতীয় জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করেছে তাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

কোন কোন কাফেরের শাস্তি হবে দ্বিগুণ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ

"যারা কাফের হয়েছে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহ পাকের পথ থেকে বারণ করেছে তাদের এ দুষ্কৃতির কারণে আমি তাদের আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেব"। যেহেতু তারা দ্বিগুণ অপরাধ করেছে তাই তাদের শাস্তিও হবে দ্বিগুণ।

যেভাবে বেহেশতবাসীদের মর্তবায় পার্থক্য থাকবে ঠিক তেমনি দোযখেও দোযখীদের শাস্তির ব্যাপারে তারতম্য হবে, অপরাধ অনুযায়ী হবে শাস্তি। কুফরী এবং নাফরমানীর শাস্তি অবধারিত কিন্তু যারা শুধু নিজেরাই কুফরী করেনি, বরং অন্যদেরকেও কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত রেখেছে, নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই

তাদের শাস্তি হবে অধিকতর এবং কঠোরতর। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) দ্বিগুণ শাস্তির বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, তাদের জন্যে দোযখের স্বাভাবিক শাস্তির পাশাপাশি বিষাক্ত বিচ্ছু নিযুক্ত থাকবে, যারা এ কাফেরদের দংশন করতে থাকবে। ঐ বিচ্ছুগুলো এক একটি খেজুর গাছের মত বড় হবে।

এবনে মরদবিয়া (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত বারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। সাঈদ এবনে যোবায়ের বলেছেন, ঐ কাফেরদের দংশনের জন্যে বিষাক্ত সর্প থাকবে। এক একটি উষ্ট্রের ন্যায়, আর বিচ্ছু থাকবে এক একটি খচ্চরের ন্যায়। এ সর্প ও বিচ্ছু একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর একাধারে ব্যথা অনুভব হবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হল তীব্র গরমের শাস্তি থেকে তাদেরকে কঠিন ও চরম শীতের শাস্তি দেয়া হবে। আর যখন শীতের শাস্তি সইতে পারবে না এবং চিৎকার দিয়ে ফরিয়াদ করবে তখন অগ্নির শাস্তি দেয়া হবে। তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের يُفْسِدُوْنَ বাক্যটির তাৎপর্য হল, তারা শুধু যে নিজেরা শেরক ও কুফরে লিপ্ত থাকতো তাই নয়; বরং অন্যরা যেন ইসলাম কবুল না করে তজ্জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকতো। এর চেয়ে বড় ফ্যাসাদ বা অশান্তি আর কি হতে পারে!

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে কোন মন্দ কাজের পথ দেখায় সে ঐ মন্দ কাজের শাস্তি ভোগ করবে আর যারা তার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে মন্দ কাজ করবে তাদের অন্যায়ের শাস্তিও তাকে কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করতে হবে। ইমাম রাজী (রঃ) একথাও বলেছেন, যে বা যারা মানুষকে কুফরী ও নাফরমানীর কাজে আহবান জানাবে, তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। ঠিক এমনিভাবে যারা মানুষকে দ্বীন ইসলামের দিকে এবং ঈমান ও একীনের দিকে আহবান করবে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের মর্তবা বৃদ্ধি পাবে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

আর যেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী হাযির করব, আর তাদের উপর সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে (হে রসূল!) আপনাকে আনবো। (সেই ভয়াবহ দিনের কথা স্মরণ কর) আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা, রয়েছে হেদায়েত এবং রহমত। এবং যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে

সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন হবে অত্যন্ত ভয়ংকর, যেদিন প্রত্যেক নবী আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করবেন। প্রত্যেক নবী সেদিন তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের উপরে সাক্ষী হিসেবে আসবেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এ মর্মে সূরা নেসায় অন্য আরও একখানি আয়াত রয়েছে।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ.....الاية

"তখন তাদের কি অবস্থা হবে? যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হতেই তাদের উপর সাক্ষী দাড় করাবো আর (হে রসূল!) আপনাকে ঐ সাক্ষীগণের উপর সাক্ষী নিয়োগ করবো"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবার ঘোষণা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্তবার কথা ঘোষণা করেছেন এ মর্মে যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর তাঁদের সকলের উপর সাক্ষী হিসেবে আসবেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে দিয়ে সূরা নেসা পাঠ করালেন। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, পর্যন্তই থাক। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) দেখলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নয়ন যুগল অশ্রু সিক্ত হয়ে রয়েছে।

পবিত্র কোরআন পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

আর (হে রসূল!) আপনার নিকট কিতাব (পবিত্র কোরআন) নাযিল করেছি। আমি তাতে সব কিছুর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছি। পবিত্র কোরআনে রয়েছে সর্ব প্রকার এলম, হালাল-হারামের বিবরণ, অতীত ঘটনাবলীর বর্ণনা ও ভবিষ্যতের খবর, দ্বীন-দুনিয়ার কথা এবং জরুরী বিধি-নিষেধ সবই স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে। এখানে রয়েছে মানব মনের হেদায়েত এবং রহমত আর মোমেনদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ।[১]

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানুষের জন্যে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইহকাল ও পরকালীন জিন্দেগীতে চির সাফল্য অর্জনের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পবিত্র কোরআনে। কেয়ামতের দিন যা কিছু ঘটবে তার বিস্তারিত বিবরণও স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৫১

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক আদেশ দিচ্ছেন সুবিচার কায়েম করার, পরোপকারের, আত্মীয়-স্বজনকে দান করার, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ এবং দৌরাত্ম থেকে। তিনি তোমাদেরকে নছিহত করছেন হয়তো তোমরা নছিহত গ্রহণ করবে"।

সুবিচার ও পরোপকারের নির্দেশ

পূর্ববর্তী আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছিল যে, পবিত্র কোরআনে রয়েছে সব কিছুর বর্ণনা, এতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে হেদায়েত ও রহমত। পবিত্র কোরআন হল– একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান।

মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত সমস্যা দেখা দেয় সে সব সমস্যার সমাধান রয়েছে পবিত্র কোরআনে। মানুষের নৈতিক মান উন্নীত করার, যাবতীয় অন্যায়-অনাচার পরিহার করার তাগিদ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। মানবতার মনোন্নয়নে, মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ সাধনের নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আলোচ্য আয়াত খানি।

ইমাম রাজী (রঃ) বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক সকল কল্যাণকর কাজের নির্দেশ এ আয়াতের মাধ্যমে দিয়েছেন, ঠিক এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় অনাচার পরিহার করার আদেশও দিয়েছেন এ আয়াতের মাধ্যমে। আকীদা, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, নিয়ত, আদর্শ ও আমল, ভাল মন্দ ব্যবহার এক কথায় সবকিছুই এ আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাপকতার কারণেই হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ) জুমআর খুতবার শেষে এ আয়াত খানি যুক্ত করে দিয়েছেন। যাতে করে প্রতি সপ্তাহে সমগ্র মুসলিম জাহান সর্বত্র এ আয়াতখানি শ্রবণ করে এবং এর উপর আমল করতে সচেষ্ট হয়। হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ আয়াতখানি জুমআর খোতবার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[১]

শানে নুযুল

এ সম্পর্কে মসনদে আহমদে একটি বর্ণনা রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বাসস্থানের আঙ্গিনায় উপবিষ্ট ছিলেন, ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করছিলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, মাজউন তুমি

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১০০
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৮

বসবেনা? সে তখন বসে গেল, তিনি তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি আসমানের দিকে তাকালেন, এরপর ধীরে ধীরে তাঁর চক্ষুগুলো নীচে আসতে লাগল, এরপর তিনি তাঁর ডান দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেদিকেই মুখ করলেন, আর এভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যেন কারো নিকট থেকে কোন কিছু বুঝে নিচ্ছেন এবং কেউ তাঁকে কোন কথা বলছে। কিছুক্ষণ এ অবস্থা অব্যাহত ছিল। এরপর তিনি পুনরায় আসমানের দিকে তাকালেন। এরপর তিনি ওসমান এবনে মাজউনের দিকে মুখ করে বসে গেলেন। এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সে সবই দেখছিল, তাই সে জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনার নিকট ইতোপূর্বেও কয়েকবার আমি হাযির হয়েছি, কিন্তু আজ যা দেখেছি আগে কখনও তা দেখিনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখেছ? সে বলল, আমি দেখলাম আপনি আসমানের দিকে তাকালেন, এরপর নয়ন যুগলকে নীচের দিকে নিয়ে আসলেন, এরপর ডানদিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেদিকেই ঘুরে বসলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং এভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন যেন আপনি কিছু ভাল করে বুঝে নিচ্ছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আচ্ছা! তুমি সব কিছু দেখেছ? সে বলল, জ্বী-হ্যাঁ সবই দেখেছি। তিনি এরশাদ করলেন, আমার নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা এসেছিল। সে বলল, আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা। সে জিজ্ঞাসা করল, ঐ ফেরেশতা আপনাকে কি বলেছে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এ আয়াত পাঠ করলেন (অর্থাৎ তখনই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল)।

হযরত ওসমান এবনে মাজউন (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ ঐ মুহূর্তেই আমার অন্তরে ঈমান বসে গিয়েছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহব্বত এবং ভালবাসা অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল।[১]

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যত চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে তা অর্জনের এবং যত নৈতিকতা বিরোধী কাজ রয়েছে তা বর্জনের নির্দেশ রয়েছে এ আয়াতে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ সূরা নাহলের এ আয়াতখানি হল সব কিছুর সমন্বয়কারী। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলী আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয়, আর যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কাজ আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আকসাম এবনে সাইফি নামক এক গোত্রীয় সর্দার যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের খবর জানতে পারল তখন সে তাঁর খেদমতে হাযির

১। তফসীরে কবীর পারা-২০, পৃষ্ঠা-১০০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৫২

হওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু তার গোত্রের লোকেরা তাকে বাধা দিল। সে বলল, আমাকে তোমরা যেতে দেবেনা, ঠিক আছে, এমন লোক হাযির কর যে আমার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর খেদমতে হাযির হবে। দু' ব্যক্তির উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হল। তারা উভয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল এবং জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে এবং আপনার কাজ কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তারা বলল, আপনি দ্বিতীয়বার পাঠ করুন। তিনি পুনরায় এই একই আয়াত পাঠ করলেন। তারা আয়াত খানি মুখস্ত করল এবং আকসামের নিকট প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত খবর দিল এবং বলল, তিনি তাঁর বংশ মর্যাদার ব্যাপারে কোন গৌরব করেননি; শুধু নিজের এবং তাঁর পিতার নাম বলেছেন। কিন্তু তিনি অতি উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি। এরপর তিনি আমাদেরকে একথাগুলো শিক্ষা দিয়েছেন যা আমরা কণ্ঠস্ত করেছি। আকসাম এসব কথা শুনে বলল, তিনি তো অতি উত্তম কথা শিক্ষা দেন এবং মন্দ কথা থেকে বিরত রাখেন, যাবতীয় সৎ এবং মহৎ কাজের নির্দেশই তিনি দেন, সর্বপ্রকার নীচতা হীনতা বর্জনের তাগিদ করেন অতএব, হে আমার গোত্রের লোকেরা! তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে বিলম্ব করোনা, তাড়াতাড়ি কর। তাঁর ভাষায় ঃ

كونوا رؤساء ولا تكونوا فيه اذنابا

(তোমরা মাথা হও, লেজ হয়োনা।)

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আদেশ দিচ্ছেন সুবিচার কায়েম করার অর্থাৎ– তোমরা মানুষের প্রতি সুবিচার কর, পরোপকারে আত্মনিয়োগ কর এবং আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ সম্পদ দান কর। আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম আদেশ হয়েছে 'আদল' বা সুবিচার কায়েম করার– তথা মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড যেন সুবিচারের মানদন্ডে নির্ণিত হয়, কোন কাজেই যেন বাড়াবাড়ি না হয়, মানুষের কোন কাজ এবং কথায় যেন এদিক সেদিক না হয়, কোন বড় শত্রুর ব্যাপারেও যেন ন্যায় এবং ইনসাফের খেলাফ কিছু না হয়। মানুষ নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে অন্যের ব্যাপারেও যেন তাই পছন্দ করে। আর এটিই হল 'আদল' বা ইনসাফ। মানুষ নিজের কল্যাণ সাধনে যেমন তৎপর থাকবে, ঠিক তেমনি অন্যের কল্যাণ সাধনেও সক্রিয় থাকবে এবং অন্যের প্রতি উদারতা, ভদ্রতা, ইনসাফ বা সুবিচারের নীতি অবশ্যই গ্রহণ করবে।

মানুষ যা কিছু করে আল্লাহ পাক তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন এবং তিনি ভাল কাজের পুরস্কার দেবেন এবং মন্দ কাজের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেকটি মানুষের

যাবতীয় কর্মকান্ড আল্লাহ পাক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করছেন– প্রত্যেকটি মানুষকে একথার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ পাক সবই দেখছেন"।

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে সুবিচার কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুবিচারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম, বন্ধু এবং শত্রু সকলের জন্যে তাঁর ইনসাফ ছিল সমান।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে সুবিচার কায়েম করার তাগিদ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

হে মোমেনগণ! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, তোমরা আল্লাহ পাকের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হও, যদি সুবিচার কায়েম করার কারণে, তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, তবু তা কর। কখনো কখনো স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা অথবা কারো ভয়-ভীতি মানুষকে ন্যায় বিচারের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে স্বজন-প্রীতি ও আত্মীয়তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা, এ অবস্থায় "আদল" বা ন্যায়বিচার কায়েম করার আশা সুদূর পরাহত।

الْإِحْسَانِ

এহসান সম্পর্কে বোখারী শরীফে যে বর্ণনা রয়েছে তা হল এই–

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

'এহসান হল এই যে, তুমি এভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পার, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন'।

অতএব, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে কাজ করা এহসানের অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি এহসানের ব্যবহারিক অর্থ হল পরোপকার। অতএব, আয়াতের মর্মকথা হল– আল্লাহ পাক মানুষকে সুবিচার কায়েম করার এবং পরোপকারের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'আদল' শব্দটির দ্বারা তৌহিদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর 'এহসান' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরজ সমূহ আদায় করা বোঝানো হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এহসানের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এহসান হল শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে কাজ করা এবং দলিল হিসেবে তিনি উপরোক্ত হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, 'আদল' হল তৌহিদ এবং 'এহসান' হল মানুষকে ক্ষমা করা।

কোন কোন তত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'আদল' শব্দটি এ'তেদাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সর্ব ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করা। এমনিভাবে, আপন-পর, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার প্রতি সুবিচার কায়েম করা, সকলের কল্যাণ সাধন করা, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা।

وَإِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى

অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ সম্পদ দান করা। যারা দারিদ্র-পীড়িত তাদের প্রয়োজনের আয়োজন করা, তাদের সাহায্য করা। আলোচ্য আয়াতে এ তিনটি কাজ করার নির্দেশ রয়েছে (১) সুবিচার কায়েম করা। (২) পরোপকারে আত্মনিয়াগে করা বা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করা (৩) আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা, তাদের প্রতি দরদ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করা।

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

'আল্লাহ্ পাক নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ এবং দৌরাত্ম'।

এ আয়াতে যেমন তিনটি কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি তিনটি কাজের উপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে।

الْفَحْشَاۤءِ

অর্থাৎ অশ্লীল কাজ সমাজ ও জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে, ধ্বংসের বাণ ডেকে আনে। এজন্যে সকল যুগে, সকল দেশ ও পরিবেশে অশ্লীল কাজকে ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় মনে করা হয়েছে। অশ্লীলতার মাধ্যমে মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়, মানবতার মানহানি হয়। তাই কোরআনে করীম অশ্লীল কাজকে শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি; বরং দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে এ অপরাধের যে কঠিন-কঠোর শাস্তি হবে তারও ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

اَلْمُنْكَرِ

সেই মন্দ কাজ বা আচার-আচরণ যাকে শরীয়ত মন্দ বলে ঘোষণা করেছে এবং মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি তাকে হীন এবং মন্দ কাজ বলে মনে করেছে। যেমন চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই প্রভৃতিকে সকল যুগে এবং সকল পরিবেশে ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় মনে করা হয়েছে।

اَلْبَغْيِ

অর্থাৎ– অহংকার-প্রসূত দৌরাত্ম, সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি, মানুষের প্রতি অত্যাচার- উৎপীড়ন, জান-মাল, মান-সম্মান হরণ করার অপপ্রয়াস।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মানব চরিত্রের দু'টি দিক রয়েছে। একটি ফেরেশতা প্রকৃতি আরেকটি শয়তানী প্রবৃত্তি। যদি কোন মানুষ আত্ম-সংশোধনে ব্রতী না হয়, তাহলে তার মাঝে শয়তানী প্রবৃত্তি প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পাশবিকতার বহিঃপ্রকাশ হয় তার মাধ্যমে। এমনি অবস্থায় মানুষ জুলুম-অত্যাচার, অবিচার এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। মানবতার কণ্ঠ রোধ করতে, মানহানিকর কাজ করতে তার আর বাধে না।

পক্ষান্তরে, মানুষ যদি আত্ম-সংশোধনে প্রয়াসী হয়, তবে আত্ম-সংশোধনের মাধ্যমে আত্মোন্নতি লাভ করে। আত্মপ্রত্যয় অর্জন করে এবং এ সাধনা অব্যাহত থাকলে তথা আত্ম-সংশোধনের প্রয়াস জারী থাকলে মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে যা তাকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। আর এভাবেই মানব জীবন সার্থক এবং সুন্দর হয়। এজন্যেই মরমী করি বলেছেনঃ

ازبها ئم به دار از ملائك نيز هم = بگزر از حظ بهائم كز ملائك بگزرى

তোমার মাঝে ফেরেশতা প্রবৃত্তি রয়েছে আর রয়েছে পশু প্রবৃত্তি। তুমি পশু প্রবৃত্তি পরিহার কর, তাহলে ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন এসব অন্যায় অনাচার পরিহার করার মাধ্যমে ফেরেশতার চেয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভের তথা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার কর্মসূচী পেশ করেছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ সুফিয়ান এবনে উয়াইনাহ বলেছেন, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই হল "আদল"। আর জাহের থেকে বাতেন উত্তম হওয়া হলো "এহসান"।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২৭

ইমাম রাজী (রঃ) 'আদলের' ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আদল হলো তৌহিদের সাক্ষ্য প্রদান, আর এহসান হল ফরয সমূহ আদায় করা। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এহসান হল এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো এবং নিজের জন্যে যা পছন্দ কর অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করা। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, 'আদল' হল তৌহিদ, আর এহসান হল এখলাছ তথা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করা। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেনঃ আদল হয় কর্মের মাধ্যমে, আর এহসান হয় কথার মাধ্যমে। অর্থাৎ– যা সুবিচার নয় তা করোনা, আর যা এহসান নয় তা বলোনা। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার তাৎপর্য হল অর্থ সম্পদের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ছেলায়ে রেহমী করা। যদি অর্থ সম্পদ না থাকে তবে অন্ততঃ তাদের জন্যে দোয়া করা।[১]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে নির্দেশিত তিনটি কাজে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। আর যে তিনটি কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার ধ্বংস। এজন্যে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা, উন্নতি-অগ্রগতি উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। 'আদল' বা সুবিচারের শুভ পরিণতি হল বিজয়। আর 'এহসানের' সুফল হল সুখ্যাতি। আর ছেলায়ে রেহমীর উপকারীতা হল পরস্পরের মমত্ববোধ জাগ্রত হওয়া।

তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন যে, প্রথম তিনটি বিষয়ের মোকাবেলায় রয়েছে পরবর্তী তিনটি বিষয়। আদ্‌লের মোকাবেলায় ফাহশা (অশ্লীল কাজ) আর এহসানের মোকাবেলায় "মুনকার" (শরীয়ত বিরোধী কাজ) এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মোকাবেলায় হল "বাগয়্যু" (দৌরাত্ম, ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ)।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হল আয়াতুল কুরসী। ভাল মন্দের ব্যাপারে সর্বাধিক তাৎপর্যবহ আয়াত হলঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ......يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

যাবতীয় বিষয় আল্লাহ পাকের উপর সোপর্দ করার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হল–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আর পাপীদের অন্তরে সর্বাধিক আশা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকারী আয়াত হলঃ[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১০১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪৭

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এজন্যে নসিহত করছেন যেন তোমরা নসিহত গ্রহণ কর তথা আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ যেন তোমরা মেনে চল।

ইমাম বয়জাভী (রঃ) লিখেছেনঃ যদি এ আয়াত ব্যতীত পবিত্র কোরআনের আর কোন আয়াত না থাকতো তবুও এ আয়াতই মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যথেষ্ট হত এবং কোরআন করীমকে সব কিছুর বর্ণনাকারী বলে আখ্যা দেওয়া সত্য হত।[১]

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ

যখন তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হও, আল্লাহর নামের অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং তোমরা আল্লাহ্ পাককে তোমাদের জামিন করে নিজেদের শপথকে দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানেন।

অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ

পূর্ববর্তী আয়াতে নৈতিক মান উন্নীত করার এবং নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। আর এ আয়াতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে, কথার বরখেলাফ করার তথা বিশ্বাসঘাতকতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায়– পূর্ববর্তী আয়াতে 'আদল' বা ন্যায় বিচার কায়েমের আদেশ ছিল আর অঙ্গীকার রক্ষা করা তার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম জাতির উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে অঙ্গীকার রক্ষা করার গুরুত্ব সমধিক। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার রক্ষার তাগিদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاؕ

অর্থাৎ– তোমরা যখন আল্লাহর নামে শপথ কর, কারো সাথে সন্ধি চুক্তি কর, কোন বিষয়ে অঙ্গীকার কর, তখন আল্লাহ্ পাকের নামের মর্যাদা রক্ষা করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অঙ্গীকার যার সাথেই করা হোক না কেন, ধনী হোক বা দরিদ্র, মুসলমান বা অমুসলিম যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয় তবে অবশ্যই অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। বিশেষতঃ আল্লাহ্ পাকের নামে যখন শপথ করে অঙ্গীকার করা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহ্ পাককে জামিন রাখা হয়। অতএব, অঙ্গীকার রক্ষা করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২৭

এবনে জরীর হযরত বোরায়দা (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বয়আত গ্রহণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عهد শব্দটি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শা'বী (রঃ)-ও একই কথা বলেছেন।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝

নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত।

অর্থাৎ- তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর বা ভঙ্গ কর এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক পূর্ণ ওয়াকেফহাল। কেননা, যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কেয়ামতের দিন তাদেরকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي
نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا
بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝٩٢ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ
يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٩٣ وَلَا
تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا
السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٩٤

তরজমা

(৯২) আর তোমরা সে নারীর মত হয়োনা যে পরিশ্রম করে সুতা কাটার পর তা খন্ড খন্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্যে তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করে থাক, যেন এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পার। আল্লাহ পাক এর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তা অবশ্যই স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেবেন।

(৯৩) আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদেহী করতে হবে।

(৯৪) আর তোমরা তোমাদের শপথকে পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্যে ব্যবহার করোনা। যদি তা কর তবে পা স্থির হওয়ার পর হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার শাস্তি তোমরা অবশ্যই ভোগ করবে, তোমাদের জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

শানে নযুল

এবনে আবি হাতেম আবু বকর এবনে হাফসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কায় সাদীদা আসাদীয়া নাম্নী এক পাগল স্ত্রীলোক ছিল। সে সারাদিন সুতো কেটে সন্ধ্যার সময় সব ছিঁড়ে ফেলতো। আলোচ্য আয়াতে তার সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কালবী এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এই পাগল মেয়ে লোকটির নাম ছিল রবতা বিনতে আমর এবনে সাআদ এবনে কা'ব এবনে যায়েদ এবনে মানাফ এবনে তামীম। এ মহিলাটি অত্যন্ত নির্বোধ এবং পাগলও ছিল। তার খেতাব ছিল জাআর। সে সারা দিন সুতো কাটতো। তার বাঁদীরাও এ কাজ করতো। সন্ধ্যা পর্যন্ত যা সুতা তৈরী হত সেগুলোকে খন্ড খন্ড করে কেটে ফেলতো। এটিই ছিল তার প্রতি দিনের নিয়মিত কাজ। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ط

আর তোমরা সে স্ত্রী লোকটির মত হয়োনা, যে পরিশ্রম করে সুতো কাটার পর খন্ড খন্ড করে ছিড়ে ফেলে, সারা দিন পরিশ্রম করে সে সুতো তৈরী করে এবং এরপর নিজেই খন্ড খন্ড করে ছিড়ে ফেলে, সে যেমন তার পরিশ্রমকে পন্ড করে তার দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায় যে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, যে মানুষকে কথা দিয়ে কথার বরখেলাফ কাজ করে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করোনা। অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি এমন হালকা ব্যাপার নয় যে, যখন ইচ্ছা অঙ্গীকার করলাম আর যখন ইচ্ছা ভঙ্গ করলাম। যদি মানুষের কথার দাম না থাকে তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা অচল হতে বাধ্য।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২৮
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪৮

বস্তুতঃ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তার কথা ও কাজ হবে এক। কথা দিয়ে তার বরখেলাফ করবেনা। সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মানবতা বিরোধী কাজ। এজন্যে পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ

এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে শপথ সমূহকে তোমরা বাহানা বানাও, বর্বরতার যুগে আরবরা প্রতিপক্ষকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে শান্তি চুক্তি করত, অঙ্গীকারাবদ্ধ হত। কিন্তু যখন ইচ্ছা তা ভঙ্গও করতো। অঙ্গীকারকে শুধু একটি বাহানা হিসেবেই ব্যবহার করতো।

আলোচ্য আয়াতে এমনি কাজকে অন্যায় অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মসনদে আহমদে রয়েছেঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তা পূর্ণ করার ইচ্ছা না রাখে তার দৃষ্টান্ত হল সে ব্যক্তির ন্যায় যে তার প্রতিবেশীকে নিরাপত্তা দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে এবং প্রতিবেশীকে ধমকি দেয়, তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।

বর্বরতার যুগের আরবরা যেভাবে মানুষকে কথা দিয়ে তার বরখেলাফ করতো, আধুনিক কালেও একই অবস্থা বিরাজমান। মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করা বর্তমান যুগে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ যুগে ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই অঙ্গীকার করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে এবং এ আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তোমরা দুর্বল সম্প্রদায়ের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ কর এবং শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সাথে অঙ্গীকার রক্ষা কর শুধু এজন্যে যে, যেন তোমরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পার, অথচ তোমাদের এমন আচরণ করা উচিত নয়।

অথবা আয়াতের অর্থ হল তোমরা তোমাদের শপথকে অশান্তি সৃষ্টির বাহন করছো। তোমাদের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে অর্থ সম্পদে শক্তিশালী হওয়ার কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে তুচ্ছ মনে কর, যেভাবে ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফেররা মুসলমানদের সাথে দশ বছরের জন্যে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করেছিল; কিন্তু তাদের অধিকতর শক্তি থাকার কারণে ঐ বছরই তারা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২৮

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর সঙ্গে রোম সম্রাটের শান্তি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) সৈন্য বাহিনীকে সীমান্তে প্রেরণ করেন। যাতে করে চুক্তি শেষ হওয়ার পরদিন ভোরে মুসলিম বাহিনী রোমানদের এলাকায় প্রবেশ করে এবং দুশমন কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে। পরিকল্পনা মোতাবেক মুসলিম বাহিনী পরদিন অতি প্রত্যুষে অভিযান শুরু করে। এ খবর পেয়ে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর এবনে আম্বাসা (রাঃ) হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে মোয়াবিয়া (রাঃ)! অঙ্গীকার রক্ষা কর, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে আত্মরক্ষা কর। আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যদি শান্তি চুক্তি হয় তবে চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করা বৈধ নয়। চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পর অভিযান করতে হলে প্রতিপক্ষকে চুক্তির অস্তিত্ব নেই বলে জানিয়ে দিতে হবে। এদিকে মুসলিম বাহিনী রোমানদের এক বিরাট এলাকা এরই মধ্যে দখল করে ফেলেছে।

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস শ্রবণের পর তার বরখেলাফ করা কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভবই নয়, তাই দেখা যায় হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁর সৈন্য বাহিনীকে দখল করা এলাকা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। এভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করা হল।[১]

وَلَا تَتَّخِذُوٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আয়াতের অর্থ হল যারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত করেছে তথা ঈমানের অঙ্গীকার করেছে তারা যেন এ অঙ্গীকার বিনষ্ট না করে। যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা পথভ্রষ্ট হয়।[২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন অঙ্গীকার করে অথবা কোন প্রকার এবাদত শুরু করে তবে তা পূর্ণ করা তার কর্তব্য। আর এজন্যেই ফকীহগণ আলোচ্য আয়াতের আলোকে এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, কোন নফল এবাদত শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।[৩]

বর্তমান বিশ্ব যদি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত অঙ্গীকার রক্ষা করার এ আদেশ মেনে চলতো তবে বিশ্ব শান্তি অবশ্যই কায়েম হত। আজকের বিশ্বে যে অশান্তি

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১১০
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬৮

অকল্যাণ এমনকি, অরাজকতা বিরাজমান তার অবসান ঘটতো। বিশ্ববাসী যত শীঘ্র এ সত্য উপলব্ধি করবে তথা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করবে ততই তার জন্যে কল্যাণকর হবে।

পবিত্র কোরআনে বিশ্ব শান্তি স্থাপনের যে দিক-নির্দেশনা রয়েছে তার বাস্তবায়নের জন্যে অঙ্গীকার রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দু' জাতি বা দু' রাষ্ট্রের মধ্যে যখন কোন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, একে অন্যকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, সে প্রতিশ্রুতি যেন অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হয়। এমনি তাগিদ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

"আর তোমরা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। নিশ্চয় ওয়াদা সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ওয়াদা রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। কেননা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি রক্ষার জন্যে এমনকি, বিশ্ব শান্তির জন্যে এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। আজকের বিশ্বে একদিকে শান্তি চুক্তি করা হয়, অন্যদিকে গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতিও চলতে থাকে। শান্তি চুক্তিকে শুধু যে যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় অবকাশের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয় তাই নয়; বরং শান্তি চুক্তিকে একটি বাহানা হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য আয়াতে ঠিক এ বিষয়টির উপরই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে-

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

"আর তোমরা তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণা হিসেবে ব্যবহার করোনা"।

বস্তুতঃ যেহেতু পবিত্র কোরআন এ দুর্নীতি আদৌ সমর্থন করেনা, তাই কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে বারে বারে।

এখন প্রশ্ন হল মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের নির্দেশ মেনে অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। কিন্তু যদি অপর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার আশঙ্কা থাকে, তবে কী করণীয়? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন-

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ

(সূরা আনফাল)

"আর যদি তোমরা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার বাতিল কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক খেয়ানত কারীদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না"।

ইসলাম অঙ্গীকার রক্ষার উপর কত বেশী গুরুত্বারোপ করে তা এ পর্যায়ে প্রণীত নীতিমালার উপর দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমান করা যায়।

অঙ্গীকার রক্ষা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব

একজন সাধারণ মুসলমান যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত শত্রু পক্ষের কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, তার সাথে কোন প্রকার অঙ্গীকার করে এমন অবস্থায় শান্তির বৃহত্তর প্রয়োজনে সকল মুসলমানের প্রতি সে অঙ্গীকার রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়। এটি ইসলামী সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান বাণী বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ অপর পক্ষের সাথে অঙ্গীকার করার ব্যাপারে সকল মুসলমানের দায়িত্ব সমান। মুসলমানদের মধ্যে যে কোন সাধারণ লোক প্রতিপক্ষের সাথে অঙ্গীকার করতে পারে এবং দুশমনকে আশ্রয় দিতে পারে।

এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানি বিনতে আবি তালেব তাঁর দু'জন আত্মীয়কে আশ্রয় দিলেন। অঙ্গীকার করলেন তাদের নিরাপত্তার। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভাই হযরত আলী (রাঃ) এ অঙ্গীকার মেনে নিতে প্রস্তুত হলেন না। ঘটনা পেশ করা হল প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে। তিনি সকল বক্তব্য শ্রবণ করে এরশাদ করলেনঃ উম্মে হানি! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

এভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার পথ-নির্দেশ করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۝

"আল্লাহ পাক এর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছো কেয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবেন"।

মূলতঃ এ পৃথিবী একটি বিশাল ও বিরাট পরীক্ষা কেন্দ্র। আল্লাহ পাক তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করছেন। কেয়ামতের দিন তিনি এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি, দল, সমাজ এবং জাতিকে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা

রক্ষা করা হয় কি-না তা লক্ষ্য করছেন। যারা ওয়াদা রক্ষা করবে তাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে, আর যারা ওয়াদা ভঙ্গ করবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً

"আর আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদেহী করতে হবে"।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো তবে পৃথিবীর সব মানুষ মোমেন হয়ে যেত, ইসলামের ব্যাপারে সকলে একমত হতো, সকলেই আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতো, পরস্পরের মধ্যে কোন বিভেদ থাকতো না। আর পথভ্রষ্ট করার অর্থ কোন প্রকার সাহায্য না করা। আর হেদায়েত করার তাৎপর্য হল, ঈমানের তোফিক দেয়া। আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিতও করেন। যদি আল্লাহ্ পাকের মর্জি হতো তবে তিনি সকলকে একই পথের পথিক করে দিতেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। মানুষ যেন সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করাতে তার বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করে, আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে পুরস্কার লাভ করে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে অঙ্গীকার রক্ষা করার শিক্ষা রয়েছে এবং কোন অবস্থাতেই যেন কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা হয়, এর তাগিদ রয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে অঙ্গীকার রক্ষায় এবং ঈমান আনয়নে একত্রিত করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই কার্যকর হয়, এ পৃথিবী মানুষের পরীক্ষাগার এবং এটিই কর্মক্ষেত্র। মানুষকে নিজের বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করে জীবন যাপন করতে হবে। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনেই পরকালীন চিরস্থায়ী জীন্দেগীর সম্বল সংগ্রহ করতে হবে। তাই এরশাদ হয়েছে—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

(সূরা হাশর)

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর প্রত্যেকেরই দেখা উচিত যে, সে পরকালের জন্যে কি করে পাঠিয়েছে"।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪২৯

আরও এরশাদ হয়েছে–

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

(সূরা মুজ্জাম্মেল)

"আর তোমরা যা কিছু করে পাঠাবে তা অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিকট পাবে"। আরও এরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۞ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

"যে ক্ষুদ্রতম নেক আমলও করবে সে তার শুভ পরিণতি বা সওয়াব দেখতে পাবে। আর যে সামান্যতম মন্দ কাজও করবে, তাও দেখতে পাবে"।

অতএব, আল্লাহ পাক এ পৃথিবীতে মানুষকে কর্মের সুযোগ দিয়েছেন। যারা ঈমানদার হবে, নেক আমল করবে তারা এর শুভ পরিণতি বা সওয়াব লাভ করবে। পক্ষান্তরে, যে মন্দ কাজ করবে সে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ

"আর তোমরা তোমাদের শপথকে নিজেদের মধ্যে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করোনা"।

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে শপথ এবং অংগীকার করা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এ মর্মে যে, প্রতারণার উদ্দেশ্যে কখনও শপথ করোনা। অঙ্গীকার করেও ভঙ্গ করলে তা প্রতারণার শামিল হবে। তাই কোন অবস্থাতেই এমন গর্হিত কাজ করোনা, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করোনা।

আলোচ্য আয়াতে دخلا শব্দটি অশান্তি, ফেতনা-ফ্যাসাদ এবং ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ– তোমাদের শপথের মাধ্যমে প্রতারণা করোনা, পরস্পরের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। কেননা যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকার করবে, তারা তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে এবং তোমাদের ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত থাকবে। কিন্তু এরপর যদি তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ কর এবং তোমাদের শপথকে প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার কর তবে জাতির বদনাম হবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মাধ্যমে যে হীনমন্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে তার কারণে অনেকেই ঈমান আনয়নে বিরত থাকবে। অর্থাৎ অন্যদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তোমাদের আচরণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এর ভায়াবহ পরিণাম তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে।

فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا

এটি আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ বাক্য। যদি কোন ব্যক্তি নিরাপদে থাকার পর

বিপদগ্রস্ত হয় বা শান্তি ও আরামে থাকার পর গর্তে পতিত হয়, তথা বিপদগ্রস্ত হয় তখন এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকে বাইআত করা এবং ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা হলো সঠিক রাজপথ। আর ইসলাম থেকে সরে যাওয়া হল বিভ্রান্ত হয়ে গর্তে পতিত হওয়া। অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করেছে তারা সেই বিপদগ্রস্ত পথিক যে পথহারা হয়ে গর্তে পতিত হয়েছে।

وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'আর তোমাদের জন্যে রয়েছে কঠিনতর শাস্তি।'

এর একটি কারণ হলো অঙ্গীকার ভঙ্গ করার গুনাহর শাস্তি। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান যখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তখন মানুষ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ঈমান আনয়নে বিরত থাকবে। এজন্যে এমন ব্যক্তিদের শাস্তি হবে কঠিনতর। এ শাস্তি হবে আখেরাতে।

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ
الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ
سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ
عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا
آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن
رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

তরজমা

(৯৫) আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করোনা। আল্লাহ্ পাকের নিকট যা আছে শুধু তাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(৯৬) তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর অবলম্বন করে আমি তাদেরকে তাদের আমলের চেয়েও উত্তম প্রতিদান অবশ্যই দেব।

(৯৭) নর হোক কী নারী ঈমানদার অবস্থায় যদি কেউ সৎ কাজ করে আমি তাকে উত্তম জীবন এবং তাদের আমল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।

(৯৮) (হে রসূল!) আপনি যখন কোরআন পাঠ করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় নেবেন।

(৯৯) নিশ্চয় শয়তানের কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

(১০০) শয়তানের আধিপত্য শুধু তাদের উপর চলে, যারা তাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।

(১০১) আর আমি যখন একটি আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত পরিবর্তন করি আর আল্লাহ্ পাক ভাল করেই জানেন যা তিনি নাযিল করেন, তখন তারা বলে– তুমি তা রচনা করছো। মূলতঃ তাদের অধিকাংশ লোক কিছুই জানেনা।

(১০২) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আপনার প্রতিপাকের নিকট থেকে রূহুল কুদুস জিব্রাঈল সত্য সহ কোরআন নাযিল করেছে। যারা মোমেন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং আত্মসমপর্ণকারীদের জন্যে হেদায়েত ও সুসংবাদ স্বরূপ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পরস্পরের মধ্যকার অঙ্গীকার রক্ষা করার শিক্ষা ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

'আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের বিনিময়ে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করোনা।' অর্থাৎ– অর্থ লোভের বশীভূত হয়ে তথা পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তোমরা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার বিক্রয় করোনা, ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কোন বিধান প্রবর্তন করোনা, কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ বা হীন অর্থ–লোভ অবশেষে

তোমাদের মহা বিপদের কারণ হতে পারে। অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে কৃত বাইআত অর্থ-সম্পদের লোভে ভঙ্গ করোনা।

إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۝

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের নিকট যা আছে তা নিঃসন্দেহে অতি উত্তম। কেননা আখেরাতের নেয়ামত অতুলনীয় যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর'।

অঙ্গীকার রক্ষার যে প্রতিদান বা সওয়াব আল্লাহ্ পাকের নিকট রয়েছে তা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মাধ্যমে লব্ধ অর্থের তুলনায় অনেক বেশী। এতদ্ব্যতীত আরও একটি সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط

'যা তোমাদের নিকট রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহ্ পাকের নিকট যা আছে তা কোনদিন শেষ হবে না'।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের রহমতের ভান্ডার কখনও শেষ হবেনা। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে পছন্দ করে সে তার নিজের আখেরাতের ক্ষতি করে। আর যে আখেরাতকে পছন্দ করে সে নিজের দুনিয়ার ক্ষতি করে। অতএব, তোমরা যা স্থায়ী তাকে প্রাধান্য দাও সেই জিনিষের উপর যা অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবং তোমরা আখেরাতকে পছন্দ কর, দুনিয়ার পরোয়া করোনা।[১] (হাকেম, আহমদ)

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের পার্থক্য সুস্পষ্ট। দুনিয়ার সুখ-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য-এক কথায় সব কিছুই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে, আখেরাতের যাবতীয় নেয়ামত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার নেয়ামত যত প্রচুরই হোক না কেন তা সীমিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত অনন্ত অসীম। দুনিয়ার নেয়ামত যে কোন সময় শেষ হতে পারে কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত কোন দিন শেষ হবার নয়। অতএব, চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে ক্ষণস্থায়ী সুখ-সামগ্রী গ্রহণ করা সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনার পরিচায়ক নয়। যারা আখেরাতকে উপেক্ষা করে এবং এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সুখ-সামগ্রী আহরণে ব্যস্ত হয়, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধকে অমান্য করে, তারা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩০

অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়, তাদের শাস্তি অনিবার্য।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

'আর যারা সবর অবলম্বন করে আমি তাদেরকে তাদের আমল অপেক্ষাও উত্তম প্রতিদান দেব'।

অর্থাৎ– যারা সত্যকে গ্রহণ করে এবং তার উপর সুদৃঢ় থাকে, আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যাবতীয় লোভ-লালসা পরিহার করে এবং এজন্যে সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়না, বরং জুলুম অত্যাচার সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, আল্লাহ পাক তাদেরকে অশেষ সওয়াব দান করবেন, তাদের কৃতকর্মের চেয়ে অধিকতর সওয়াব বা শুভ পরিণতি তারা লাভ করবে। প্রত্যেক নেকীর সওয়াব দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج

(নর হোক কী নারী যে কেউ-ই ঈমানদার অবস্থায় নেক আমল করবে আমি তাকে উত্তম জীবন দান করবো।)

উত্তম জীবন প্রদানের ঘোষণা

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে উত্তম জীবন প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। যারা ঈমানদার এবং নেককার তাদের উদ্দেশ্যেই এ ঘোষণা। যারা নেক আমল করে তারাই নেককার। কিন্তু কোন নেক আমলই আল্লাহ পাকের দরবারে ঈমান ব্যতীত কবুল হয়না। কেননা আমলের প্রাণ হলো ঈমান। প্রাণহীন দেহ যেমন অকেজো, ঠিক তেমনি ঈমানহীন নেক আমলও আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে ঈমান এবং নেক আমলের উপর। আমল যদি আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হয় তবে আল্লাহ পাকের দরবারে তার মূল্য অপরিসীম। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল– জীবন-সাধনার সাফল্যে নর-নারী উভয়েরই সমান মর্যাদা। কোরআনে করীমের দৃষ্টিতে কী নারী কী পুরুষ যে কেউ মোমেন অবস্থায় সৎ কাজ করবে, আল্লাহ পাকের দরবারে তার পুরস্কার সুনিশ্চিত। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

(আর আমি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবো এমনকি, যা হবে তাদের কৃতকর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর।)

وَهُوَ مُؤْمِنٌ এ শর্তে যে সে মোমেন হবে। ঈমান থাকার শর্ত এজন্যে আরোপ করা হয়েছে যে, কাফের ব্যক্তি যত নেক কাজই করুক, কোন সওয়াবের অধিকারী হবেনা। বড়জোর এতটুকু আশা করা যেতে পারে যে, আযাব সামান্য লাঘব হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ পাকের নিকট সওয়াব নির্ভর করে এখলাছ বা আন্তরিকতার উপর। কিন্তু কাফেরের নেক কাজের মধ্যে এখলাছ পাওয়া যায় না।

উত্তম জীবনের ব্যাখ্যা

"উত্তম জীবন" বলতে বোঝায় হালাল রিয্‌ক অথবা কানাআত বা অল্পে সন্তুষ্টি। মোকাতেল, এবনে হাব্বান (রঃ) বলেন, আল্লাহ্ পাকের অনুগত হয়ে জীবন যাপন নছীব হওয়াই হল উত্তম জীবন। আবু বকর ওয়াররাক বলেন, আনুগত্যের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বাদ লাভ হওয়াকে উত্তম জীবন বলা হয়। আল্লামা বয়যাবী (রঃ) বলেন, পবিত্র ও স্বচ্ছ জীবনই হল উত্তম জীবন। নেককার ব্যক্তি যদি বিত্তবান হয় তবে তার জীবন হবে পবিত্র এবং আনন্দময়। কেননা, নেককার ব্যক্তি যদি বিত্তবান এবং সচ্ছল হয় তবে স্বভাবতই তার পার্থিব জীবন উত্তম হবে। আর যদি নেককার ব্যক্তি বিত্তহীন হয় তবে স্বভাবতই সে অল্পে সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহ্ পাকের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পরকালের অশেষ পুরস্কারের আশা করবে। এভাবে তার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হতে থাকবে। কিন্তু কাফেরের জীবন এর বিপরীত হয়ে থাকে। যদি সে দরিদ্র হয় তবে তার জীবন দুঃখময় হয় এবং যদি বিত্তবান হয় তবে তার সম্পদ হারানোর ভয় সব সময় লেগেই থাকে। ফলে লোভ-লালসায় আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকে। এভাবে তার জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

আল্লাহ পাকের সাথে নেককার বন্দার অফুরন্ত মহব্বত থাকে। সুতরাং আল্লাহর তরফ থেকে দুঃখ বা সুখ যা কিছুই তার কাছে পৌঁছে তাতেই সে অপূর্ব স্বাদ ও আনন্দ লাভ করে থাকে। হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, প্রিয়তমের তরফ থেকে যে দুঃখ আসে তা তাঁর তরফ থেকে প্রাপ্ত সুখের চেয়েও অধিকতর প্রিয় হয়। কেননা, ঐ দুঃখের মাঝে প্রিয়তমের সন্তুষ্টির অন্বেষণ থাকে। আর সুখের মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দ অন্তর্ভুক্ত হয়। যে সত্যিকার প্রেমিক, যে আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত আশেক তার নিকট আল্লাহ্ পাকের মর্জিই সবচেয়ে প্রিয় বস্তু।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (রঃ) حيوة طيبة (উত্তম জীবন) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর ওলীদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন–

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ– তাদের দুনিয়ার জীবনে রয়েছে সুসংবাদ, মোমেন তার জীবনে যখন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের এ সুসংবাদ লাভ করে এবং তার মর্তবা বুলন্দ হবার খোশখবরী পায়, তখন সে দুনিয়াতেই আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত এবং শান্তি লাভে ধন্য হয় যা জান্নাতে লাভের পর সে আশা করেছিল।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক জান্নাতের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি রাজী হয়েছ? জান্নাতবাসীগণ আরজ করবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! রাজী না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? তুমি আমাদেরকে এমন নেয়ামত দান করেছ, যা আর কাউকে দান করনি। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, "আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও বড় নেয়ামত দান করব"? এরপর এরশাদ করবেন, "আর তা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি দান করছি। এরপর আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না"।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। এ মর্মের হাদীস হযরত যাবের (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

শেখ মোহাম্মদ আবেদ মুজাদ্দেদী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ দুনিয়াত্যাগী আল্লাহ ওয়ালাগণ যে আনন্দ এবং আরাম ও প্রশান্তি দুনিয়াতে লাভ করেন, তার খবর যদি রাজা বাদশাহ ও আমীর ওমরাহ গণের নিকট পৌঁছে তবে তারা আল্লাহ ওয়ালাগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে যদি দুনিয়াতে আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ হয় তবে–

الايمان بين الخوف والرجاء

'ঈমান হল ভয় ও আশার মাঝখানে'– একথার কি তাৎপর্য?

যদি ভয়ই না থাকলো তবে ঈমান কিভাবে থাকবে? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, আল্লাহ ওয়ালাগণ যে শান্তি এবং আনন্দ লাভ করেন তা হল– আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাদের গভীর ভালবাসা এবং তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার শুভ পরিণতি স্বরূপ। আর এ অবস্থা ভয়ের বিরোধী নয়। কেননা ভয় হল আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং তাঁর অসীম ক্ষমতার কারণে। এজন্যে মোমেনের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় কখনও দূরীভূত হয় না। এমনকি, আম্বিয়ায়ে কেরাম যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের পরিপূর্ণ একীন থাকে এবং যাঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রিয়, পছন্দনীয় এবং মনোনীত হন, আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের উপলব্ধি যাঁদের সর্বাধিক, অন্য মোমেন অপেক্ষা তাঁদের অন্তরে আল্লাহর ভয় অধিকতর থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'আমি আল্লাহ্ পাককে তোমাদের চেয়ে অধিক জানি আর তোমাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে তাঁকে ভয় করি'।

সাহাবায়ে কেরামকে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের এবং জান্নাত ও জান্নাতের অধিবাসী হবার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তাঁদের সম্পর্কে

এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক মোমেনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা (হে রসূল!) বৃক্ষতলে আপনার নিকট 'বাইআত' করছিল।'

সাহাবায়ে কেরামকে এমনি নিশ্চিত সুসংবাদ দেয়ার পরও তাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকতেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামেরই যখন এ অবস্থা ছিল তখন অন্যদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর উত্তম জীবন এমন জীবন হতে পারে যা হবে কল্যাণকর।

মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের ব্যাপার অত্যন্ত বিস্ময়কর, তার প্রত্যেকটি কাজই কল্যাণকর। মোমেন ব্যতীত এ সুযোগ আর কারো নেই। যদি মোমেন কোন প্রকার শান্তি, আরাম বা আনন্দ লাভ করে তবে সে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে। আর তা তার জন্যে হয় কল্যাণকর। পক্ষান্তরে, যদি কোন কারণে সে দুঃখিত হয় তবে সে সবর অবলম্বন করে। আর ঐ সবর তার জন্যে কল্যাণকর হয়। (আহমদ, মুসলিম)

মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, "হায়াতে তায়্যেবা" বা উত্তম জীবন দ্বারা জান্নাতের জীবনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হাসান বসরী (রঃ) একথাও বলতেন, জান্নাত ব্যতীত দুনিয়াতে কোন লোকের জীবনই উত্তম হতে পারে না।

যাহোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে উত্তম জীবনের যে অর্থই গ্রহণ করা হোক প্রকৃত মোমেনের সুখময় জীবন-যাত্রা এ দুনিয়াতেই আরম্ভ হয়ে যায় এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সাথে এর ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তার পরিপূর্ণতা আসে। আর সেই পরিপূর্ণ এবং পূর্ণ পরিণত, আনন্দঘন, নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত জীবনকেই উত্তম জীবন বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরও বলেছেন, যে জীবনে মৃত্যু নেই, যে জীবনে দারিদ্র নেই, যে জীবনে কোন প্রকার রোগ ব্যাধি নেই, যে জীবন ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং চিরস্থায়ী, যে জীবনে সৌভাগ্য ব্যতীত দুর্ভাগ্যের চিহ্ন মাত্র নেই, আলোচ্য আয়াতে সে জীবনকেই 'হায়াতে তায়্যেবা' বা উত্তম জীবন বলা হয়েছে।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۝

(যখন পবিত্র কোরআন পাঠ কর তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ কর।)

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককারদের জন্যে সুসংবাদ ছিল। আর নেক কাজ তারাই করতে পারে যারা শয়তানের ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

অথবা একথা বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে নেক আমলের উল্লেখ ছিল আর পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতই উত্তম আমল এবং আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

خيركم من تعلم القران وعلمه

অর্থাৎ– "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে পবিত্র কোরআন নিজে শেখে এবং অন্যকে শেখায়"।

ইতোপূর্বে নেক আমলের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেক আমল তার ঘোষণা দেয়া হয়েছে যাতে করে গাফলতের কারণে কেউ এ নেক আমল থেকে বঞ্চিত না হয়। এজন্যে কিছু নিয়ম-কানুনও ঘোষণা করা হয়েছে।

সত্য-সাধনায় তথা ভাল কাজে যত বাধা আসে তা শয়তানের তরফ থেকেই আসে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের ন্যায় উত্তম কাজে শয়তান নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেনা, মানুষ যেন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করতে না পারে সেজন্যে শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করবে, এটিই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন–

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ– "যখন তুমি পবিত্র কোরআন পাঠ করার ইচ্ছা কর তখন শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর"। আর আত্মরক্ষার সর্বোত্তম পন্থা হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করা। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার পূর্বে আল্লাহ্ পাকের নিকট আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে দোয়া করা উচিত যেন শয়তান তেলাওয়াতের সময় কোন প্রকার প্ররোচনা দিতে না পারে এবং তেলাওয়াতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি না হয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াতের পূর্বে দোয়া করতেন, তথা আউযুবিল্লাহ পাঠ করতেন। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একমত। তবে তাঁদের মতে, তেলাওয়াতের পূর্বে আউযবিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। আর তফসীরকার আতা (রঃ) তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব বলেছেন এবং দলিল হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত

পেশ করেছেন। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম তেলাওয়াত করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব মনে করেন না। কেননা, কখনো কখনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করেননি। আর এ কারণেই কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ না করা বৈধ। আর অনেক হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আউযুবিল্লাহ পাঠ না করেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেছেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠে বসলেন এবং সূরা আলে এমরানের শেষ দশটি আয়াত ان فى خلق السموت থেকে لاولى الالباب পর্যন্ত পাঠ করলেন এবং দন্ডায়মান অবস্থায় অযূ করলেন। মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির ছিলাম, হঠাৎ তাঁর গাফলত এসে গেল। একটু পর তিনি মুচকি হেসে মাথা উত্তোলন করলেন। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মুচকি হাসার কারণ কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম সহ সূরা কাউসার তেলাওয়াত করলেন।[১]

যেহেতু আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ পাঠ করার আদেশ রয়েছে- এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পবিত্র কোরআন পাঠ করার পূর্বে কি আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে হবে? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এ মত পোষণ পোষণ করেছেন যে, শুধু প্রথম রাকাতে কেরাত শুরু করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, প্রত্যেক রাকাতেই আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে হবে। শায়খ এবনে হাজার (রঃ) লিখেছেন যে হাসান বসরী (রঃ), আতা (রঃ) এবং এবনে সীরিন (রঃ)-এর মতে, প্রত্যেক রাকাতে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, ফরজ নামাজে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা অনুচিত। তফসীরকার বয়যাভী (রঃ) ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতের সমর্থনে এ দলিল পেশ করেছেন, যখন কোন আদেশ কোন শর্তের ভিত্তিতে জারি হয় তখন যতবার সে শর্ত পাওয়া যাবে ততবার ঐ হুকুম জারি হবে। তাই যে রাকাতে কোন ব্যক্তি যখন কেরাত পাঠ করবে তখন তাকে আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে হবে তা প্রথম রাকাত হোক বা দ্বিতীয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩৩-৩৪

ইমাম মালেক (রঃ) তাঁর অভিমতের পক্ষে দলিল হিসেবে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাজ আদায় করেছি এবং হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-এর পেছনে নামাজ আদায় করেছি। তাঁরা উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করার সময় সূরা ফাতেহা দিয়ে নামাজ শুরু করতেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত অন্য একটি বর্ণনা হল তাঁরা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' দ্বারা নামাজ শুরু করতেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হয়েছে যে প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে আউযুবিল্লাহ পাঠ না করা একথার প্রমাণ বহন করেনা যে তাঁরা নীরবে পড়েননি। এবনুস সুন্নী ও এবনে মাজাহ হযরত যোবায়ের এবনে মুতএম (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ আদায় করতেন তখন তিনবার আল্লাহু আকবার কাবীরান, তিনবার আলহামদুল্লিাহি কাসীরান এবং তিনবার সুবহানাল্লাহে বুকরাতাও ওয়া আছীলা বলার পর "আউযুবিল্লাহ মিনাশ শয়তানির রাজীম" পাঠ করতেন। ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল এবং আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি 'মিনাশ শয়তানির রাজীম' বলার পর من نفخه ونفثه وهمزه শব্দগুলো সংযোজন করতেন। অর্থাৎ- আমি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি অভিশপ্ত শয়তানের ফুঁক থেকে, প্ররোচনা থেকে এবং তার দুষ্টামি থেকে। হাকেম এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) ও হাকেম প্রমুখ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে নামাজের জন্যে দাঁড়াতেন তখন তকবীরের পর এ দোয়াটি পাঠ করতেনঃ

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

এর পর তিনবার لَآ اِلٰه اِلَّا اللّٰه এবং তিনবার الله اكبر পাঠ করতেন।

এরপর তিনি اعوذ بالله السميع العليم من الشيطن الرجيم পাঠ করতেন।

এবনে মাজাহ এবং এবনে খোযাইমা হযরত এবনে মাসউদের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পাঠ করতেনঃ[১]

اعوذ بالله السميع العليم من اشيطن الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩৫

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মোমেন বন্দাগণকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করে নেবে। তবে এই আদেশ ফরয বা অবশ্য কর্তব্য নয়। এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেন যে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যদিও এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু সকলের উদ্দেশ্যেই এ আদেশ করা হয়েছে। কেননা, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে তখন অন্য মানুষের ব্যাপারে এ আদেশ অবশ্যই অধিকতর কার্যকর হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কোরআনে করীম তেলাওয়াতের পর আল্লাহ পাকের আশ্রয় নিতে হবে। আর এ মত পোষণ করতেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং কয়েকজন তাবেয়ী। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ এ মত পোষণ করেন যে তেলাওয়াত শুরু করার পূর্বেই আউযুবিল্লাহ পাঠ করতে হবে।[২]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও লিখেছেন, তেলাওয়াতে কোরআনের সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে "আউযুবিল্লাহ" পাঠ করার পাশাপাশি অন্তর থেকেও আল্লাহ পাকের দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। আর এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কোরআনে করীম তেলাওয়াতের সময়ও যখন শয়তান প্রতারণা করতে পারে তখন অন্য আমলের ব্যাপারে শয়তানের ধোকা থেকে আরও বেশী সতর্ক থাকা কর্তব্য। আর আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা-শৈলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, যখন কেউ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার ইচ্ছা করে তখন আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা উচিত– তথা শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।[৩]

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(যারা প্রকৃত মোমেন এবং যারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে, শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা।)

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসাকারী মোমেন শয়তানের অনুসারী হয় না, ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজত করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা, ১৪, পৃষ্ঠা-৫৭
২। তফসীরে কবীর পারা-২০, পৃষ্ঠা-১১৪
৩। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭০

গাফলতের কারণে ছোট-খাটো প্ররোচনা তাদের অন্তরে পয়দা হয়ে থাকে, তখন তারা তা গ্রহণও করে থাকে। এজন্য তাদেরকে "আউযুবিল্লাহ" পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আউযুবিল্লাহ্ পড়ার হুকুম ছিল। ফলে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো যে, হয়ত ঈমানদারদের উপরে শয়তানের প্রভাব কার্যকর হয়ে থাকে। তাই এ আয়াতে সেই সম্ভাবনা দূর করা হয়েছে। ইমাম বয়যাভী (রঃ)-ও এরূপ বলেছেন। তবে এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের কারণ বর্ণনা করার জন্যেও হতে পারে। মোমেন আল্লাহ পাকের আশ্রয় এজন্যে গ্রহণ করে যে, মোমেনের পরিপূর্ণ ভরসা এক আল্লাহ পাকের প্রতিই থাকে। এজন্যে মোমেন নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্ পাকের আশ্রয়ে রেখে দেয়। আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য। আর শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণের লক্ষ্যে আউযুবিল্লাহ পাঠ করার হুকুম হল দোয়ার সুন্নতের পরিপূর্ণতার জন্যে। যাতে করে মোমেনের বাহ্যিক এবং আন্তরিক উভয় দিকের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হয় এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আউযুবিল্লাহ পাঠ করে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে মানুষের দেহ মনের উপরে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা শয়তানের রয়েছে। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ

অর্থাৎ– যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা রাখে তাদের উপর শয়তানের কোন প্রকার জোর চলেনা। শয়তান শুধু তাদেরই সর্বনাশ করে যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আস্থা এবং ভরসা রাখে না। আর যদি কোন কারণে তারা শয়তানের ফাঁদে পড়েও যায়, তবে শয়তান তাদেরকে সুদীর্ঘ সময় নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে হোক অথবা বিলম্বে হোক অবশেষে তারা শয়তানের চক্রজাল ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা হল শুধু আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করা। আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিলেই তা সম্ভব হয়। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা করাই হল একমাত্র উপায়।

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ۝

পক্ষান্তরে, যারা নিজেরাই শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে, শয়তানের শক্তি এবং আধিপত্য তাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা তারাই শয়তানের সহচর এবং বন্ধু হয়। হযরত

আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) يَتَوَلَّوْنَهُ এর তরজমা করেছেন يُطِيعُوْنَهُ অর্থাৎ যারা শয়তানের অনুগত এবং অনুসারী হয় তাদের উপরই শয়তানের জোর চলে।[১]

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, আর শয়তানের প্রভাব বিস্তারের তথা জোর চলার তাৎপর্য হল তারা নিশ্চিন্ত মনে পাপাচারে লিপ্ত হয়। এ ব্যাপারে আদৌ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়না, এমনকি তওবাও করেনা।[২]

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

(আর আমি যখন একটি আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত পরিবর্তন করি, এবং আল্লাহ পাক ভাল করেই জানেন যা তিনি নাযিল করেন, তখন তারা বলে তুমিই তা রচনা করেছ)।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যখন এমন কোন আয়াত নাযিল হত যাতে কোন কঠিন নির্দেশ থাকতো, এরপর এমন কোন আয়াত নাযিল হত যাতে কোন সহজ আদেশ থাকতো তখন মক্কার কাফেররা বলতো, আল্লাহর শপথ! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর সঙ্গীদের সাথে বিদ্রুপ করে, আজ এক আদেশ দেয়, কাল অন্য আদেশ দেয় এবং পূর্ববর্তী আদেশকে রহিত করে। আর যা কিছু তিনি বলছেন তা শুধু নিজের তরফ থেকেই বলছেন। এরই জবাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআন পাঠে শয়তানের বাধা সৃষ্টির উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে উক্ত বাঁধা সমূহের কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে।

যেহেতু পবিত্র কোরআন একসঙ্গে নাযিল হয়নি; বরং সময় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে তাই সাময়িক প্রয়োজন শেষ হলে এবং পূর্ববর্তী অবস্থার পরিবর্তন হলে আদেশেরও পরিবর্তন হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে জেহাদের কথা। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ ১৩টি বছর

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১১৫
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫১

যাবত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন। কিন্তু জেহাদের আদেশ হয়নি, বরং সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা শরীফ তশরীফ নিয়ে গেলেন তখন জেহাদের হুকুম হল–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

(সূরা হজ্জ)

(যারা আক্রান্ত হয়েছে, যারা অত্যাচারিত তাদেরকে জেহাদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে।)

এমনিভাবে সূরা মুজ্জাম্মেলের শুরুতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

(রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।)

পরবর্তীতে এ কঠিন নির্দেশকে সহজ করা হলঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

(অতএব, কোরআনের যতখানি তোমাদের পক্ষে পাঠ করা সহজ ততখানি পাঠ কর।)

এসব অবস্থায় কাফেররা বলতো, যদি পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কিতাব হত তবে তাতে এত পরিবর্তন কেন আসলো? এটি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই রচনা (নাউযুবিল্লাহ....)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের এসব অশোভন মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন যে, তাদের এসব কথা নিতান্ত অজ্ঞতা প্রসূত। কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার ব্যবস্থা-পত্র দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তার অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তখন ব্যবস্থা-পত্রও পরিবর্তন করা হয়। এতো হল দৈহিক অবস্থার কথা। পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানব অন্তরের চিকিৎসা ব্যবস্থা। কখন কী ঔষধ সেবনীয়, কখন কোন্ পন্থা গ্রহণীয় তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। তাই মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। এটিইতো স্বাভাবিক। এজন্যে কোন কোন আয়াত মনসুখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জানেন যা কিছু তিনি নাযিল করেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, নবুওয়্যত সম্পর্কে কাফেররা যে সব সন্দেহ প্রকাশ করেছিল আলোচ্য আয়াতে তা খন্ডন করা হয়েছে। দ্বীন ইসলামের মূল কথা হল তৌহিদ। তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের উপর আস্থা স্থাপন করা। ইতোপূর্বে তৌহিদ সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের কোন কোন আয়াত কেন মনসুখ হয়েছে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাফেররা বলেছিল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বিদ্রুপ করে। আজ এক আদেশ দেয় কাল আরেক আদেশ। আসলে তিনি নিজেই এ গ্রন্থ রচনা করছেন (নাউজুবিল্লাহ মিন যালেক)।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ অধিকাংশ কাফেরই আল্লাহ পাকের বিধানের হেকমত সম্পর্কে অবগত নয়। যদি তাদের এ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও থাকতো তবে তারা এ সত্য উপলব্ধি করতো যে, পবিত্র কোরআন এমন গ্রন্থ নয় যা মানুষ রচনা করতে পারে আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন মানুষ নন যিনি অসত্য বলতে পারেন।[২]

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

(হে রসূল!) বলুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে রূহুল কুদুস জীব্রাঈল সত্য সহ কোরআন নাযিল করেছে। যারা মোমেন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং হেদায়েত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্যে)।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কাফেররা যে সব আপত্তিকর কথা বলতো তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, পবিত্র কোরআন আমার কথা নয়; বরং এটি মহান আল্লাহ পাকের মহান বাণী, যা জীব্রাঈল নিয়ে এসেছে। এ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ মহান বাণী এজন্যে নাযিল করা হয়েছে যেন মোমেনদের ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাদের জন্যে তাতে রয়েছে হেদায়েত বা পথ-নির্দেশনা এবং সুসংবাদ। অর্থাৎ- যারা আল্লাহর প্রতি অনুগত তাদেরকে এতে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫২
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩৭

অথবা এর অর্থ হল পবিত্র কোরআনের আয়াত মনসুখ করে নতুন আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে মোমেনদের পরীক্ষা করা হয়। পুরাতনের স্থলে নতুন হুকুমের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস স্থাপন করে কিনা? যারা প্রকৃত মোমেন তারা অবশ্যই মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে।[১]

পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের চির মুক্তির মহা সনদ

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন মানব রচিত গ্রন্থ নয়, এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তৈরী করা কিছু নয়; বরং এটি মহা পরাক্রমশালী, পরম করুণাময়, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকেরই মহান বাণী, মানব জাতির উপকারার্থে এ তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ কালাম জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। মোমেনদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা এর অন্যতম লক্ষ্য। যারা আল্লাহ পাকের অনুগত হয় তাদের জন্য এতে রয়েছে পথ-নির্দেশনা। জীবন-সংগ্রামের নানা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান রয়েছে পবিত্র কোরআনে। পবিত্র কোরআন হলো বিশ্ব মানবের চির মুক্তির মহা সনদ। এতে রয়েছে মুসলমানদের জন্যে চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের সুসংবাদ।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝ إِنَّ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ
إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

তরজমা

(১০৩) আর আমি খুব ভাল করেই জানি যে তারা বলে, তাকে এক ব্যক্তি শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারা যার প্রতি ঈঙ্গিত করে তার ভাষা হল "আযমী" (আরবী নয়) অথচ এই কিতাব সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩৭

(১০৪) আল্লাহ পাকের কথায় যারা বিশ্বাস করেনা নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত করেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(১০৫) যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস করেনা, তারাই তো মিথ্যা রচনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী।

(১০৬) যার উপর বল প্রয়োগ হয়েছে কিন্তু তার অন্তর আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানে অবিচলিত এমন লোক ব্যতীত যে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়েছে এবং প্রশস্ত চিত্তে কুফরী ও নাফরমানী করেছে তাদের উপর আল্লাহর গজব, আর তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

কাফেরদের আরো একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কাফেররা একথা বলতো যে, কোরআন আল্লাহর কালাম নয়, যদি তা আল্লাহর কালাম হতো তবে এতে কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন হতোনা। আর এটি আপনার নিজের রচনাও নয়, কেননা আপনি তো একজন উম্মী ব্যক্তি, কখনো আপনি লেখাপড়া করেননি। পবিত্র কোরআন একটি অলংকার সমৃদ্ধ তথ্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, বৈপ্লবিক গ্রন্থ। এমন বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনা করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে, একজন লোক এসে আপনাকে এসব কথা শিক্ষা দিয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এ অবাস্তব কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ

“আর আমি ভাল করেই জানি যে তারা বলেঃ তাকে এক ব্যক্তি শিক্ষা দিয়ে থাকে”।

বলাবাহুল্য, কাফেররা অন্ধ বিদ্বেষে মেতে উঠেছিল, তাই এমন ভিত্তিহীন, আজগুবি কথা তারা বলেছে। যার সম্পর্কে তারা একথা বলে ইঙ্গিত করতো, সে ব্যক্তিটি কে? আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চিহ্নিত করতে পারেনি।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে তারা এ মিথ্যা কথা বলতো, তাকে নির্দিষ্ট করে কেউ এ পর্যন্ত তার নাম ঠিকানা বলেনি তবে এবনে জরীর মসনদে অতি দূর্বল সনদে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সে যুগে একজন অনারব খৃষ্টান গোলাম ছিল, তার নাম ছিল বালআম। পেশার দিক থেকে সে ছিল একজন কামার। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বালআমের কখনো কথাবার্তা হত। তাই কাফেররা বলতে লাগলো, এ বালআমই তাঁকে কোরআন শিক্ষা দেয়।

একরামা (রঃ) বলেছেনঃ বনী মগীরার ইয়াইশা নামক একজন গোলাম ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। কাফেররা বলতো লাগলো, এই ইয়াইশাই তাঁকে কোরআন শিক্ষা দেয়।

ফররা বলেছেনঃ হুয়াইতব এবনে আবদুল ওজ্জার আয়েশ নামক এক গোলাম ছিল। সে অনারবী ভাষায় কথা বলতো। কোন কোন কাফের বলতো যে তিনি আয়েশ থেকেই কোরআন শিখে নেন। অবশেষে আয়েশ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়েছিলেন।

এবনে এছহাক বর্ণনা করেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন রুমী, ঈসায়ী গোলামের সঙ্গে কথা বলতেন, তার নাম ছিল জবর, সে বনীল হজরম গোত্রের এক ব্যক্তির গোলাম ছিল, সে কিতাব পত্র পাঠ করতে পারতো। আবদুল্লাহ এবনে মুসলিম হাজরমী বর্ণনা করেন, আমাদের দু'টি ইয়ামনী গোলাম ছিল, একজনের নাম ছিল ইয়াছার, আরেকজন ছিল জবর। তারা উভয়ে মক্কায় তরবারি তৈরী করতো এবং তৌরাত ইঞ্জিল পাঠ করতো। কখনো কখনো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের দিক দিয়ে অতিক্রম করতেন, তাদেরকে তৌরাত ইঞ্জিল পাঠ করতে দেখে তিনি তা শ্রবণ করতেন। এবনে আবি হাতেম হুসাইন এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে একথাই বর্ণনা করেছেন।

যাহ্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ দুবৃত্তরা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত তখন তিনি এ দু' ব্যক্তির সঙ্গে বসতেন এবং তাদের কথায় তিনি সান্ত্বনা লাভ করতেন। মুশরেকরা বলতে লাগলো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ দু' ব্যক্তি থেকেই এসব কথা শিক্ষা করেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক মুশরেকদের মিথ্যা কথার প্রতি-উত্তরে এরশাদ করেছেন ঃ[১]

لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ.......

(তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ভাষা অনারবী, অথচ এই কিতাব সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় রয়েছে।) কোন কোন তফসীকার লিখেছেন, আয়েশ ছিলেন রুমী নও মুসলিম। পূর্বে ঈসায়ী ছিল। ইঞ্জিলের শিক্ষা সম্পর্কেও তার ভাল ধারণা ছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা-বার্তা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। এজন্যে তিনি কখনো তাঁর আবাসস্থলে গমন করতেন। শুধু এ কারণেই কাফেররা বলতো যে, এ ব্যক্তির নিকটই তিনি কোরআনে করীম শিক্ষা করতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরা দু'জন গোলাম ছিল। কাফেররা তাদের সম্পর্কে একথা বলতো। একবার কাফেররা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরাই কি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৩৮

মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) কোরআন শেখাও? তারা বললো, আমরা তাঁকে কি করে শেখাবো? বরং আমরাই তাঁর নিকট থেকে শিখি। এতদসত্ত্বেও তারা বলতোঃ

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

'তাকে একজন মানুষ এসে শিক্ষা দিয়ে যায়'।

মূলতঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায় অলঙ্কার এবং মাধুর্য, নতুন নতুন তথ্য এবং তাৎপর্য–মন্ডিত শিক্ষা দেখে তারা বিস্মিত হতো এবং কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এসব শিক্ষা দিত তার অনুসন্ধান করতে থাকতো। ঐ অবস্থায় কখনও একজনের নাম বলতো, কখনও আরেক জনের নাম বলতো।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ ওবায়দুল্লাহ এবনে মুসলিম বলেছেন, রূমের অধিবাসী দু' ব্যক্তি তাদের নিজেদের ভাষায় ইঞ্জিল পাঠ করতো। কখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতেন। তারা যদি ইঞ্জিল পাঠ করতো তবে তিনি তা শ্রবণ করতেন। এতেই মুশরেকরা এ গুজব রটিয়ে দেয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এদের থেকে কোরআন শিক্ষা করেন।

সাঈদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেনঃ কাফেরদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ওহী লিপিবদ্ধ করতো। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়। সে এসব আপত্তিকর কথা রটায়।[২]

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۞

যার প্রতি তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা আজমী কথা অনারবী, অথচ এই কিতাব সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় রয়েছে। তারা যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে এসব মহা মূলবান কথা শিক্ষা করেন, সে ব্যক্তি অনারব, সে আরবী ভাষা জানেনা। এমনি অবস্থায় তাকে পবিত্র কোরআনের রচয়িতা বলতে তাদের এতটুকু লজ্জা হয় না। আরবী ভাষা বা আরবী সাহিত্য সম্পর্কে যে কিছুই জানেনা, সে কি করে এ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন রচনা করবে?

وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

"আর এটি হলো সুস্পষ্ট আরবী ভাষা"।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭১
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৫৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয় সে একজন অনারব, তার ভাষা আরবী নয়। যে ভাষায় সে কথা বলে তা আরবরা বোঝে না, আর আরবদের ভাষা সে বোঝে না। এমনি অবস্থায় এখানে দু'টি কথা হতে পারে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তির প্রতি কোরআন রচনা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়, তার ভাষা আরবী নয়। সুতরাং তার সম্পর্কে এমন কথা বলা অবাস্তব। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনের বর্ণনা যেমন মোজেযা, তার ভাষাও তেমনি মোজেযা। অতএব, পবিত্র কোরআন কোন মানুষের কথা কি করে হতে পারে? এমন লোক যে কারো নিকট শেখেনি, এমনকি যার ভাষাও আরবী নয় সে কি করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেবে।

মূলতঃ কাফেররা হিংসা এবং শত্রুতার অন্ধ হয়ে পড়েছিল। এজন্যে তারা এমন অযৌক্তিক এবং অসুন্দর কথা বলতো, অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلرَّحْمٰنُ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

"দয়াময় আল্লাহ্ পাক কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন"।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস করেনা, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হেদায়েত করেন না। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

বস্তুতঃ যারা একথায় বিশ্বাস করেনা যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হেদায়েত করেন না। কেননা, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতে বিশ্বাস করেনা, দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে অস্বীকার করে তাদেরকে আল্লাহ পাকও হেদায়েত করেন না। এর তাৎপর্য হলো, তারা হেদায়েত লাভের তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ

যারা ঈমানদার নয় তারাই মিথ্যাবাদী

যারা আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহের উপর বিশ্বাস করেনা তারাই মিথ্যা রচনা করে, আর এরাই হল প্রকৃত মিথ্যাবাদী। যারা ঈমানদার হয় তারা মিথ্যাবাদী হয়না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সত্যবাদী ছিলেন, কখনও তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নেননি, তাঁরা ছিলেন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক।

অথবা এর অর্থ হল– যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস করেনা তারাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এত মোজেযা

সমূহ প্রকাশিত হওয়ার পরও যারা তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস করেনি, পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পরও যারা তাতে আস্থা রাখেনি; বরং পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে–

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ۝

তারা প্রকৃত মিথ্যাবাদী, তারা মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত। কোন কিছুই তাদেরকে মিথ্যাবাদীতা থেকে বিরত রাখেনা অর্থাৎ ভদ্রতা দ্বীনদারী এমন কিছুই তাদের মাঝে নেই যা তাদেরকে মিথ্যাবাদীতা থেকে বিরত রাখবে।

অথবা এর অর্থ হল যারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা রচনাকারী বলে এবং একথাও বলে যে, তাঁকে কেউ এসব কথা শিখিয়ে দেয়, সত্যিকার অর্থে তারাই মিথ্যাবাদী।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ

তারাই মিথ্যাবাদী আর মিথ্যাবাদীতায় তারা অভ্যস্ত।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে হারাদ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মোমেন ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে? তিনি এরশাদ করলেন, কখনও এমন হতে পারে। আমি আরজ করলাম মোমেন চুরি করতে পারে? তিনি এরশাদ করলেন, কখনও এমন হতে পারে। আমি আরজ করলাম, মোমেন মিথ্যা কথা বলতে পারে? তিনি এরশাদ করলেনঃ না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহে বিশ্বাস করেনা তারাই মিথ্যা রচনা করে।

মোমেন মিথ্যাবাদী হয় না

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ খেয়ানত এবং মিথ্যাবাদীতা ব্যতীত মোমেনের চরিত্রে সব কিছুই থাকতে পারে।

বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীস সংকলন করেছেন।

বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে মালেক (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন মোমেন ভীত হতে পারে? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। এরপর আরজ করা হল, কোন মোমেন মিথ্যাবাদী হতে পারে? তিনি এরশাদ করলেনঃ না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য হাদীস সমূহে যে মোমেনের উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের। কেননা, পরবর্তীতে এবং এ যুগেও অনেকেই মিথ্যা কথা বলে। এজন্যে সাহাবায়ে কেরামের সততা এবং সত্যবাদীতা সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত। অতএব, হাদীসের অর্থ হলো প্রকৃত খাঁটি এবং পূর্ণ মোমেন মিথ্যা কথা বলেনা। যারা আল্লাহ্ ওয়ালা, যারা আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ মাতোয়ারা, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর মহব্বত, তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন না।[১]

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ

আর যাকে ঈমান আনয়নের পর কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু তার অন্তরে ঈমান অবিচলিত, এমন ব্যক্তি ব্যতীত যে কেউ আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের পর কাফের হয়েছে এবং কুফরীর জন্যে অন্তরকে উম্মুক্ত রেখেছে তার উপর আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে ভীষণ আযাব রয়েছে।

অর্থাৎ– যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পর কাফের হয়েছে, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়েছে, কুফরী ও নাফরমানীর জন্যে মনের কপাট খুলে দিয়েছে তাদের জন্যে কঠিন, কঠোর শাস্তি অবধারিত রয়েছে।

কিন্তু যাদেরকে কুফরী করার জন্যে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তাদের অন্তর ছিল ঈমানে অবিচলিত। তাদের জন্যে এ শাস্তি নয়। আল্লাহ্ পাক অন্তর্যামী, তিনি মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের খবর রাখেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

(আর তিনি মানুষের অন্তরের গোপন কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের চেহারা এবং সম্পদের দিকে দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

অতএব, যাদের অন্তর ঈমানের উপর অবিচলিত এবং মুখে কুফরী কলেমা আদায়ের জন্যে তাদেরকে বাধ্য করা হয় তাদের জন্যে আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত শাস্তি নয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে। দূরাত্মা কাফেররা হযরত আম্মার (রাঃ)-কে, তাঁর পিতা ইয়াসেরকে, তাঁর মাতা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪০

ছুমাইয়াকে, হযরত সোহায়েব (রাঃ)-কে, হযরত খোবায়েব (রাঃ)-কে এবং হযরত ছালেম (রাঃ)-কে অকথ্য নির্যাতন করেছিল। হযরত ছুমাইয়া (রাঃ)-কে দু'টি উষ্ট্রের মাঝে বেঁধে দেয়া হয়েছিল, এক পা এক উটের সঙ্গে, আরেক পা অন্য উটের সঙ্গে, আর বর্ষার আঘাতে তাকে দ্বি-খন্ডিত করা হয়েছিল। হযরত আম্মারের পিতা ইয়াসের (রাঃ)-কেও দুবৃত্তরা শহীদ করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা উভয়ে ছিলেন প্রথম শহীদ, এমনি অবস্থায় পিতা-মাতার শাহাদতের পর হযরত আম্মার (রাঃ) ছিলেন দুবৃত্তদের নির্যাতনের শিকার। এ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে এমন কথা বের করার জন্যে কাফেররা তাঁকে বাধ্য করেছিল, যা তারা চেয়েছিল।

কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ বনী মগীরা গোত্রের কাফেররা তাঁকে ধরে নিয়ে একটি কূপে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল, মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার কর, অন্যথায় এখানেই তোর শেষ। এমনি অবস্থায় হযরত আম্মার (রাঃ) সে বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন যা মুশরেকরা চেয়েছিল, কিন্তু তাঁর অন্তরে সে কথাটি ছিল ঘৃণ্য, ঈমান বিরোধী কথা, তাঁর অন্তর যা কখনো গ্রহণ করেনি। কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দেয় যে, আম্মার কাফের হয়ে গেছে, তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ অবশ্যই নয়, আম্মারের মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ঈমানে পরিপূর্ণ, তার রক্ত এবং গোশ্‌তে ঈমান মিশে গেছে। অবশেষে হযরত আম্মার (রাঃ) ক্রন্দণরত অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তিনি আরজ করলেন, অত্যন্ত মন্দ কথা, আমি আপনাকে মন্দ বলেছি, অর্থাৎ আপনাকে অস্বীকার করে আপনার উল্লেখ করেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তোমার মনের কি অবস্থা ছিল, তিনি আরজ করলেন, মন ঈমানের উপর সুদৃঢ় ছিল। একথা শ্রবণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আম্মার (রাঃ)-এর নয়ন যুগল থেকে অশ্রু মুছে দিলেন এবং এরশাদ করলেন, যদি কাফেররা পুনরায়ও তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তবে আবারও এমন কুফরী কথা বলতে পারবে। এরপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করার ইচ্ছা করেন তখন মুশরেকরা হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত খোবায়েব (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ)-কে পাকড়াও করে। হযরত আম্মার (রাঃ) এমন কথা বলেন, যা মুশরেকদের পছন্দনীয় ছিল। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃঃ ১২১

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কুফরী কলেমা উচ্চারণের সময় তোমার মনের অবস্থা কি ছিল? তিনি বললেন, আমার মন আপনার কথায় পূর্ণ আস্থাবান ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত মক্কার কয়েকজন মুসলমানের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে মুসলমানগণ চিঠি লিখেছিলেন, তোমরা মক্কা থেকে হিজরত করে চলে আস, যতক্ষণ তোমরা হিজরত করে আমাদের নিকট আসবেনা ততক্ষণ আমরা তোমাদেরকে আপন মনে করব না। এ চিঠি পেয়ে তারা মক্কা শরীফ ছেড়ে মদীনা শরীফ রওয়ানা হলেন। পথে কাফেররা তাঁদেরকে পাকড়াও করলো এবং তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হল। এ সময় তারা বাধ্য হয়ে কুফরী কলেমা উচ্চারণ করলেন।

মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত আমের এবনে হাজরমীর গোলাম জবরের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমের তার উপর বল প্রয়োগ করেছিল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করেছিলেন। আল্লাম বগভী (রঃ) লিখেছেন, পরবর্তীতে জবর এবং মনিব আমের ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং উভয়ে মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেছিলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন-

وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ

অর্থাৎ তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে অবিচলিত ছিল। একথার তাৎপর্য হল এ কাফেরদের দ্বারা বাধ্য হয়ে কুফরী কলেমা উচ্চারণ করলেও মনের গহনে ঈমান মজবুত ছিল। এতে একথা প্রমাণিত হয়, অন্তর দিয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য জানা তথা তৌহিদের ও রেসালতের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা একান্ত জরুরী। অন্তরের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ব্যতীত মৌখিক স্বাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।

وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا

অর্থাৎ- যার অন্তর প্রশস্ত এবং উম্মুক্ত হয়েছে কুফরী ও নাফরমানীর জন্যে। এর তাৎপর্য হল কারো মন যদি কুফরী ও নাফরমানীকে পছন্দ করে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কুফরীকে গ্রহণ করে, তবে সে যেন তার অন্তরকে কুফরীর জন্যে প্রশস্ত করলো।

কুফরী কাজের জন্যে বাধ্য করার তাৎপর্য

এর অর্থ কোন মানুষকে এমন কাজের জন্যে বাধ্য করা যা তার মন চায়না। এভাবে বাধ্য করার দু'টি পন্থা হতে পারে। ১. কাউকে তার অপছন্দনীয় কাজের জন্যে এভাবে বাধ্য করা যে, যদি সে ঐ কাজটি করতে অস্বীকার করে তবে তাকে

নির্যাতন সহ্য করতে হয়। যেমন, তাকে দৈহিক ভাবে শাস্তি দেয়া বা বন্দী করা। তবে এ শাস্তি বা বন্দী করার পর তার কোন ইচ্ছা কার্যকর না হওয়া, শুধু কষ্ট সহ্য হওয়া। ২. যাকে বাধ্য করা হয় কোন কাজের জন্যে যাতে তার কোন অধিকারই না থাকা। যেমন, তার অঙ্গ কেটে ফেলা, তাকে হত্যা করা। এ অবস্থায় বাধ্য হওয়ার হুকুম তখন দেয়া হবে যখন বাধ্য যারা করেছে তাদের এসব অন্যায় করার শক্তি থাকে।

অর্থাৎ– যে শাস্তি দেয়ার জন্যে হুমকি দেয়া হয় আর যে কাজের জন্যে তাকে বাধ্য করা হয়, যদি সে ব্যক্তি দেখে যে আমি অস্বীকার করলে এ ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেবে, তার সে শক্তি রয়েছে তবে "তাকে বাধ্য করা হয়েছে" বলা হবে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তিকে কুফরী কলেমা উচ্চারণে বাধ্য করা হয়, আর সে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে তখন প্রকাশ্যে এমন কথা বলে জীবন রক্ষা করার অনুমতি রয়েছে, তবে শর্ত হলো অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান থাকতে হবে। হযরত আম্মার (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ এ আয়াত আলোচ্য মাসআলা প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। কেননা হযরত আম্মার (রাঃ)-কে কাফের বলা হয়নি। তবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ না করে প্রাণ উৎসর্গ করা উত্তম। যেমন হযরত আম্মার (রাঃ)-এর পিতা-মাতা তাই করেছেন। হযরত খোবায়েব (রাঃ), হযরত যায়েদ এবনে দাস্‌না (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে তারেক (রাঃ) এ অবস্থায় কুফরী কলেমা উচ্চারণ করতে রাজি হননি, শাহাদতঃ বরণ করেছেন।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, হযরত খোবায়েব (রাঃ)-কে যখন হত্যা করা হয় তখন তিনি তার পূর্বক্ষণে দু' রাকাত নামাজ আদায় করেন। বর্ণিত আছে, হত্যা করার পূর্বে দু' রাকাত নামাজ আদায়ের প্রথা হযরত খোবায়েব (রাঃ)-ই প্রবর্তন করেছেন। যখন তিনি নামাজ আদায় করলেন তখন তাঁকে বেঁধে ফেলা হলো। এরপর তাঁকে মদীনা শরীফের দিকে মুখ করা হলো এবং অত্যন্ত মজবুত ভাবে তাঁকে বেঁধে ফেলা হলো এবং তারা বললো, "তুমি ইসলাম ছেড়ে দাও, আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব"। হযরত খোবায়েব (রাঃ) বললেন, "আল্লাহর শপথ! সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ আমাকে দেয়া হলেও আমি মুরতাদ হওয়া পছন্দ করব না"। কাফেররা বললো, "এখন তো তুমি চাও যে হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার জায়গায় থাকেন আর আমি আমার বাড়ীতে শান্তিতে থাকি"। হযরত খোবায়েব (রাঃ) বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমার নিকট একথাও পছন্দনীয় নয় যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকে কোন কাঁটা বিদ্ধ হয়, আর আমি আমার বাড়ীতে আরামে বসে থাকি"।

কাফেররা বার বার এই একই কথা বলতে লাগলো, "খোবায়েব! ইসলাম ছেড়ে দাও"। হযরত খোবায়েব (রাঃ) বললেন, "না, আমি কখনও ইসলাম ছাড়বো না"। তারা বললো, "যদি ইসলাম না ছাড় তবে আমরা তোমাকে হত্যা করবো"। তিনি বললেন, "আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করা অতি সামান্য একটি কাজ"।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত খোবায়েব (রাঃ) শাহাদতের পূর্বে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, যার দু'টি পংক্তির অর্থ হল, "যদি মুসলমান অবস্থায় আমাকে হত্যা করা হয় তবে কিভাবে আমাকে ধরাশায়ী করা হয়, তার জন্যে কোন পরোয়া নেই," ।

"শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই আমি জীবন উৎসর্গ করছি। যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হয় তবে তিনি আমার দেহের খন্ডে-খন্ডে এবং জোড়ায়-জোড়ায় বরকত দান করবেন" ।

এবনে আকাবা বর্ণনা করেনঃ হযরত খোবায়েব (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) উভয়কে একই দিন শহীদ করা হয়। তাঁদের শাহাদতের দিন লোকেরা শ্রবণ করেছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন–

وعليكما اسلام

অর্থাৎ তোমাদের উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

এবনে আবি শায়বা হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ আবদুর রাজ্জাক তাঁর তফসীরে বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন যে, মুসায়লামাতুল কায্যাব দু'জন মুসলমানকে গ্রেফতার করে এবং একজনকে বলে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে জবাব দিল, তিনি আল্লাহর রসূল। মুসায়লামা বলল, আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, সে জবাব দিল, আপনিও। মুসায়লামা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল, মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তুমি কি বল? তিনি জবাব দিলেন, তিনি আল্লাহর রসূল। এরপর মুসায়লামা জিজ্ঞাসা করল, আমার সম্পর্কে তুমি কি বল? তিনি বললেন, আমি বধির। মুসায়লামা তিনবার এ প্রশ্ন করল, তিনি তিনবার একই জবাব দিলেন। তখন মুসায়লামা তাঁকে হত্যা করল। যখন এ ঘটনার সংবাদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেয়া হল, তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে এরশাদ করলেনঃ সে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অনুমতিকে ব্যবহার করেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি উচ্চস্বরে সত্য ঘোষণা করেছে, তাকে মোবারক হোক।[১]

মাছআলা

প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট করার জন্যে, তবে তা তার জন্যে বৈধ হবে। তার দৃষ্টান্ত হল অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় অন্যের সম্পদ ব্যবহার করা বৈধ হয়, যেমন চরম ক্ষুধার সময় কারো কিছু খেয়ে নেয়া বৈধ, কিন্তু

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১২২

যে বাধ্য করবে, তার নিকট থেকে সম্পদের মালিক জরিমানা আদায় করতে পারবে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

যে প্রকৃত মুসলমান, যে খাঁটি মোমেন, নূরে ঈমানীতে যার অন্তর আলোকিত, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঈমান বর্তমান, যদি তাকে কুফরী বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করা হয়, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে যদি সে এমন বাক্য উচ্চারণ করে, তবে কাফের হবেনা। অবশ্য এমন বিপদগ্রস্ত অবস্থায়ও যদি কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কুফরী বাক্য উচ্চারণ থেকে বিরত থাকে এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, ঈমান দিতে নয়, তবে তা হবে অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কুফরী বাক্য উচ্চারণের স্থলে মৃত্যুকে বরণ করাই হল উত্তম আদর্শ। হযরত ইয়াসের (রাঃ), হযরত ছুমাইয়া (রাঃ), হযরত খোবায়েব (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে হোজায়ফা (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম দুবৃত্ত কাফেরদের শত নির্যাতন সত্ত্বেও এমনি উত্তম আদর্শই রেখে গেছেন।

এ আয়াতে একথাও এরশাদ হয়েছে, ঈমান আনয়নের পর তথা মুসলমান হওয়ার পর ইসলামকে বর্জন করে যে মুরতাদ হয় তার শাস্তি অবধারিত, সে শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর। দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى
الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾
ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا
وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ تَاْتِيْ
كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪৩

তরজমা

(১০৭) তা এজন্যে যে তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধণ্য দেয়। আর এজন্যে যে আল্লাহ্ পাক কাফের সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

(১০৮) তারাই সে সব লোক, আল্লাহ্ পাক যাদের অন্তর, কর্ণ, চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফেল, অচেতন।

(১০৯) নিশ্চয় তারা হবে আখেরাতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত।

(১১০) যারা উৎপীড়িত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জেহাদ করে এবং সবর অবলম্বন করে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১১১) স্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করতে করতে প্রত্যেকেই হাযির হবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা ঈমান আনয়নের পর কাফের হয়েছে। এরপর তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ ধ্বংসের পথ বেছে নেয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ

(এর কারণ এই, তারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর উপর প্রাধান্য দিয়েছে।)

পবিত্র কোরআন বারে বারে মানুষকে এ সত্যের প্রতি বিশ্বাস করার আহ্বান জানিয়েছে। দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়া অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, দুনিয়ার এ জীবনের অবসান ঘটে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। তখন এ জীবনের সকল সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়। এখানকার সম্পদ-শক্তি, সন্তান-সন্ততি, সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য, সুনাম-সুখ্যাতি, আরাম-আয়েশ, আনন্দ-উল্লাস, বাগ-বাগিচা শস্য-শ্যামলিমা এক কথায় কোন কিছুই থাকেনা।

এ জীবনে মানুষের তিনটি সাথী

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "এ জীবনে মানুষের তিনটি সাথী রয়েছে, প্রথম সাথী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেয়, দ্বিতীয় সাথী কবর পর্যন্ত সঙ্গে যায়, তৃতীয় সাথী চির সাথী হয়"। সাহাবায়ে কেরাম একথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "প্রথম সাথী

হলো মানুষের ধন-সম্পদ, যা তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেয়। দ্বিতীয় সাথী হলো তার আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, যারা কবর পর্যন্ত সঙ্গে যায়, আর তৃতীয় সাথী হলো মানুষের আমল যা তার চির সাথী হয়"।

অতএব, মানুষ যদি নেক আমল করে তথা ভালো কাজ করে সে ভালো সাথী পায়। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি মন্দ কাজ করে তবে সে চিরদিনের জন্যে মন্দ সাথী পায়। ফলে তার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

নেক-আমল ঈমান ব্যতীত কবুল হয় না। তাই আখেরাত তথা চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে ঈমান ও নেক আমল একান্ত জরুরী। এজন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ........ (সূরা কাসাস)

"আল্লাহ্ পাক তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা দ্বারা আখেরাতে সম্বল সংগ্রহ কর। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেওনা, পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"।

এ আয়াতের তফসীরে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, দুনিয়া-প্রীতি বা দুনিয়ার মহব্বত যে অত্যন্ত নিন্দনীয় তা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। যদি আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়ার লাভ-লোভকে প্রাধান্য দেয়া হয় তবে তা হয় অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু দুনিয়ার যতখানি প্রয়োজন তা নিন্দনীয় নয়।[১]

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির প্রথম কারণ বর্ণিত হয়েছে। আর পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় কারণ। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ۝

(আল্লাহ্ পাক এমন কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।) অর্থাৎ যারা ঈমানের স্থলে কুফর ও নাফরমানীকে পছন্দ করে, বা যারা ঈমান আনয়নের পর তা বর্জন করে কুফর ও নাফরমানী গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েত কবুল করার জন্যে বাধ্য করেন না। যেহেতু কাফেররা সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পরও এবং আল্লাহ্ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে সত্য গ্রহণের আহ্বান লাভের পরও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাই এর ভয়াবহ পরিণতির কথা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে রয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৫৫৪

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ

এরাই সে সব লোক আল্লাহ্ পাক যাদের অন্তর, কর্ণ, চক্ষু মোহর করে দিয়েছেন। আর তা তাদের কুফর ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, অন্তরে মোহর করার কারণ এই, তারা সত্যকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেনি এবং সত্য-উপলব্ধির জন্যে সচেষ্ট হয়নি। এমনিভাবে তারা সত্য কথা শ্রবণ করেনি। এজন্যে তাদের কর্ণে মোহর করা হয়েছে। আর তারা চক্ষু দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে বর্তমান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নির্দশন সমূহ দেখেনি, তাই তাদের চক্ষুগুলোকেও মোহর করে দেয়া হয়েছে।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

মূলতঃ তারা বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তার ব্যাপারে, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত সম্পর্কে, তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে, তারা সম্পূর্ণ গাফেল। অথচ জীব-জন্তু পর্যন্ত এ ব্যাপারে গাফেল নয়। তাদের অন্যায়-অনাচারের ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

(নিশ্চয় তারা হবে আখেরাতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত।) কেননা, তারা তাদের জীবনকে ধ্বংস করেছে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে। তারা এমন কাজ করেছে যা তাদের চির শাস্তির কারণ হয়েছে। আর এমন কোন সৎ কাজ করেনি, যা তাদের মাগফেরাতের কারণ হতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ পর্যায়ে গুনাহগার মুসলমানদের কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যদিও তাদের জীবনের বিরাট অংশ পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে বরবাদ হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা তৌহিদের প্রতি ঈমান এনেছে তাই কিছুদিন শাস্তি ভোগের পর তৌহিদের প্রতি ঈমানের বরকতে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাদের নাজাত হবে। আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত সমূহে কাফেরদের ছয়টি চারিত্রিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. তাদের কুফরী ও নাফরমানী কারণে তারা আল্লাহর গজবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

২. তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।

৩. তারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

৪. তাদের দৌরাত্মের কারণে আল্লাহ্ পাকের হেদায়েত থেকে মাহরূম হয়েছে।

৫. তাদের অন্তর, চক্ষু এবং কর্ণ মোহরাঙ্কিত হয়েছে।

৬. তারা চরম গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়েছে, পরিণামে তারা হয়েছে কোপগ্রস্ত।[১]

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا

“যারা অত্যাচরিত-উৎপীড়িত হওয়ার পর হিজরত করেছে, এরপর আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে ও সবর অবলম্বন করেছে। এসব কিছুর পর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান”।

যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, কাফের মুশরেক এবং মুরতাদ তাদের অবস্থা এবং পরিণাম বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। আর যারা কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়েছে এবং এরপর নিজের ভিটা-মাটি এমনকি প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে হিজরত করেছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে, শত নির্যাতন সত্ত্বেও সবর অবলম্বন করেছে এ আয়াতে তাদের জন্যে মাগফেরাত এবং রহমতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন তখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়ার স্থলে মক্কাবাসী শুধু যে তাঁর বিরোধতা করলো তাই নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করলো। কোন কোন সাহাবী ঐ অমানুষিক নির্যাতনের কারণে সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। কখনও অমানুষিক নির্যাতনের কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রাণ রক্ষার তাগিদে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হতেন। যখন এমন বিপদ সাময়িকভাবে লাঘব হত তখন ঐ ত্রুটির জন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও ব্যথিত হতেন। তাঁরা অবশেষে হিজরত করেন মদীনা মোনাওয়্যারায়, আলোচ্য আয়াতে তাদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের দ্বারা চরম নির্যাতন ভোগ করেছেন। এরপর তারা হিজরত করেছেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করছেন, অত্যন্ত ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাদের জন্যে এ সুসংবাদ যে, আল্লাহ্ পাক

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১২৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৬

অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ক্ষমা করবেন এবং তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

এবনে সাদ তাবাকাতে কুবরায় আমর এবনে হাকেমের সূত্রে লিখেছেন, হযরত আম্মার এবনে ইয়াসেরকে (রাঃ) এত নির্যাতন করা হয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন। এমনিভাবে হযরত সোহায়েব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে চরম কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত আবু জেহেলের দুগ্ধ ভ্রাতা ইয়াশ এবনে আবি রাবিয়া, আবু জুনদল এবনে সাহাল, অলীদ এবনে অলীদ এবং মগীরা, সালমা এবনে হিশাম, ওবায়দুল্লাহ এবনে ওসাইদ সাকাফী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মুশরেকরা তাদেরকে চরম কষ্ট দিত এবং কখনো কখনো তাদেরকে প্রাণ রক্ষার্থে এমন কথা উচ্চারণ করতে হত যা কাফেরদের পছন্দনীয় ছিল। এরপর তারা হিজরত করে মদীনা শরীফ চলে যান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন এবং সবর অবলম্বন করেন।

হাসান বসরী (রঃ) এবং একরামা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবদুল্লাহ এবনে সাদ এবনে আবি সারাহ সম্পর্কে। আবদুল্লাহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করে এবং ওহী লিপিবদ্ধকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছুদিন পর সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ঈসায়ী ধর্ম অবলম্বন করে। কাফেরদের সঙ্গেই মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ যেহেতু হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আত্মীয় ছিল তাই তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তার সম্পর্কে সুপারিশ করলেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সুপারিশ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন এবং তাকে হত্যা করার যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করলেন। এরপর আবদুল্লাহ খাটি মুসলমান হলেন। তাঁর সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে আমের হাজরমী এবং তার গোলাম জবর সম্পর্কে। জবর মুসলমান হয়েছিলেন। আমের তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করতো, যে কারণে জবর কুফরী কলেমা উচ্চারণে বাধ্য হতেন। পরবর্তীতে আমেরও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জবরকে নিয়ে মদীনা মোনাওয়্যারা হিজরত করেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন, বিপদাপদে সবর অবলম্বন করেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪৯-৫০

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে মুশরেকদের সে দলের কথা বলা হয়েছে যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় দুর্বল মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু তারা পরে যদি তওবা করে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, এরপর ইসলামের জন্যে জেহাদ করে এ পর্যায়ে সবর অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের আরও একটি অর্থ হতে পারে, নির্যাতীত-উৎপীড়িত মুসলমানগণ যখন চরম অসহায় অবস্থায় অন্তরে পূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে কুফরী কলেমা উচ্চারণ করেছেন, পরে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে হিজরত করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে শরীক হয়েছেন, সত্য-সাধনায় ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে মাফ করবেন। কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

যাহোক, যারা প্রথমে কুফরী ও নাফরমানী করেছে এমনকি, মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, কিন্তু পরে তওবা করে কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে, পরে হিজরত করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে, দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মাফ করবেন।

অথবা যে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এবং কুফরী কলেমা উচ্চারণ করার জন্যে তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে, চরম অসহায় অবস্থায় উচ্চারিত কুফরী বাক্যের জন্যে আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা, তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান, পরে হিজরত, জেহাদ এবং সবর অবলম্বনের মাধ্যমে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[১]

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا

"যেদিন নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করতে করতে প্রত্যেকেই হাযির হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় লাভ করবে। আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবেনা"।

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেনদের জন্যে রহমত এবং মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তির ঘোষণা বাস্তবায়নের সময়ের কথা বলা হয়েছে, যদিও মৃত্যুর পরই সওয়াব এবং আযাব শুরু হয়ে যায় কিন্তু এর প্রকৃত

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১২৫-২৬

প্রকাশ হবে কেয়ামতের দিন। যেদিন কেউ কারো কোন সাহায্য করতে পারবে না, প্রত্যেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে হবে ব্যাকুল। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

(সূরা আবাসা)

"সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা থেকে এবং তার মাতা ও পিতা থেকে, তার পত্নী ও সন্তান থেকে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত করে রাখবে (অর্থাৎ অন্যের দিকে তাকাবার মত অবস্থা কারোই থাকবেনা)"।

কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা

আলোচ্য আয়াতেও কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকেই নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করতে করতে হাযির হবে। ঐ সংকটময় মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজের নিজের চিন্তায় এত বিভোর এবং ব্যস্ত থাকবে যে, স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই বেরাদর পিতা মাতা কারো উপকার করা তো দূরের কথা; অন্যের সম্পর্কে চিন্তা করারও সুযোগ পাবেনা। সেদিন সকলেই নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে, নিজের কৃতকর্মের কি কৈফিয়ত দেবে বা কি সাফাই পেশ করবে, প্রত্যেকে এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে। প্রত্যেকে আপন মনে প্রশ্নোত্তর তৈরী করতে করতে হাযির হবে। আল্লাহ পাকের দরবারে অবিচার নেই, সকলেই তার জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের যথার্থ ফল পুরোপুরি পাবে। সেদিন প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে। কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের কথা মেনে পথভ্রষ্ট হয়েছি। আমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, আমরা নেক আমল করবো।

দোযখকে কোথা থেকে আনা হবে

এবনে জরীর তাঁর তফসীরে হযরত মাআজ (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেয়ামতের দিন দোযখকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি এরশাদ করেন জমীনের সপ্তম স্তর থেকে। তার এক হাজার লাগাম হবে, প্রত্যেক লাগামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে। দোযখ

যখন মানুষ থেকে এক হাজার বছরের দূরত্বে থাকবে, তখন সে একটি নিঃশ্বাস ফেলবে যার কারণে প্রত্যেক নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবী রসূলগণ পর্যন্ত মাটিতে বসে পড়বেন এবং আরজ করবেন, হে আমার মালিক! আমাকে রক্ষা করুন।

আখেরাতের আলোচনা

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত ওমর (রাঃ) একবার কা'ব আহবারকে (রাঃ) বলেছিলেন, আখেরাতের আলোচনা করুন, যাতে করে আমাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হয়।

কা'ব আহবার (রাঃ) আরজ করলেন, হে আমীরুল মোমিনীন! যদি সত্তরজন পয়গম্বরের সমান নেক আমল করে আপনি কেয়ামতের দিন হাযির হন, তবুও সেদিন এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবেন যে নিজের প্রাণরক্ষা ছাড়া আর কারো কথা আপনার মনেও হবেনা। দোজখ এমন এক ভয়ংকর নিঃশ্বাস ফেলবে, যার কারণে প্রত্যেক নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবী রসূল বসে পড়বেন এমনকি, হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) পর্যন্ত বলে উঠবেন, হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার নিকট আমার প্রাণের নিরাপত্তা চাই। আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে সে অবস্থার বিবরণ। এরপর কা'ব আহবার (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন,

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا

একরামা (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে একাধারে ঝগড়া হতে থাকবে এমনকি, একটি মানুষের রুহ এবং দেহের মধ্যেও ঝগড়া হবে। রুহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাত ছিলনা যে আমি কোন কিছু ধরব, আমার পা ছিলনা যে আমি কোথাও যাব, আমার চক্ষু ছিলনা যে আমি কিছু দেখবে, যা কিছু অন্যায় অনাচার হয়েছে, তা শুধু দেহেরই কাজ আমার নয়। আর দেহ বলবে, হে আমার প্রতিপালনক! তুমি আমাকে কাষ্ঠ খন্ডের ন্যায় প্রাণহীন সৃষ্টি করেছ, আমার হাত ছিলনা যে আমি ধরব, আমার পা ছিলনা যে আমি চলব, আমার চক্ষু ছিলনা যে আমি দেখব, কিন্তু এ রুহ যখন আমার মাঝে বিদ্যুতের মত প্রবেশ করল, তখন আমার রসনা কথা বলতে লাগল, আমার নয়ন যুগল দেখতে লাগল, আমার পা চলতে লাগল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক রুহ এবং দেহকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যেমন একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু ব্যক্তি কোন

বাগানে পৌঁছল, বাগানের বৃক্ষগুলোতে অনেক ফল ধরে রয়েছে, অন্ধ ব্যক্তি তো ফল দেখতেই পারেনি, আর পঙ্গু ব্যক্তি ফল দেখছিল কিন্তু ফলের কাছে পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, তখন অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গু লোকটিকে তার কাঁধে তুলে নিল এবং উভয়ে ফল তুলে নিল (আর চুরির অপরাধে উভয়েই ধৃত হল)। এভাবেই কেয়ামতের দিন রুহ এবং দেহ পাপীষ্ঠ সাব্যস্ত হবে এবং আযাবের জন্যে তাদের পাকড়াও করা হবে।

تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا

প্রত্যেকেই সেদিন নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করবে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট থাকবে।

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۞

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সেদিন কোন প্রকার অবিচার করা হবেনা। তথা সেদিন সকলের সওয়াব পুরোপুরিই দেয়া হবে, কারো সওয়াবে এতটুকু কম করা হবেনা, কারো হক্ব বিনষ্ট করা হবেনা, কাউকে অযথা বা অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া হবেনা।[১]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً
مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا
يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

তরজমা

(১১২) আর আল্লাহ পাক একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন-এক ছিল জনপদ, তার অধিবাসীরা ছিল নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। তার জীবিকা সচ্ছন্দে ছুটে আসতো সব দিক

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫০-৫১

থেকে। এরপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী করল। সুতরাং আল্লাহ পাক তাদের কীর্তিকলাপের পরিণাম এমনভাবে আস্বাদন করালেন যে, ক্ষুধা এবং ভয় তাদের পোযাক-পরিচ্ছদে পরিণত হয়।

(১১৩) আর তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। ফলে আল্লাহ পাকের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। বস্তুতঃ তারাই ছিল জালেম।

(১১৪) অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত হালাল এবং পবিত্র রিয্ক আহার কর, আর তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করে থাক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের আখেরাতে যে শাস্তি হবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, শুধু আখেরাতেই নয়; বরং আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক শাস্তি দিয়ে থাকেন। ক্ষুধা এবং ভয় তাদেরকে যে কোন সময় পাকড়াও করতে পারে। কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি যখন আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করে, না-শোকরী এবং অকৃতজ্ঞতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে, তখন তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়, কখনো দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে তাদের উপর, কখনো যুদ্ধ বিগ্রহের বিপদ আপতিত হয়, আর কখনো তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির শিকার হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। একটি জনপদ ছিল অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, শান্তিতে এবং নিরাপদে, তাদের রিয্ক আসছিল সবদিক থেকে। তাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর নেয়ামত দান করেছিলেন অকাতরে। কিন্তু আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত পেয়ে তারা মুগ্ধ মাতোয়ারা হয়ে ভুলে গেল স্বয়ং দাতাকে, অকৃতজ্ঞ হল তাঁর। আল্লাহ পাকের দানের অনাদর, অকৃতজ্ঞতা তাঁর নাফরমানী এবং অবাধ্যতায় পরিণত হল। এভাবে তারা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনল। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"আর তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। তখন আল্লাহ পাক তাদের নিজেদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ তারা আত্মবিস্মৃত হয়েছে), তারাই পাপীষ্ঠ"।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছে–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত, যে কোন মুহূর্তে তাদের উপর বিপদ আপতিত হতে পারে বা তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসতে পারে। আরো এরশাদ হয়েছে–

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"তারা কি দেখেনা? তারা বিপদগ্রস্ত হয় প্রতি বছর একবার কি দু' বার, তবুও তারা পাপাচার থেকে তওবা করেনা এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা"।

মূলতঃ অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসে শাস্তি, আপতিত হয় বিপদ। আর এ উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, একবার মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। একটানা সাত বছর যাবত দুর্ভিক্ষ মক্কাবাসীকে অসহায় করে ফেলেছিল। তখন মক্কার যে সর্দাররা মুসলমানদের প্রতি উৎপীড়ন করত, যাদের অকথ্য নির্যাতনের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে তাঁদের ভিটে-মাটি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছিল মদীনা মোনাওয়্যারায়, মক্কার সেই সর্দাররাই অবশেষে দুর্ভিক্ষের কারণে হাযির হতে বাধ্য হয়েছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে। তারা বলেছিল, শত্রুতা রয়েছে পুরুষদের সাথে কিন্তু মহিলা ও শিশুরাতো দুর্ভিক্ষের কারণে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তো কোন শত্রুতা নেই। অতএব, আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থী। তখন রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন এবং সারা আরব থেকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এভাবে মক্কাবাসী এ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) মক্কাবাসীর এ দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৮
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৪২-৪৩

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে قَرْيَةً শব্দ দ্বারা মক্কা নগরীকেই বোঝানো হয়েছে এবং এর দ্বারা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য।

মানুষ যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকুক এবং যত শান্তি ও নিরাপত্তার বাস্তব ব্যবস্থাই করুক, কখনও নির্ভীক হতে নেই এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হতে নেই। কেননা, অকৃতজ্ঞতার পরিণতি হয় ভয়াবহ। সৌভাগ্য রূপান্তরিত হয় দুর্ভাগ্যে। সুদিন বিদায় নেয়, দুর্দিন ফিরে আসে, যেমন দিনের পর আসে রাত। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ঘটনাবলী একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ

"আর তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে রসূল আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, ফলে আল্লাহ পাকের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করে, বস্তুতঃ তারাই ছিল জালেম"।

পূর্ববর্তী আয়াতে যে জনপদবাসীর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছিল তাতে তাদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যে, পৃথিবীর সব দিক থেকেই তাদের রিয্‌ক আসত, তারা অত্যন্ত আনন্দ-উল্লাসে, আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু অবশেষে তাদের অকৃতজ্ঞতার শাস্তি স্বরূপ তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ঐ জনপদবাসীকে (মক্কাবসীকে) শুধু যে জাগতিক বা পার্থিব সম্পদই দেয়া হয়েছে তাই নয়; বরং তাদেরকে আধ্যাত্মিক নেয়ামতও দান করা হয়েছিল। তাদের মাঝে তাদেরই বংশ থেকে তাদের নিকট একজন রসূল আগমন করেছিলেন, তিনি হলেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি শুধু নবীই নন, বরং নবীগণের দলপতি, বিশ্ব-সভার তিনি চিরস্থায়ী সভাপতি। কিন্তু মক্কাবাসী তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি। তাঁর অনুসরণ করে ইহকাল ও পরকালের পরম সাফল্য লাভ করতে পারত। কিন্তু তারা তা-ও করেনি; বরং তারা কুফর শেরক অব্যাহত রেখেছে, অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে। পরিণামে তারা ধ্বংস হয়েছে। কেননা, তারা ছিল জালেম, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।

আলোচ্য আয়াতে আযাব বা শাস্তির যে উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা দুর্ভিক্ষ অথবা বদরের দিনের পরাজয়ের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতের قَرْيَةً শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণের মধ্যে যারা বলেছেন, এর দ্বারা মক্কা নগরীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা একথাও বলেছেনঃ মক্কাবাসী পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্চিন্ত মনে বাস করছিলো, সারা পৃথিবী থেকে তাদের নিকট আল্লাহর নেয়ামত আসছিলো, এমনকি তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রসূলকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তারা একদিকে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হয়েছে, অন্যদিকে আল্লাহর

রসূলকে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁর অনুসারী মোমেনদেরকে নির্যাতন করে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছে।

তাদের এ অন্যায়ের পরিণতি স্বরূপ নেমে আসে তাদের উপর একটানা সাত বছরের দুর্ভিক্ষ, আর এ দুর্ভিক্ষ এত ভয়াবহ ছিলো যে তারা জঠর-জ্বালায় কুকুর এবং মৃত জীব-জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়; বরং মুসলমানদের নিকট তাদেরকে অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হয় ২য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে।

শিক্ষণীয় বিষয়

আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে সতর্ক করেছেন যে, তোমরা মক্কাবাসীর ইতিহাস স্মরণ রেখো এবং সতর্ক ভাবে জীবন যাপন কর, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বর্তমান জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ কর। আল্লাহ পাকের দান উপভোগ কর, কিন্তু তাঁর অকৃতজ্ঞ হয়োনা। দানের জন্যে দাতার প্রতি শোকর গুজার হও, দান নিয়ে মুগ্ধ হয়ে মহান দাতাকে ভুলে যেওনা। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) সহ কোন কোন তফসীরকারগণ বলেছেন যে, قرية শব্দের দ্বারা মক্কা নগরী উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কোন জনপদ উদ্দেশ্য হতে পারে। আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করা, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, কুফর, নাফরমানী, না-শোকরী, নেমক হারামীর ভয়াবহ পরিণাম বোঝাতেই ঐ জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ص

"অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত হালাল ও পবিত্র জীবিকা আহার কর এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করে থাক"।

এ আয়াতে মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, তোমাদেরকে আল্লাহ পাক যা কিছু হালাল পবিত্র রিযক দান করেছেন তা আহার কর, আর আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় কর।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে যে আযারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল মক্কাবাসীর জন্যে ক্ষুধা বা দুর্ভিক্ষের আযাব। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যা কিছু আল্লাহ পাক হালাল এবং পবিত্র রিযক দান করেছেন তা তোমরা

খাও। একথাটির তাৎপর্য হচ্ছে এই– তোমাদের প্রতি ক্ষুধার আযাব হয়েছিল তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে। অতএব তোমরা নাফরমানী, না-শোকরী এবং নেমকহারামী পরিহার কর, যাতে করে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে রিয্ক লাভ করতে পার। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যে রিয্ক তোমাদেরকে দান করেছেন তা থেকে তোমরা আহার কর। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

فكلوا يا معشر المسلمين ما رزقكم الله من الغنائم

অর্থাৎ হে মুসলিম জাতি! কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে গনীমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) দান করেছেন তা ভোগ কর।

তফসীরকার বগভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মক্কাবাসী যখন দুর্ভিক্ষের কারণে অসহায় অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় তখন তিনি আরববাসীকে আদেশ দেন মক্কায় খাদ্য দ্রব্য প্রেরণের জন্যে। আর এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ– আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিয্ক দান করেছেন তা তোমরা খাও।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে نِعْمَتَ اللّٰهِ (আল্লাহর নেয়ামত) শব্দ দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত এবং জাগতিক নেয়ামত বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাক মোমেনদেরকে দান করেছেন।

আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম কাফের ও অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যেন মানুষ কুফরী ও নাফরমানী পরিহার করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

এরপর মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, কোন নেয়ামতের শোকর গুজারী নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৩০

(যদি তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর তবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেবেন)।[১]

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۝

অর্থাৎ যদি তোমরা সত্য সত্যই আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর তবে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত হালাল উত্তম রিযৃক ভোগ কর, হারাম পরিহার কর, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আল্লাহ পাকের নেয়ামত ভোগ করার সময় তাঁকে স্মরণ রেখো, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি ঈমান আন, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর। এসব বিধি-নিষেধ মেনে চলাই তোমাদের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমাদের জীবন-সাধনার সাফল্য।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝١١٥ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ۝١١٦ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝١١٧

তরজমা

(১১৫) আল্লাহ পাক তো তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন শুধুমাত্র মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশ্‌ত এবং যার উপর আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে সে সব জীব-জন্তু। কিন্তু যদি কেউ অসহায় হয়ে পড়ে এবং অবাধ্য না হয় এবং সীমা লঙ্ঘন না করে তবে তার জন্যে অনুমতি রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১১৬) আর তোমাদের নিজেদেরই মুখের তৈরী মিথ্যা রচনা তোমরা 'এটি হালাল' 'এটি হারাম' বলে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনও সফল হতে পারে না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৩

(১১৭) তাদের সুখ-সম্ভোগ অতি সামান্য, আর তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সে সব বস্তুর উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে তিনি মুসলমানদের জন্যে হারাম ঘোষণা করেছেন। কেননা এসব বস্তুর মধ্যে দ্বীন-দুনিয়া উভয়েরই ক্ষতি রয়েছে। যেহেতু কাফেররা স্বেচ্ছায় কোন বস্তুকে হালাল এবং কোন বস্তুকে হারাম বলতো, এজন্যে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক শুধু এ বস্তুগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সূরা বাকারায় তথা তফসীরে নূরুল কোরআনের ২য় খন্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তাই এ স্থলে তার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন মনে করি।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

আর নিজেরই মুখের তৈরী মিথ্যা রচনা 'এটি হালাল' 'এটি হারাম' এমন কথা বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা।

মূলতঃ আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-জগৎ। তিনিই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের একমাত্র স্রষ্টা। তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, তিনিই ভাগ্য-নিয়ন্তা, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। অতএব কোন কিছুকে হারাম এবং হালাল বলার অধিকার একমাত্র আল্লাহ পাকেরই; আর কারো নয়- একথা চির সত্য। কিন্তু কেউ যদি কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ব্যতীত কোন বস্তুকে হালাল এবং কোন বস্তুকে হারাম বলে বেড়ায় তবে নিঃসন্দেহে সে অমার্জনীয় অপরাধ করে। যারা নিজেদের তরফ থেকেই কোন বস্তুকে হালাল এবং কোন বস্তুকে হারাম বলে তারা মূলতঃ আল্লাহ পাকের নামে অপবাদ দেয় এবং আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

আরবের কাফের মুশেরেকরা অন্যান্য অন্যায়-অনাচারের পাশাপাশি এ অপরাধও করতো। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন যে, এমন অন্যায় কাজে যেন মুসলিম জাতি লিপ্ত না হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

যে সব বস্তুর ব্যাপারে তোমাদের মিথ্যা মৌখিক দাবী রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কোন অবস্থাতেই এমন কথা বলোনা যে এটি হালাল, এটি হারাম; বরং ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত হালাল হারাম মেনে চলাই মুসলিম মাত্রের কর্তব্য।

আয়াতের মর্মকথা

শরীয়তের বিধানে এমন বিষয়কে কোন দলিল প্রমাণ ব্যতীত হালাল বা হারাম বলা তথা মৌখিক হালাল হারাম হওয়ার কথা দাবী করা অত্যন্ত বড় অপরাধ। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ কোন কিছুর ব্যাপারেই নিজেদের তরফ থেকে হালাল বা হারাম হওয়ার কথা সিদ্ধান্ত করোনা। এমনিভাবে শরীয়তে যা নেই এমন কাজকে শরীয়তের অংশ হিসেবে মনে করোনা। কেননা, একেই শরীয়তের ভাষায় বেদআত বলা হয়, যা অত্যন্ত বড় অপরাধ।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, অনেক গুনাহ থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে কিন্তু বেদআত এমনি একটি গুনাহ যা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় না। কেননা, যে বেদআতী কাজে অভ্যস্ত, সে সর্বদা ঐ কাজকে শরীয়তের বিধান মনে করেই করে। তাই এমন কাজ থেকে বিরত থাকার বা আত্মরক্ষা করার কোন সুযোগ হয় না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবুল নাজরাহ বলেছেন, আমি যখন থেকে সূরা নাহলের এ আয়াত–

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ..................

পাঠ করেছি, এরপর থেকে কোন কিছুর হারাম বা হালাল হওয়ার ফতোয়া দিতে ভয় করি। এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ভবিষ্যতে লোকেরা নিজের তরফ থেকে বলবে, "আল্লাহ পাক এ কাজের হুকুম দিয়েছেন, আর এ কাজ হারাম ঘোষণা করেছেন"। আর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তুমি মিথ্যাবাদী।

বস্তুতঃ যারা এভাবে আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।[২] তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনও সফল হবে না"।

যারা নিজেদের তরফ থেকে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম বলে, এরপর আল্লাহ পাকের নামে এ মিথ্যা রটায় তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। আর এ মিথ্যাবাদীদের আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। তারা শুধু যে মিথ্যা কথা বলে তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যা আরোপ করে। তাই এর কঠিন শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পাবে না। তাদের ব্যর্থতা অবধারিত, তাদের শাস্তি অনিবার্য।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৪, পৃষ্ঠা-৬৪
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা- ৪৫৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৪৮

مَتَاعٌ قَلِيۡلٌ ۪ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ﴿۱۱۷﴾

"দুনিয়াতে তাদের জন্যে সামান্য ভোগ-সম্পদ রয়েছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ পাকের নামে মিথ্যা রটনা করে এবং নিজের তরফ থেকে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম বলে দেয় তারা কখনও সফলকাম হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এ পৃথিবীতে যারাই মিথ্যা এবং ধোকার আশ্রয় নেয়, বিশেষতঃ এ যুগে দুনিয়ার সম্পদ ও শক্তি আহরণে তাদেরকে সফলকাম হতে দেখা যায়, তারই জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতাংশে।

مَتَاعٌ قَلِيۡلٌ অর্থাৎ তারা সামান্য ভোগ-সম্পদ অল্প কিছু দিন ভোগ করছে। যখন এ সামান্য সময় শেষ হবে এবং চক্ষু বন্ধ হবে তথা এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করবে তখন তারা সত্যিই উপলব্ধি করবে যে, তাদের জীবন-সাধনা হয়েছে ব্যর্থ। হযরত আলী (রাঃ- বলেছেনঃ

الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا

(দুনিয়ার সকল মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় আছে, যখন তারা মৃত্যু বরণ করবে তখন তারা জাগ্রত হবে।)

বস্তুতঃ তখনই মানুষ তার জীবন-সাধনার মর্মার্থ উপলব্ধি করবে। মানব জীবনের সাফল্য নির্ভর করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উপর। যারা আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যা আরোপ করে তারা কোন দিন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেনা। আর এজন্যে তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ
مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾ إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾
شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَآتَيْنَاهُ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

তরজমা

(১১৮) আর (হে রসূল!) যারা ইহুদী, তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম–ইতোপূর্বে যা আপনাকে বলেছি। আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

(১১৯) অতঃপর যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে ফেলেছে, এরপর তওবা করেছে এবং আত্মসংশোধন করেছে, এসব কিছুর পরও (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাদের জন্যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের একনিষ্ঠ তাবেদার, পথ প্রবর্তক ছিলেন, আর তিনি মুশরেক ছিলেন না।

(১২১) তিনি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল সঠিক পথের দিকে পরিচালনা করেছিলেন।

(১২২) আর আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছিলাম এবং আখেরাতেও, তিনি নিশ্চয় নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

(১২৩) এরপর আমি (হে রসূল!) আপনাকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করি যে, একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের দ্বীন ধর্মের অনুসরণ করুন, তিনি মুশরেকদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের জন্যে যে সব বস্তু হারাম করা হয়েছে তার আলোচনা ছিল। এরপর এ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিজের তরফ থেকে কোন জিনিসকে হারাম বা হালাল বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করার নির্দেশ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং দৌরাত্মের কারণে তাদের প্রতি কোন কোন জিনিসকে হারাম করা হয়েছে। আর এসব জিনিসের আলোচনা সূরা আনআমে স্থান পেয়েছে।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا

অর্থাৎ– তাদের জন্যে হালাল বস্তু সমূহকে হারাম করে আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু হারাম ঘোষণার পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে যথা–

১. তাতে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর কিছু থাকে,

২. ক্ষেত্র বিশেষে কারো প্রতি শাস্তি স্বরূপও কোন বস্তু হারাম করা হয়।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাক কোন কিছুই অকারণে হারাম করেননি, কোন কিছু হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি, সার্থকতা এবং কল্যাণ নিহিত থাকে। আল্লাহ পাকের কোন বিধি-নিষেধই অহেতুক বা অনর্থক হয় না; বরং মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই বিধান প্রবর্তন করা হয়।[১]

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا

যে অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, এরপর আল্লাহ্ পাকের দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে, আত্ম সংশোধন করে এবং কৃত অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি না করে, আল্লাহ্ পাক এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

যে মন্দ কাজ করে,

عَمِلُوا السُّوْٓءَ

আর তা কুফর হতে পারে অথবা অন্য কোন গুনাহও হতে পারে।

অজ্ঞতাবশতঃ بِجَهَالَةٍ অর্থাৎ যে মন্দ কাজটি সে করছে, তার আযাব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সে অন্যায় কাজটি করেছে। অথবা এর অর্থ হল ঐ কাজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা না করার কারণে শুধু কুপ্রভৃত্তির তাড়নায় সে অন্যায় কাজটি করেছে।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮১-৮২

এমন অবস্থায় কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে যদি কেউ আত্মসংশোধন করে তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করবেন কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। غفور বা ক্ষমাশীল হিসেবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করবেন। আর رحيم বা দয়াময় হিসেবে তওবাকারীকে তার তওবার জন্যে সওয়াব দান করবেন।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ط

ইব্রাহীম মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের একনিষ্ঠ তাবেদার এবং পথপ্রদর্শক ছিলেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত মুশরেকদের শেরক ও কুফরের বাতুলতা এবং তৌহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আরবের মুশরেকরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাদের আদর্শ এবং অনুসরণীয় মনে করতো, মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করাকে একান্ত জরুরী মনে করত, তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন তৌহিদের প্রতীক, আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তিনি কখনও শেরক করেননি, তিনি আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার-প্রসারে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন, মুশরেকদেরকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন।

১. اُمَّةً তিনি ছিলেন সকলের মুরুব্বী, সকলের জন্যে চির অনুসরণীয়।

২. قَانِتًا আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদার।

৩. حَنِيْفًا সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে শুধু এক আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশকারী।

৪. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ তিনি মুশরেক ছিলেন না, শেরক থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তৌহিদের উপর কায়েম ছিলেন।

৫. شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ط আল্লাহ পাকের শোকর গুজার বন্দা।

৬. اِجْتَبٰهُ আল্লাহ পাক তাঁকে মনোনীত করেছেন।

৭. وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ তিনি ছিলেন সঠিক পথের অনুসারী, আল্লাহ পাক তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

৮. وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ দান করেছেন।

আল্লাহ্ পাক তাঁর বংশেও বরকত দান করেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট তিনি চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

৯. وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ۞ এবং আখেরাতেও নিঃসন্দেহে তিনি নেককারদের অর্ন্তভুক্ত।

১০. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আদেশ হয়েছে যেন তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যে সব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সর্ব প্রথম এরশাদ হয়েছেঃ তিনি ছিলেন উম্মত। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং একটা জাতির সমতুল্য। আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ, অদ্বিতীয়তা প্রকাশে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার যে কারণে জালেম নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ 'উম্মত' অর্থ ইমাম। যাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, যাঁর অনুসরণ করা হয়। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ কামুসে "উম্মত" শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ উম্মত সে ব্যক্তি, যার মাঝে বিপুল গুণের সমাবেশ হয়, সে ব্যক্তি, যিনি সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকেন, যিনি সকল বাতিল ধর্মের বিরোধী হন।

বস্তুতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মধ্যে এত গুণ একত্রিত হয়েছিল যা বহু লোকের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং চির স্মরণীয় ও চির অনুকরণীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সত্যের ধারক, বাহক, প্রবর্তক, সত্য পথ প্রদর্শক, তৌহিদ বা একত্ববাদের মূর্ত প্রতীক। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সত্যের মহান শিক্ষক, সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর অনুসরণের দাবীদার।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, উম্মত শব্দটির তাৎপর্য হলো সমগ্র, বিশ্ববাসী যখন কাফের ছিল তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একাই ছিলেন মোমেন।[১]

قَانِتًا لِّلّٰهِ এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

مطيعا لله অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত। আর حَنِيْفًا হলো শেরক বর্জনকারী এবং তৌহিদ অবলম্বনকারী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে যখন اُمَّةً قَانِتًا এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন, মানুষকে কল্যাণকর কাজের শিক্ষা দানকারী এবং আল্লাহ

পাকের অনুগত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-কে أمة শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ দ্বীনের মহান শিক্ষক।

কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হেদায়েতের ইমাম ছিলেন, আল্লাহ পাকের গোলাম ছিলেন, আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গোজার ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধানের উপর আমলকারী ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে নবী এবং রসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি ছিলেন সত্য-সাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহবায়ক।

মক্কার কাফেররা বলতো যে, আমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপর রয়েছি। আল্লাহ পাক তাদের এ মিথ্যা দাবী প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলেনঃ

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"তিনি মুশরেক ছিলেন না", অথচ তোমরা মুশরেক।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি শৈশব থেকেই তৌহিদপন্থী ছিলেন এবং তৌহিদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। তিনি তৌহিদ সম্পর্কে নমরূদকে বলেছিলেনঃ

رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ

আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন এবং যিনি মৃত্যুমুখে পতিত করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহিদ সম্পর্কে যা বলেছেন পবিত্র কোরআনে তার উদ্ধৃতি রয়েছেঃ

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ۝ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ۝ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ........وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে হেদায়েত করেন, তিনিই আমাকে খাবার দান করেন আর তিনিই আমাকে পানীয় দ্রব্য পান করান। আমি যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন, আর তিনি আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর আমাকে পুনর্জীবন দান করবেন। আর তাঁর নিকটই আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, তিনি কেয়ামতের দিন আমার ভুল-ক্রটি মাফ করে দেবেন।

এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহিদের প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৩৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬২

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ

অর্থাৎ তিনি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গোজার ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করতেন না। এক দিনের ঘটনাঃ যেদিন কোন মেহমান পাওয়া গেল না, তাই তিনি খাবার গ্রহণে বিলম্ব করলেন। কিছুক্ষণ পর একদল ফেরেশতা মানবরূপে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট হাযির হলেন। তিনি তাদেরকে খাবার গ্রহণের জন্য আহবান করলেন। কিন্তু তারা এ ওজর পেশ করলেন যে আমরা কুষ্ঠ রোগী (সংক্রামক ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আপনার সঙ্গে বসে খাওয়া উচিত হবে না)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের একথা শুনে বললেন, এখন তো তোমাদেরকে খাবার খাওয়ানো অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। কেননা, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তোমাদের সম্মান না থাকলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এ বিপদে ফেলতেন না।[১]

اِجْتَبٰىهُ। আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যতের জন্যে নির্বাচন করেছেন এবং খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলেও মনোনীত করেছেন।

وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দিকে আহবানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক তাঁকে সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন।

وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً

এর ব্যাখ্যায় ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে সমগ্র বিশ্বে জনপ্রিয় করেছেন। সকল ধর্মাবলম্বী লোক, সকল যুগ এবং সকল দেশ ও পরিবেশের লোক সকলেই তাঁকে ভালবাসে। মুসলিম জাতি ও ইহুদী নাছারা তো আছেই আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর বলে গৌরব করতো। এমনকি, মক্কার কোরায়শরা পর্যন্ত নিজেদেরকে তাঁর ভক্ত এবং অনুসারী বলে দাবী করতো।

وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দুনিয়াতে মান-মর্যাদা, সচ্ছল জীবিকা, উচ্চ মর্তবা, সুনাম, সুখ্যাতি, অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং সকল ধর্মাবলম্বীদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দান করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং আখেরাতেও তিনি নেককারদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেনঃ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৩৫

وَأَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ

আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর। আল্লাহ্ পাক তাঁর এ দোয়া কবুল করেছেন এবং আখেরাতেও তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতাংশের الصلحين। শব্দ দ্বারা নবী রসূলগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, নেককারীর পরিপূর্ণতা অর্জন করেন معصوم বা নিঃষ্পাপ ব্যক্তিবর্গ। আর যাবতীয় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ্ পাকের তৌফিক ব্যতীত সম্ভব নয়। তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন যে, আখেরাতে প্রত্যেক নেকীর পরিপূর্ণ সওয়াব লাভ করবেন। আর এ বৈশিষ্ট্য শুধু নিঃষ্পাপ লোকদেরই হবে– তথা নবী রসূলগণেরই হবে। কেননা কবীরা বা ছগীরা গুনাহর কারণে নেক আমলের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, যদি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত না থাকে তবে এ মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হয় না। তবে যদি কোন গুনাহ্ই না থাকে তবে সওয়াব কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।[২]

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًاۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۝

“এরপর আমি (হে রসূল!) আপনাকে একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছি। আর তিনি মুশরেক ছিলেন না”।

মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের তাৎপর্য

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ মানুষকে তৌহিদের দিকে আহবানের ব্যাপারে, তৌহিদের পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপনে, কাফেরদের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠানে, কা'বা শরীফকে কেবলা গ্রহণে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ করুন। আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে এসব নেয়ামত দান করেছিলেন। এজন্যে তিনি আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করেছিলেন। এভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও নির্দেশ হয়েছে যেন তিনি এসব নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করেন।[৩]

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল মিল্লাতে ইব্রাহীম কী? আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, মিল্লাতে ইব্রাহীম হল তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন এবং শেরক ও

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৩৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৭-৫৮
৩। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫৮

পৌত্তলিকতা বর্জন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তৌহিদের মহা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আজীবন সাধনা করেছেন। এজন্যে আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের এ নির্দেশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল তৌহিদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সরল সঠিক পথে চলা, সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করা, কুফুরী ও নাফরমানী থেকে বিরত থাকা, নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা যথা সবর ও শোকরের গুণ অর্জন করা এবং নম্রতা ও উদারতার নীতি গ্রহণ করা প্রভৃতি। এর পাশাপাশি মিল্লাতে ইব্রাহীমে পৌত্তলিকতার যে সব কু-প্রথা প্রবেশ করেছিল সেগুলো থেকে মিল্লাতে ইব্রাহীমকে পবিত্র করা।

এখানে একথা বিশষভাবে উল্লেখ্য, কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে তিনটি দোয়া করেছেন তন্মধ্যে একটি হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের ব্যাপারে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে পরওয়ারদেগার! আমার বংশধরদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের নিকট আপনার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়"।

আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

انا دعوة ابى ابرهيم

(আমি আমার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া স্বরূপ।)

যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাই আল্লাহ পাক তাঁকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৪, পৃষ্ঠা-২৫১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৮

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا
بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ
الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

তরজমা

(১২৪) শনিবারের দিন পালন তো শুধু তাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল যারা এ সম্পর্কে মতভেদ করতো। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে মীমাংসা করবেন।

(১২৫) (হে রসূল!) মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান করুন হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। আর তাদের সাথে আলোচনা করুন উত্তম ভাবে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন কে পথহারা হয়েছে, আর কে তাঁর পথে রয়েছে।

(১২৬) আর যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তবে ঠিক ততখানি গ্রহণ করবে যতখানি তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা সবর কর তবে তা সবর অবলম্বনকারীদের জন্যে উত্তম।

(১২৭) (হে রসূল!) আপনি সবর করুন। আর আপনার সবর তো হবে আল্লাহ পাকের সাহায্যেই। আর তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রেও মনক্ষুন্ন হবেন না।

(১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গে আছেন যারা পরহেযগারী অবলম্বন করে এবং যারা নেককার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আরবের মুশরেকদের উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুশরেক ছিলেন না, অথচ তোমরা তাঁর বংশধর এবং

অনুসারী হওয়ার দাবীদার। তিনি ছিলেন তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, অথচ তোমরা তাতে বিশ্বাস করনা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন মিল্লাতে ইব্রাহীমের সত্যিকার অনুসারী, তিনিও তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসের আহবায়ক, যার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আমরণ সংগ্রাম করেছেন। অতএব, তোমরা যদি মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী হও, তবে তোমাদের কর্তব্য হল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা– শেরক ও পৌত্তলিকতা পরিহার করা, শুধু এক আল্লাহ পাকের নিকটই আশা করা, শুধু তাঁকেই ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। ইহুদীরা বলতো, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সপ্তাহের শনিবার দিনকে পবিত্র দিন মনে করতেন, অথচ শরীয়তে মোহাম্মদীয়াতে জুমআর দিন তথা শুক্রবার দিনকে পবিত্র দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাহলে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ কি করে হলো? ইহুদীদের একথার জবাবেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط

শনিবারের দিন এবাদত শুধু তাদের জন্যে ফরজ করা হয়েছিল যারা এতে মতবিরোধ করে। শনিবারের দিনের ব্যাপারে বনী ইসরাঈলরা তাদের নবীর শিক্ষার বিরোধিতা করেছিল, এজন্যে ঐ দিন মৎস্য স্বীকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং এবাদত ফরজ করা হয়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শনিবারের দিনের তা'যীমের কথা বলেননি।

সপ্তাহের পবিত্র দিন

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ বণী ইসরাঈলকে হযরত মূসা (আঃ) আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ জুমআর দিন পেশাগত কাজ করবেনা, শুধু এবাদত করবে, অবশিষ্ট ছয়দিন তোমরা নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থাকবে। বনী ইসরাঈলরা বলল, আমরা এবাদতের জন্যে সেদিন চাই যেদিন আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি সুসম্পন্ন করেন অর্থাৎ শনিবারের দিন। তখন আল্লাহ পাক শনিবারের দিন তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং কঠোর নির্দেশ দিলেন যেন এ দিনের সম্মানে কোন ব্যতিক্রম না হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) নাসারাদেরকে সপ্তাহের পবিত্র দিন হিসেবে জুমআর দিনকে পালন করার নির্দেশ দিলেন, তারা বলল, আমাদের ঈদের দিনের পরই ইহুদীরা ঈদের দিন করুক তা আমরা পছন্দ করি না। তাই নাসারারা তাদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিন হিসেবে রবিবারকে পছন্দ করল। অবশেষে আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে জুমআর দিন দান করলেন। আল্লাহ পাকের দান হিসেবে উম্মতে মোহাম্মদীয়া জুমআর দিনকে কবুল করল এবং আল্লাহ পাক উম্মতে ইসলামিয়াকে এর বরকত দান করেছেন।

মূলতঃ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ধর্মে শনিবার দিনের কোন বিশেষ মর্যাদা ছিল না, ইসলাম ধর্মেও এর কোন গুরুত্ব নেই। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর

ইহুদীরা তাঁর আদর্শ পরিত্যাগ করে এবং শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শুরু করে, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের প্রতি নির্দেশ হয় যে, শনিবারের প্রতি যদি তোমাদের এতই সম্মানবোধ থাকে, তবে তোমরা এদিন মৎস্য শিকার করোনা।

কিন্তু আল্লাহ পাকের এ নির্দেশ সত্ত্বেও ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক তা মেনে চলে, আর কিছু লোক অমান্য করে। যারা শনিবারের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ঐদিন মৎস্য শিকার করে তারা শুকর বানরে পরিণত হয়। এভাবে তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়ে চিরতরে ধ্বংস হয়। কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এসব বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসা করবেন।[১]

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমরা (দুনিয়াতে) পেছনে রয়েছি, কেয়ামতের দিন আগে থাকবো, যদিও (আসমানী) কিতাব তাদেরকে আগে দেয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে পরে। এদিনটি তাদের উপর ফরয করা হয়েছিল। অর্থাৎ জুমআর দিন। কিন্তু তারা তার বিরোধিতা করেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর হেদায়েত করেছেন। এসব লোক (এবাদতের দিনে) আমাদের পেছনে রয়েছে। ইহুদীদের জন্যে আগামী কাল (অর্থাৎ শনিবার) আর নাসারাদের জন্য আগামী কালের পরের দিন (অর্থাৎ রবিবার)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যার শেষাংশে এ কথাটি রয়েছেঃ "আমরা বিশ্ববাসীর পেছনে রয়েছি কিন্তু কেয়ামতের দিন সবার আগে থাকবো অর্থাৎ সর্ব প্রথম আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা হবে"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক শনিবার দিনের তা'যীম এবং সম্মান প্রদর্শনের হুকুম দিয়েছেন তাদের উপর, যারা এ ব্যাপারে মত বিরোধ করেছিল অর্থাৎ ইহুদীদের প্রতি এ আদেশ হয়েছিল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, রবিবারের দিন সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা, আল্লাহ পাক বিশ্বজগতের সৃষ্টির উদ্বোধন করেছিলেন রবিবার দিন।

যাহোক, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুমআর দিনের তা'যীম ফরয করেছিলেন কিন্তু তারা জুমআর দিনকে বাদ দিয়ে অন্য দিনের তা'যীম করা পছন্দ করেছে।[২]

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"(হে রসূল!) আপনি আল্লাহর পথের দিকে আহবান করুন যুক্তি সম্মত সঠিক কথা দ্বারা, উত্তম সুদপদেশ দ্বারা এবং উত্তম ভাবে তর্কের মাধ্যমে"।

পূর্ববর্তী আয়াতে মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণের আদেশ ছিল। মিল্লাতে ইব্রাহীমের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষকে সরল সঠিক পথের দিকে আহবান করা।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৬৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৬০

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর পথের দিকে আহবানের পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনটি পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে ১. হেকমত অর্থাৎ যুক্তি সম্মত সঠিক কথা দ্বারা মানুষকে সত্যের প্রতি আহবান করা ২. সদুপদেশ দ্বারা অর্থাৎ এমন কথা যা শ্রোতার মনে দাগ কাটে, মনকে আকৃষ্ট করে, মর্মস্পর্শী উপদেশ যা মধুর ভাষায় পেশ করা হয, যা মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী (রহঃ) লিখেছেন, এ স্থলে "হেকমত" অর্থ কোরআন আর "মাওয়েযাতুল হাসানা" শব্দ দ্বারা এমন দলিল প্রমাণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য সুস্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হয় এবং সকল সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যাতে সওয়াব লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় এবং নাফরমানী শাস্তির ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা হয়। আর কথা যত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ এবং মর্মস্পর্শীই হোক না কেন, কোন কোন লোক সত্যকে কোন ভাবেই গ্রহণ করতে চায়না, বিতর্ক ব্যতীত তারা সঠিক পথে আসতে প্রস্তুত হয়না, এ অবস্থায় তৃতীয় পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

আল্লাহ পাকের দিকে আহবানের পন্থা

অর্থাৎ এমন অবস্থার উদ্ভব হলে উত্তম ও ন্যায় পন্থায় বির্তকের পথ অবলম্বনের অনুমতি রয়েছে তবে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করার জন্যে, কারো মনে আঘাত দেয়া নয়; বরং সত্যের প্রতি তার মনকে আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে, শুধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করতে হবে। এ পর্যায়ে রুঢ় ব্যবহার পরিহার করতে হবে, তর্কস্থলে অনর্থক কথা অবশ্যই বর্জনীয় হবে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۝

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন কে পথভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথ পেয়েছে"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, উপরে নির্দেশিত পন্থায় আপনি দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করতে থাকুন, কে আহবানে সাড়া দিলো আর কে প্রত্যাখ্যান করলো তা দেখা আপনার কাজ নয়। যে তিনটি পন্থায় সত্যের ডাক দেয়ার নির্দেশ রয়েছে সে পন্থায় আপনি দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, যারা এ আহবানে সাড়া দেবে না তাদের জন্যে (হে রসূল!) আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, চেষ্টা করা আপনার কাজ, কিন্তু ফলাফল শুধু আল্লাহ পাকেরই হাতে। কে হেদায়েত লাভ করবে আর কে পথভ্রষ্ট হবে এ বিষয়ে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ۝

"আর যদি প্রতিশোধ নিতে হয় তবে তোমরা যেমন কষ্ট পেয়েছ সে পরিমাণ প্রতিশোধ নিয়ো। তবে যদি তোমরা সবর কর তবে সবর অবলম্বনকারীদের জন্যে তা হবে উত্তম"।

শানে নযুল

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধের দিন যখন সকলে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)-কে পেলেন না তখন এক ব্যক্তি বলল, তাঁকে আমি অমুক স্থানে দেখেছি, সে ব্যক্তির বর্ণিত স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন, যেখানে হযরত হামযা (রাঃ)-এর লাশ পড়েছিলো। কাফেররা তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে ফেলেছিলো। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক হযতর হামযা (রাঃ)-এর দেহকে একজন আনসারী সাহাবী কাপড় দ্বারা ঢেকে দিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও বললেনঃ "তোমার জন্যে সুসংবাদ, এই মাত্র জীবরাঈল আমাকে খবর দিলেন সপ্তম আসমানে লিপিবদ্ধ হয়েছে", "হামযা এবনে আবদুল মোত্তালেব আল্লাহর বাঘ এবং আল্লাহর রসূলের বাঘ"। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, যদি আল্লাহ পাক ভবিষ্যতে কোরায়শের মোকাবেলায় আমাকে বিজয় দান করেন তবে তোমার বদলায় তাদের ৭০ জনের নাক কান কাটা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মুবারক থেকে একথা শ্রবণের পর মুসলমানগণও এ ধরণের প্রতিজ্ঞা করলেন। ঠিক এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আলোচ্য আয়াত নিয়ে উপস্থিত হলেন।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ

যদি বদলা নিতে হয় তবে তোমরা যেমন কষ্ট পেয়েছ, তেমনি বদলা নিও অর্থাৎ বদলা বা প্রতিশোধ সমান সমান হতে হবে। এর বেশী নয়। আর যদি প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে দমন করে সবর অবলম্বন করতে পার, তবে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম। আলোচ্য আয়াতে সবরের তাৎপর্য হলো প্রতিশোধ গ্রহণ না করা।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ۝

(হে রসূল!) আপনি সবর করুন আর শুধু আল্লাহ পাকের সাহায্যেই আপনি সবর করতে পারেন, আর তাদের ষড়যন্ত্রে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক বিপদাপদে, দুঃখ-কষ্টে সবর অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন এবং অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হলে আত্মসংযমের পরিচয় দেয়ার নির্দেশ

দিয়েছেন এবং কাফেররা যে ইসলাম গ্রহণ করলো না এজন্যে দুঃখিত এবং চিন্তিত হবেন না। অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো কাফেররা যে মোমেনদেরকে কষ্ট দিয়েছে এজন্যে চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না।

وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

আর কাফেররা যে মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে তার জন্যে মনঃক্ষুন্ন হবেন না কেননা, তাদেরকে শাস্তি দেয়া এবং আপনাকে বিজয় দান করা আল্লাহ পাকেরই কাজ।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ۝

যারা মুত্তাকী পরহেযগার এবং যারা নেককার আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গেই রয়েছেন অর্থাৎ তারাই আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের, তাঁর করুণা-ধন্য হওয়ার জন্যে দু'টি গুণ অর্জনের তাগিদ রয়েছে।

১. পরহেযগার হওয়া ২. নেককার হওয়া।

যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আল্লাহর নাফরমানী তথা যাবতীয় পাপাচার পরিহার করে চলে, তারাই পরহেযগার। আর যারা মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে, উদারতা মহানুভবতার পরিচয় দেয়, মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার না করে বরং তাদেরকে ক্ষমা করে, এককথায় পরোপকারে আত্মনিয়োগ করে, তারাই নেককার। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করে চলে এবং তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করে, তারাই আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শপথের জন্যে কাফ্ফারা আদায় করেন এবং প্রতিশোধ না নিয়ে সবর অবলম্বনের সংকল্প গ্রহণ করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর সান্নিধ্য-ধন্য হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দু'টি গুণ অর্জনের শর্তে তাকওয়া পরহেযগারী এবং এখলাস। যে যত খানি তাকওয়ার পরিচয় দিতে পারবে সে ততখানি আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারবে, এটি আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান (হে আল্লাহ! দয়া করে আমাদেরকে তওফিক দান কর, আমিন)।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৪ঠা জিলহজ্জ ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ৬ই জুন ১৯৯২ ইং শনিবার বেলা দু'টার সময় তফসীরে নূরুল কোরআনের চতুর্দশ খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো, হে আল্লাহ! কবুল কর আমাদের এ সাধনা এবং এ মহাগ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর, আমীন।